উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

প্রথম সেমেস্টার

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

ঐচ্ছিক পত্র – ১০৪

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় – ক

একক ১ - মঙ্গলকাব্য

একক ২ - মনসামঙ্গল

একক ৩ - চন্ডীমঙ্গল

একক ৪ - ধর্মমঙ্গল

একক ৫ - শিবমঙ্গল বা শিবায়ন এবং অন্নদামঙ্গল

একক ৬ - বৈষ্ণব পদাবলী: স্থান-কাল-প্রেক্ষিত-বিকাশ ও অবক্ষয়

একক ৭ - পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়, বৈষ্ণব কবিকূল ও তাঁদের কৃতিত্ব

পর্যায় – খ

একক ৮ - রামায়ণ অনুবাদ

একক ৯ - মহাভারতের অনুবাদ

একক ১০ - ভাগবত অনুবাদ

একক ১১ - দৌলতকাজীরঃ লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না

একক ১২ - সৈয়দ আলাওল

একক ১৩ - পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাস

একক ১৪ - পুঁথি পাঠ ও পাঠ – সংক্রান্ত বিষয় সমূহ

ঐচ্ছিক পত্র ১০৪ – মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

পর্যায় – খ

একক ৮ - রামায়ণ অনুবাদ – উদ্দেশ্য, মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা, তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি, রামায়ণের অনুবাদকগণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা, কবি কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় ও কৃত্তিবাস সমস্যা, কাহিনী বর্ণনায় কৃত্তিবাসের ঋণ,মৌলিকত্ব ও কবিত্ব, কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্র বিচার, কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালী জীবনের প্রতিফলন, কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তা, কৃত্তিবাসী রামায়ণের রসবিচার।

একক ৯ - মহাভারতের অনুবাদ - উদ্দেশ্য, মহাভারতের অনুবাদ, বাংলা মহাভারতের বৈশিষ্ট, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও তাঁর কাব্য পরিচয়, শ্রীকর নন্দী ও তাঁর কাব্য পরিচয়, কবি সঞ্জয় ও তাঁর কাব্য পরিচয়, কাশীরাম দাসের ‘ভারতপাচাঁলী’, কবি কাশীরাম দাসের পরিচয়, ‘ভারতপাচাঁলী’-র রচনাকাল, কাশীরাম দাসের কবিত্বের পরিচয়, অষ্টাদশ শতকের মহাভারত – অনুবাদক গোষ্ঠী ও শঙ্কর কবিচন্দ্র, মহাভারতের অন্যান্য অনুবাদকগণ।

একক ১০ - ভাগবত অনুবাদ - উদ্দেশ্য, পঞ্চদশ শতকের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, ভাগবত অনুবাদ, মালাধর বসুর জীবন বৃতান্ত, কাব্য উৎস ঋণ ও পরিচয়, কাব্যের নামকরণ, রচনাকাল ও পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বর প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গুরুত্ব, কবির কবিত্ব, শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে ভক্তি ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে বাংলা ও বাঙালী মানসিকতা, শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে বর্নিত সমাজচিত্র, শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের কাব্যমূল্য, ভাগবতের অন্যান্য অনুবাদ, বাংলা ভাগবত অনুবাদ সীমিত হওয়ার কারণ।

একক ১১ - দৌলতকাজীরঃ লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না - উদ্দেশ্য, ভূমিকা, আরাকান (রোসাঙ) রাজসভার কবি ও কাব্য, আরাকান (রোসাঙ) রাজসভার বাংলা সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতা, কবি দৌলতকাজীর পরিচয়, কাব্য রচনাকাল, কাব্য পরিচয়ঃ রোমান্টিক আখ্যানকাব্য, কাব্যের উৎস ও নামকরণ প্রসঙ্গ, কাহিনী পরিকল্পনা, ‘লোর চন্দ্রানী ও সতীময়না’র চরিত্র বিচার, ‘লোর

চন্দ্রানী ও সতীময়না'-র কাব্যমূল্য, দরবারী সাহিত্য হিসাবে 'লোর চন্দ্রানী ও সতীময়না'র গুরুত্ব, 'লোর চন্দ্রানী'-তে অন্যান্য সাহিত্যের প্রভাব।

একক ১২ - সৈয়দ আলাওল - উদ্দেশ্য, কবি সৈয়দ আলাওলের পরিচয়, দৌলত কাজীর 'সতীময়না' কাব্যের সমাপ্তিদান, রচনাসমূহের পরিচয়, পদ্মাবতী কাব্যের পরিচয়, জায়সীর 'পদ্মাবত' ও আলাওলের 'পদ্মাবতী'র তুলনা, আলাওলের কবি কৃতিত্ব, সপ্তদশ শতকের অন্যান্য মুসলমান কবি।

একক ১৩ - পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাস – উদ্দেশ্য, পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাস, পুঁথির সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ, পুঁথির উপকরণ, পুঁথির গঠন প্রকৃতি, পুঁথির লিপিকর ও পাঠক/গায়েন, আদর্শ পুঁথি।

একক ১৪ - পুঁথি পাঠ ও পাঠ – সংক্রান্ত বিষয় সমূহ - উদ্দেশ্য, পুঁথি পাঠের পদ্ধতি ও সমস্যা, বাংলা পুঁথি পাঠের দুই রীতি, পুঁথি পরিচয় ও কাল নির্নয় পদ্ধতি,পুঁথির অব্দ গণনা ও শকাব্দ নির্নয় পদ্ধতি, পুঁথির লিপির উদ্ভব ও বিবর্তন, পুঁথি সংরক্ষণ, পুঁথি সম্পাদনা ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

পর্যায় - খ

একক ৮ - রামায়ণ অনুবাদ

একক ৯ - মহাভারতের অনুবাদ

একক ১০ - ভাগবত অনুবাদ

একক ১১ - দৌলতকাজীর ঃ লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না

একক ১২ - সৈয়দ আলাওল ও তাঁর রচনাবলী

একক ১৩ - পুথি সংগ্রহের ইতিহাস - সংজ্ঞা, শ্রেণী বিভাগ, উপকরণ, গঠন, লিপিকর - আদর্শ পুথি

একক ১৪ - পুথি পাঠ ও পাঠ - সংক্রান্ত বিষয় সমূহ

মন্তব্য

একক ৮ - রামায়ণ অনুবাদ

বিন্যাসক্রম

৮.১ ঃ উদ্দেশ্য।

৮.২ ঃ মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা।

৮.৩ ঃ তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি।

৮.৪ ঃ রামায়ণের অনুবাদকগণ।

৮.৫ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৮.৬ ঃ বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা।

৮.৭ ঃ কবি কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় ও কৃত্তিবাস সমস্যা।

৮.৮ ঃ কাহিনী বর্ণনায় কৃত্তিবাসের ঋণ, মৌলিকত্ব ও কবিত্ব।

৮.৯ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্র বিচার।

৮.১০ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালী জীবনের প্রতিফলন।

৮.১১ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তা।

৮.১২ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণের রসবিচার।

৮.১৩ ঃ অনুশীলনী।

৮.১৪ ঃ গ্রন্থপঞ্জি।

মন্তব্য

৮.১ ঃ উদ্দেশ্য

আদি কবি বাল্মীকির মহাকাব্য রামায়ণ অবলম্বনে প্রথম বাংলা রামায়ণ রচনা করেন কবি কৃত্তিবাস ওঝা। তাঁর কাব্যে রচনাকাল পঞ্চদশ শতক। কৃত্তিবাসী রামায়ণ 'শ্রীরাম পাঁচালী' বাঙালীর জাতীয় কাব্য হিসাবে স্বীকৃত। বহু প্রজন্ম ধরে বাঙালীর রাম সংক্রান্ত চিন্তা চেতনার মূল উৎস এই কাব্য। তবে এই কাব্য পাঠকালে প্রথমেই একটি সর্বজন স্বীকৃতি সিদ্ধান্ত পুনরায় স্মরণ করে নেওয়া প্রয়োজন — কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদক মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলা রামায়ণের রূপকার।

আলোচ্য এককটিতে আমাদের উদ্দেশ্য হল মূল রামায়ণের রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল কোন বিশেষ সমাজ পরিস্থিতিতে তার পরিচয় নেওয়া। এছাড়া কবি কৃত্তিবাস-এর জীবনকাল, কাব্য রচনার সময়, কারণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা। এই রামায়ণের মৌলিক বৈশিষ্টগুলি অন্বেষণ, যা একে একান্তভাবেই বাংলা রামায়ণের মর্যাদা দিয়েছে তা জানতে পারা। রামকে নিয়ে প্রচলিত লোককথা থেকে বাল্মিকী রামায়ণ এবং তা থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূলগত পার্থক্য, বাঙালী জীবনের কোনো দিক এই কাব্য প্রতিফলিত হয়েছে এবং তারই সূত্রে এই কাব্যের জনপ্রিয়তার কারণগুলি এবং রসপরিণতি প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে ধারণা সৃষ্টি করা এবং কৃত্তিবাসের কাব্য সৃষ্টি করা সম্বন্ধে অবহিত করা।

৮.২ ঃ মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা

পঞ্চদশ শতকে কবি কৃত্তিবাস বাংলায় তাঁর সপ্তকাণ্ড 'রামায়ণ' বা 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করলেও একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর কাব্য রচনার আগে বা সমসময়ে রামের কাহিনী বঙ্গদেশে প্রচলিত ও জ্ঞাত ছিল। মূলত সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কণ্ঠেই সেই কাহিনী আবর্তিত হত। সাধারণ মানুষ 'রামায়ণ' 'মহাভারত' বা বিভিন্ন পুরাণ কাহিনী শুনতে পেত কথক ঠাকুরদের কাছে। কিন্তু সে সমস্ত কাব্য-কাহিনী সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদ করার প্রয়োজন অনুভূত হয় বাংলায় তুর্কি বিজয় পরবর্তী মুসলমান শাসনের প্রতিক্রিয়ায়। শাসনক্ষমতাচ্যুত ব্রাহ্মণ্য শক্তি সংস্কৃতির দিক থেকেও সম্ভবত বিপন্ন বোধ করছিলেন। মুসলমান শাসনের প্রবর্তন একাধারে রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেকটাই কাছাকাছি এনে ফেলেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের। উচ্চবর্গের কাছে এতদিনের অবজ্ঞেয় লোকসাধারণের দেব-দেবী মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, 'চাষী দেবতা শিব' এবং 'প্রণয়বিলাসী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ' ও তাঁদের মাহাত্ম্য প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই স্বীকৃত হল। অপরপক্ষে এতদিনের অবদমিত নিম্নবর্গের মানুষও নিজেদের মতো করে উচ্চতর বর্গের সংস্কৃতি ও দেবতাদের গ্রহণ করার সুযোগ পেল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াসটিও উল্লেখযোগ্য। কারণ সাধারণ হিন্দু জনসংখ্যার বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ তখন ইসলাম ধর্মের মধ্যে আশ্রয় পেতে চাইছিল, এতদিনের অবদমন থেকে মুক্তি পেতে। তাদের প্রতিহত করে নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতির মহানতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এক প্রধান উদ্দেশ্য। তারই ফল বলা যেতে পারে মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্য। এ প্রসঙ্গে 'পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য' বইতে শিবপ্রসাদ হালদার বলছেন — ''মধ্যযুগের ত্রিধা বিভক্ত সাহিত্যের মধ্যে অনুবাদ কাব্যগুলি অন্যতম। ইহাদের মধ্য দিয়া ভারতীয় পৌরাণিক চেতনা যেমন লোকমানসে সঞ্চারিত হইয়াছে, তেমনটি অন্য কিছু দ্বারা হয় নাই। ইহাও এক প্রকার মুসলমান রাজত্বের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া। এই বিদেশী শাসনে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

প্রথমত ঃ সভ্যতা সংস্কৃতিতে এই শাসককুল ভিন্ন গোত্রীয়,

দ্বিতীয়ত ঃ বাংলা দেশে রাজকার্য পরিচালনায় ইঁহারা সংস্কৃত অপেক্ষা বাংলাকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে আসন্ন বিপর্যয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য লোকমানসে ইহার প্রচার প্রয়োজন হইয়াছিল।

অনুমান করা যায়, অনুবাদগুলির প্রথম অভিব্যক্তি ঘটে কথকতার মধ্যে। কথক সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে বিবিধ কথা কাহিনী সহজভাবে লোক সমাজে পরিবেশন করিতেন। পরে ইহার প্রয়োজনের গুরুত্ব দেখিয়া সুসংবদ্ধভাবে অনুবাদের প্রয়াস দেখা যায়।'' প্রায় একই বক্তব্য কিছুটা ভিন্ন ভাষায় আমরা পাই কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীতে। রাজসভায় সম্মানপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ বর্ণনা করে কবি বলছেন —

'মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।

পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণি।
বাপ মাএর আশীর্ব্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান।।
সাত কাণ্ডের কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে হইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।'

'লোক বুঝাইতে' অর্থাৎ লোক সাধারণের কাছে 'রামায়ণ'-এর বার্তা বা শিক্ষা পৌঁছে দিতেই কৃত্তিবাসের এই কাব্যরচনা সেকথা কবির কথনের মাধ্যমেই জানা গেল।

আত্মকথনেই কিছুটা পরে কৃত্তিবাস জানান, বাল্মীকির মুখে দেবগণ যে কাহিনী জেনেছেন সেই কাহিনীই তিনি জনগণকে বলতে চান এবং তাঁর এ ব্রতে তিনি বাল্মীকির আশীর্বাদ লাভ করেছেন।

'ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি কর্য্যা যত দেবগণ।
বাল্মীকি মুখে সব শুনেন রামায়ণ।।
পৃথিবী জিনিতে সবে চড়ে ইন্দ্রের কান্ধে।
দিগদিগান্তর জিনিতে কেহো সেতু বান্ধে।।
কোন রাজা জিএ যাটী হাজার বৎসর।
কোন রাজা মরণ জিনে সিদ্ধ কলেবর।।
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচিল বাল্মীকি মুনির বরে।।'

কৃত্তিবাস যে বিষয়গুলি তাঁর কাব্যের বর্ণনীয় বলে উল্লেখ করছেন অর্থাৎ দিগ্‌বিজয়, মরণজয়, দীর্ঘায়ু লাভ — প্রতিটি ক্ষেত্রেই মাহাত্ম্য কীর্তন একটা উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব পাচ্ছে। এবং সেইসব উদাহরণগুলি লোকসাধারণের সামনে স্থাপন করাও যে কবির উদ্দেশ্য তাও তাঁর কাব্যের স্থানে স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন আমাদের পাঠ্য অরণ্যকাণ্ডে সীতার বিরহে রামের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন —

'বাল্মীকি চরিত্র পোথা তারক মহামন্ত্র কথা
শুন নর হৈয়া এক মন।
পাপক্ষয় স্বর্গগতি পুণ্যবৃদ্ধি পুণ্যে মতি
ভজ সভে রামের চরণ।।
অথবা
সীতার বিয়োগে রাম নেত্রে নীর অবিশ্রাম
শোকসিন্ধু মজিল ঈশ্বর।
মহামন্ত্র অনুপাম জপ সভে রাম রাম
যদি যাইবা বৈকুণ্ঠনগর।।'

স্বর্গলাভের জন্য, এই ঘোর পাপমগ্ন পৃথিবী থেকে উদ্ধার লাভের জন্য রাম নাম — কীর্তন এবং শ্রবণই যে একমাত্র পথ তা কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী'তে বারবার বলা হয়েছে। কৃত্তিবাস যে বাল্মীকি চিত্রিত নরচন্দ্রমা রামের চরিত্রে প্রচুর ঐশ লক্ষণ সংযুক্ত করে তাঁকে ভক্তবৎসল দেবতা রামে পরিণত করেছিলেন, এগুলি হল তারই নিদর্শন।

একজন অবতার সদৃশ পুরুষকে অবলম্বন করে বিপদসংকুল সংসার-সাগরে সন্তরণ এবং তা থেকে উত্তরণ — এই ছিল সাধারণভাবে মধ্যযুগের অনুবাদ কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য। যে কারণে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ নির্দেশ অংশে পাই —

'পৃথুবির রেনু জদি করি এ গনন।
তবুত বলিতে নারি কৃষ্ণের করন।।
সংসার সাগর জদি করিতে তারন।
ভাগবত অবতরি হিতের কারণ।।
ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।
সুন হে পণ্ডীত লোক একচিন্ত মনে।
কলি ঘোর তিমিরি জাতে বিমোচনে।।
ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে।।'

'লোক নিস্তারণ' ছাড়া দ্বিতীয় যে বিষয়টি সংস্কৃত কাব্য-পুরাণের বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল, তা হল মুসলমান শাসকদের আগ্রহ ও উৎসাহ। 'রামায়ণ', 'ভাগবত' এবং 'মহাভারত' তিনটি কাব্যের ক্ষেত্রেই প্রাথমিকভাবে এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুচনায় তুর্কিদের

মন্তব্য

প্রথম বঙ্গপ্রবেশের পর যে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোলযোগ দেখা দিয়েছিল তা ক্রমশ স্থিতাবস্থা লাভ করে ইলিয়াস শাহি বংশের শাসন থেকে এবং রুকনুদ্দিন বারবক শাহ, হুসেন শাহ প্রমুখ শাসকরা বাংলা সাহিত্যের প্রভূত পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মুসলমান শাসকদের এই আনুকূল্য সম্পর্কে 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন বলেন — ''বিদ্যার অর্ণবযান সদৃশ, দেব ভাষার প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাবান টুলো পণ্ডিতগণের বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার দরুণ আমাদের দেশের ভাষা যে কোন কালে রাজদ্বারে প্রবেশ করিতে পারিত, এমন মনে হয় না। পাঠান প্রাধান্যকালে বাদশাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের দলিলপত্র ও অনেক সময় বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত। .... তাঁহারা হিন্দুর পুরাণ ও অপরাপর শাস্ত্রের মর্ম জানিবার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃত সম্পূর্ণ অনধিগম্য এবং বাঙ্গালা তাঁহাদের কথ্য ভাষা ও সুখপাঠ্য ছিল, এজন্য তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ তর্জমা করিতে উপযুক্ত পণ্ডিতদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।''

যদিও গোঁড়া সংস্কৃতপন্থীরা এই অনুবাদ প্রচেষ্টাগুলিকে সুনজরে দেখেননি। এমন কথাও সেসময় প্রচলিত হয়েছিল 'কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে আর বামুন ঘেঁসে / এই তিন সর্বনেশে।''

৮.২ ঃ তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঃ- এই অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব ১২০০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ এই তিনশো বছরের বাংলার রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দকে ঊর্ধ্বসীমা ধরার কারণ হল কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেই রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয় যদিও পরবর্তীকালে কাব্যের সেই প্রাথমিক রূপের উপর বহু হস্তাবলেপ ঘটেছে।

ভারতে তুর্কি বিজয়ের সূচনা করেন আফগানিস্তানের ঘুর প্রদেশের শাসক মহম্মদ ঘুরী। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে আততায়ীর হাতে নিহত হবার আগে দিল্লি থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, সিন্ধুদেশের উত্তরাংশে এবং রাজস্থান ও মালবের কোনো কোনো অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম প্রধান ক্রীতদাস ও সহযোগী কুতবউদ্দীন আইবক দিল্লিতে সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে।

১২০২-০৩ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দীন মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজী নামে এক স্বাধীন ভাগ্যান্বেষী সেনানায়ক 'নূদীয়' (নবদ্বীপ) অধিকার করে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। যদিও মহম্মদ ঘুরী বা কুতবউদ্দীনের পৃষ্ঠপোষকতা বা সমর্থন নিয়ে তিনি বাংলা অভিযান করেননি। বাংলা অভিযানের আগে তিনি বিহরের দক্ষিণ অংশে আধিপত্য বিস্তার করেন। বখতিয়ারের অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত মধ্যাহ্নভোজনরত বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ ত্যাগ করে জলপথে পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরের দিকে যাত্রা করেন। বখতিয়ার লক্ষ্মণ সেনের পশ্চাতে সেনাদল নিয়ে ধাবিত হননি। কারণ নদীবহুল দেশে যুদ্ধ করা তুর্কি অশ্বারোহীদের পক্ষে সহজ ছিল না। নবদ্বীপে ব্যাপক লুণ্ঠন ও হত্যা করার পর বখতিয়ার নবদ্বীপ থেকে উত্তরে বরেন্দ্রভূমির দিকে অগ্রসর হন এবং সেন রাজাদের অন্যতম রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। লক্ষ্মণ সেনের নামানুসরে গৌড়ের নামকরণ হয়েছিল লক্ষ্মণাবতী। মুসলমানের আমলে নামটির রূপ দাঁড়ায় 'লখ্‌নৌতি'।

কিছুদিন পর বখতিয়ার আরও উত্তরে তিব্বত জয়ের জন্য এক দুঃসাহসিক অভিযানে গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হন। তাঁর সৈন্যদল নদীতে নিমজ্জিত হয়। তিনি কয়েকজন অশ্বারোহী সহ রাজধানী দেবকোটে (অধুনা দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর)। পৌঁছান। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই অনুচর আলী মর্দান খলজী তাঁকে হত্যা করেন। বখতিয়ার খলজী সম্পূর্ণ অর্থে 'বঙ্গবিজেতা' ছিলেন না। তাঁর অধিকারে ছিল পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের কিছু অঞ্চল। ত্রয়োদশ শতকের মুসলমান ঐতিহাসিকরা তাঁর রাজ্যকে 'লখনৌতির রাজ্য' আখ্যা দিয়েছিলেন। যদিও বর্ণভেদ ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ কলহে দীর্ঘ সেন বংশ নবদ্বীপ, লক্ষমণাবতীতে মুসলমান অধিকারকে প্রতিহত করতে পারেনি, বিক্রমপুরকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে সেনবংশ বেশ কিছুকাল স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল, লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে বহু রাজপুরুষ ও পণ্ডিতও পূর্ববঙ্গে চলে যান। আরও অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত নেপালে আশ্রয় নেন। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গ থেকে কামতা-কামরূপ এমনকি হিমালয় পেরিয়ে চীন ও তিব্বতে ও প্রাচীন বাংলার শিল্পসংস্কৃতির ধারা পৌঁছেছিল।

বখতিয়ার খলজী কুতবউদ্দীনের প্রাধান্য স্বীকার করে তাঁকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করেননি। ফলে বাংলার মুসলমান শাসন দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনের বহির্ভূত ছিল। বখতিয়ার বিজিত রাজ্যে গোষ্ঠীগত সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে নিজের ভাগ্যান্বেষী ও

উচ্চাভিলাষী অনুচরদের সন্তুষ্ট করেন। তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ মঠ-মন্দির ধ্বংস করতে দ্বিধা করেননি। অন্যপক্ষ মুসলমান ধর্ম-সংস্কৃতির প্রসারের জন্য মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপন করেন। মন্তব্য

বখতিয়ারের মৃত্যুর পরে দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর (১২০৬-৮২) লখ্‌নৌতির তুর্কি রাজ্যে স্থিতিশীলতার অভাব ছিল। আইনসম্মত উত্তরাধিকারীর অভাব ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সামন্তদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের ফলে এই পঁচাত্তর বছরে উনিশ জন শাসক মসনদে আসীন হন। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী (১২১৩-২৭)। তিনি 'সুলতান' অভিধা গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন দিকে রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন। তাঁর আগের দুই শাসক ছিলেন শিরান খলজী এবং বখতিয়ারের হত্যাকারী আলী মর্দান খলজী। গিয়াসউদ্দীনের শাসনে হস্তক্ষেপ করেন দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিস। গিয়াসউদ্দীনকে বন্দি ও ক্ষমতাচ্যুত করে তিনি পুত্র নাসিরউদ্দীনকে লখনৌতির শাসক নিযুক্ত করেন। নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর লখনৌতিতে পুনরায় বিদ্রোহ ও শাসক পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন গিয়াসুদ্দিন বলবন। তিনি দিল্লিতে তুর্কি সাম্রাজ্যের শক্তি সুসংহত করেন, তাঁর অনুগ্রহে লখনৌতিতে শাসক হন তুগরল খাঁ। কিন্তু তিনিও এক সময়ে দিল্লির শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে বলবন স্বয়ং তুগরলের বিদ্রোহ দমন করেন ও তাঁকে হত্যা করে স্বয়ং কিছুদিন লখনৌতিতে থেকে শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনেন। বলবনের মৃত্যুকাল (১২৮৭ খিঃ) পর্যন্ত দিল্লির অধীনে থেকে লখনৌতি শাসন করেন বলবনের পুত্র বুগরা খাঁ। এরপর বুগরা খাঁর পুত্র কায়কোবাদ, জলালউদ্দীন খলজী ও বুগরা খাঁর দ্বিতীয় পুত্র রুকনুদ্দীন কাইহাউস সিংহাসনে বসেন। কাইহাউসের মৃত্যুর (১৩০১ খ্রিঃ) পর লখনৌতির অধীশ্বর হন শমস্‌উদ্দীন ফিরাজ শাহ, তিনি বলবন বংশের লোক ছিলেন না। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ও পরে মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাধে ও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়। এর পরবর্তী ইতিহাস সম্পর্কে অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত — ''দিল্লির খলজী সুলতানরা বাংলার তুর্কি রাজ্যের স্বাধীনতা মেনে নিয়েছিলেন। তুঘলক সুলতানেরা এই নীতি পরিত্যাগ করে দিল্লীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করায় বাংলায় আবার রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিল। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বাংলায় মুসলমানদের অধিকৃত অঞ্চলকে তিনটি প্রদেশে বিভক্ত করেনঃ লখ্‌নৌতি, সাতগাঁও সোনারগাঁও। তিনটি প্রদেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। মোহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষ দিকে তুর্কি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই সুযোগে বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলার সঙ্গে দিল্লীর রাজনৈতিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। শের শাহ কর্তৃক গৌড় অধিকারের সময় পর্যন্ত দুশো বছর বাংলা স্বাধীন ছিল। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক দু-বার বাংলা আক্রমণ করেও এই বিদ্রোহী প্রদেশে নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে দিল্লী সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয় সুস্পষ্ট হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঐ সাম্রাজ্য কার্যতঃ একটি প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। দিল্লীতে যদি ইলতুৎমিস, বলবন ও আলাউদ্দীন খলজীর মত শক্তিমান সুলতান থাকতেন তবে বাংলার স্বাধীনতা খুব সম্ভব অক্ষুণ্ণ থাকত না।।''

[''মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী'' — অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৬]

চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে স্বাধীন বাংলার ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন শমসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৮ খ্রি.)। তিনি সম্ভবত ইরান বা পারস্য থেকে এদেশে আসেন। পূর্বতন সুলতানকে হত্যা করেই তিনি সিংহাসন অধিকার করেন। তবে লখনৌতির পর তিনি ক্রমে সাতগাঁও, সোনারগাঁও দখল করেন, পূর্বে ও পশ্চিমে রাজ্যবিস্তার করে বাংলার সুলতানের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং দিল্লীর সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করে বাংলার স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর বংশধরেরা দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। বাংলায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এই যুগের একটি বিশেষত্ব। বাংলার হিন্দুরাও এই সময় মুসলমান শাসন মেনে নিয়েছিল।

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-৯০) দীর্ঘকাল রাজত্ব করে সম্ভবত বিদ্রোহী পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৯০-১৪১০) সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।

গিয়াসউদ্দীনের পুত্র সইফউদ্দীন হামজা শাহ অল্পদিন রাজত্ব করার পর সম্ভবত তাঁর ক্রীতদাস শিহাবউদ্দীন কর্তৃক নিহত হন (১৪১২)। শিহাবউদ্দীন ও সম্ভবত অকালে নিহত হন। তাঁর পুত্রকে সরিয়ে দিয়ে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা গণেশ সিংহাসন অধিকার করেন (১৪১৫)। গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পরবর্তী পাঁচ বছরের (১৪১০-১৫) ঘটনাবলীর কোনো সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ ঐতিহাসিকদের হাতে আসেননি।

ইলিয়াসশাহী সুলতানরা রুচিমান ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন —

মন্তব্য

''ইলিয়াস শাহীরা দেশবাসীর সহিত খুব ভাল ব্যবহার করিতেন। এমনকি, তাঁহাদের হিন্দু ও বৌদ্ধ বড়লোকদের সাহায্য না লইলে চলিত না। তাঁহাদের রাজত্বে অনেক জায়গায় বড় বড় হিন্দু ও বৌদ্ধ জায়গীরদার ছিল। একজন হিন্দু রাজা একটি টাকা রাজস্ব দিয়া ভাদুরিয়ার জমিদারী ভোগ করিতেন। সেই জমিদারীর নাম ছিল একটাকিয়া। অনেক কায়স্থ মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়া বিস্তর জমিদারী ভোগ করিত, বিশেষত উত্তররাঢ়ী কায়স্থরা। আর করিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা, কেননা তাহারা রাজধানীর অতি নিকটে থাকিত।''

যদিও ইলিয়াসশাহী রাজত্বের শেষের দিকে বাংলার আমির-ওমরাহদের গোষ্ঠী-দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে সহযোগিতার ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল তা বিঘ্নিত হয় এবং রাজনীতিতে সুফি-সন্তদের প্রভাব কিছুটা বেড়ে যায়। সম্ভবত এই কারণে হিন্দু সামন্ত, জমিদার ও অমাত্যদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় এবং রাজা গণেশের অভ্যুত্থান সহজ হয়। যদিও এই হিন্দু রাজাকে সরানোর জন্য বাংলার মুসলিম সাধু-সন্তদের নেতা নুর-কুতব-উল আলম জৌনপুরের বিখ্যাত সুফি আসরাফ-উল সিমনানির সাহায্য প্রার্থী হন এবং জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে বাংলা আক্রমেণ প্ররোচিত করেন। ইব্রাহিম শর্কী বাংলা আক্রমণ করলে গণেশ বিনা যুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করেন। গণেশের পুত্র যদু বা যদুসেন পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে মুসলিম শিবিরে যোগ দেন। ধর্মান্তরিত হয়ে তিনি জালালউদ্দিন নাম নেন এবং মোল্লারা তাঁকে সিংহাসনে বসান।

অনেক ঐতিহাসিক অবশ্য মনে করেন এই ঘটনা রাজা গণেশেরই পরিকল্পিত। অধ্যাপক আবদুল করিম লিখেছেন — 'নূর কুতব আলমের মৃত্যুর পরে গণেশের দুরভিসন্ধি পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়িল। তিনি যদুকে শুদ্ধি করাইয়া আবার হিন্দু ধর্মে ফিরাইয়া আনেন এবং তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দনুজমর্দ্দনদেব নাম ধারণ করিয়া মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁহার মৃতুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রদের উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসেন এবং মুদ্রা প্রচলন করেন। কিন্তু জালাল-উদ-দীন তাঁহাকে সরাইয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন।'' জালালউদ্দীন সুশাসক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার ছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সংস্কৃতিরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সভাকবি ছিলেন বৃহস্পতি মিশ্র ও সেনাপতি ছিলেন রাজ্যধর।

অপরিণত বয়সে জালালউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র শমস্উদ্দীন আহম্মদ শাহ সিংহাসন লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দুই ক্রীতদাসের ষড়যন্ত্রে নিহত হন (১৪৩৬)। এরপর রাজ্যের আমীর ওমরাহরা সিংহাসনে বসান ইলিয়াসশার বংশের নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহকে। তাঁর রাজত্বকালেও (১৪৩৬-৫৯) তাঁর বংশের ঐতিহ্য অনুসারে চীনের সঙ্গে সংযোগ বজায় ছিল।

নাসিরউদ্দীনের পুত্র রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৫-৭৬) কে বলা হয় বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে — রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ১৪৫৫ থেকে ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর পিতা নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন, ১৪৫৯ থেকে ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যড়ত এককভাবে রাজত্ব করেন এবং ১৪৭৪ থেকে ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন। কৃত্তিবাস ১৪৯ থেকে ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় বারবক শাহের সভায় অভিনন্দিত হয়েছিলেন। যদিও এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

বারবক শাহ নিজে পণ্ডিত এবং পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভাগবত-অনুবাদক মালাধর বসু তাঁর কাছে সম্মান ও উপাধি লাভ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে বারবক শাহ একটি অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আত্মকলহ ও দরবারি ষড়যন্ত্রের ফলে প্রশাসন যখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় তখন তিনি বহু আফগান সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং আট হাজার হাবসি (আবিসিনীয়) ক্রীতদাস আমদানি করে তাদের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে উচ্চপদে নিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর এই নীতি শেষপর্যন্ত রাজ্যের পক্ষেই ক্ষতিকারক হয় কারণ ক্রমে হাবসিরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এদের ক্ষমতা ও ঔদ্ধত্য খর্ব করার জন্য ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান জালালউদ্দিন ফতে শাহ উদ্যোগী হলে তিনি হাবসিদের দ্বারা নিহত হন (১৪৮৭)। হাবসিরা সিংহাসন দখল করে এবং চারজন হাবসি সুলতান ছয় বছর রাজত্ব করেন। এঁদের শেষ জন মুজফ্ফর শাহ স্থানীয় আমির-ওমরাহদের ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিনাশ, করতে থাকেন, হিন্দু-মুসলিম জমিদার ও অভিজাতদের নির্বিচারে হত্যা করেন, চড়া হারে রাজস্ব আদায় করেন এবং সেনাবাহিনীর বেতন কমিয়ে দেন।

ফলে আমির-ওমরাহ, সেনাবাহিনী ও সাধারণ প্রজা — সবাই বিদ্রোহী হয়। বাংলায় শাসকের বিরুদ্ধে সব শ্রেণির মানুষের সংঘবদ্ধ বিদ্রোহের এটাই প্রথম দৃষ্টান্ত। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন মুজফ্ফর শাহের উজির হুসেন শাহ।

মন্তব্য

মুজফ্‌ফর শাহের মৃত্যুর পর অভিজাত ও হিন্দু পাইকদের সহায়তা ও সমর্থনে হুসেন শাহ সিংহাসনে বসেন (১৪৯৪)। তিনি এক নতুন রাজবংশ স্থাপন করেন যাঁরা ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেন। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই বংশের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল।

হাবসিদের বহিষ্কার করে হুসেন শাহ রাজ্যের পুনর্গঠন করেন। তাঁরা বাংলার শ্রীবৃদ্ধি করেন এবং বাংলা সাহিত্যের প্রভূত পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উদার রাষ্ট্রীয় নীতির ফলে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার সম্ভব হয় এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

সামাজিক পরিস্থিতি ঃ- তুর্কি বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্তী বাংলার সামাজিক ইতিহাস এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস। এতদিনের ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্গ ক্ষমতা হারিয়ে সম্পূর্ণ বহিরাগত ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসকের অধীনস্থ হল দেশের জনসাধারণের সঙ্গেই। শাসনক্ষমতার হস্তান্তর হলেও অবশ্য বাংলার পল্লিসমাজের বর্ণভেদ আধারিত মূল কাঠামোটি অপরিবর্তিতই থেকে গিয়েছিল। তবে তারই মধ্যে তিনটি অবধারিত সামাজিক পরিবর্তন চিহ্নিত করেছেন ঐতিহাসিকরা। গোপাল হালদারের মতে পরিবর্তনগুলি হল —

১। উচ্চ ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের সংযোগ নিকটতর হল।

২। পরাজিত হিন্দুসমাজ এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হল।

৩। প্রথমে হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের ঐক্য ও ক্রমে হিন্দু-মুসলমান উচ্চবর্গের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হলে পর মুসলমান বিজেতারা বাঙালি হয়ে উঠলেন, আর বিদেশীয় রইলেন না।

১। উচ্চ ও নিম্ন বর্গের সামাজিক সংযোগের দুটি প্রত্যক্ষ সাহিত্যিক ফল হল মঙ্গলকাব্যের ধারা এবং পুরাণ-মহাকাব্যের অনুবাদের ধারা। লৌকিক দেব-দেবীদের কাহিনি এবং সাধারণের ধর্মীয় আচার এতদিন উচ্চবর্গীয়দের কাছে অবজ্ঞেয় ছিল কিন্তু এবার সময় ও পরিস্থিতির কারণেই মনসা, চণ্ডী প্রমুখ লৌকিক দেবীরা উচ্চবর্গের স্বীকৃতি লাভ করলেন। বিপরীতক্রমে সংস্কৃত মহাকাব্য,

পুরাণ — যা ছিল উচ্চবর্গের চর্চার মধ্যে আবদ্ধ বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে তার পরিচয় সাধারণ মানুষের কাছে এসে পৌঁছালো। এই বর্গ-সংযোগের আর একটি পরোক্ষ ফল নির্দেশ করেছেন গোপাল হালদার — তা হল পশ্চিমবাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি। কারণ তুর্কি অভিযানকারীদের দ্বারা প্রথমেই আক্রান্ত হয়েছিল বৌদ্ধ বিহার ও ব্রাহ্মণ্যমন্দিরগুলি। সুকুমার সেন মনে করেছেন

— এই আক্রমণের ''প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লুট, আর অবান্তর উদ্দেশ্য ছিল জাতির মর্মস্থান দেবপীঠগুলির উপর আঘাত হেনে জনসাধারণের মনে ত্রাস জাগিয়ে নিশ্চেষ্ট করে দেওয়া। এই দুই উদ্দেশ্যই অল্পবিস্তর সফল হয়েছিল। বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁরা পারলেন তাঁরা প্রান্তীয় হিন্দুরাজ্যে চলে গেলেন — মিথিলায়, নেপালে, উড়িষ্যায়, কামরূপে, ঝাড়িখণ্ডে। যাঁরা পারলেন না তাঁরা পড়ে মার খেলেন। কতক বা এখানে-সেখানে লুকিয়ে প্রাণ, জাতি ও ধর্ম-রক্ষা করলেন।'' তবে পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধরা তারপরেও তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

২। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সমাজ-সংরক্ষণকে গোপাল হালদার বর্ণনা করেছেন — ''রাজশক্তি হারিয়ে হিন্দু সমাজ প্রাণপণ প্রয়াসে আপনার ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরল; তার সহায়তায় আপনার সমাজকে সংরক্ষণ করতে চাইল। এই ভাব গ্রহণ করলেন স্বভাবতই হিন্দু উচ্চবর্ণ, বিশেষ করে স্মার্ত পণ্ডিতেরা। তাঁরা হিন্দুর জাতিভেদ ও আচারধর্মের গণ্ডির মধ্যে হিন্দু সমাজকে আরও সংকীর্ণ, আরও অনমনীয়, আরও রক্ষণশীল ও বর্জনশীল করে সংগঠিত করলেন। প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে প্রত্যেক বর্ণের ব্যবধান তখন থেকে আরও দুস্তর হয়ে গেল, আচারে বিচারে কোনো উদারতা আর রইল না — ম্লেচ্ছ-সংযোগ রাজা যদুর মতো যার যেভাবেই ঘটুক তাকেই বর্জন করা হল নিয়ম। বলা বাহুল্য এ পদ্ধতির সামাজিক প্রতিরোধ আসলে প্রগতিমূলক নয়, দুদিন পরেই তা পরিণত হয় প্রতিক্রিয়ায়। অবশ্য এরূপ বজ্রবন্ধনে সমাজকে না বাঁধলে সেদিন হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজ ইসলামের প্লাবনে তলিয়ে যেত।

কারণ, তখন বিপদ আসছিল দুদিক থেকেই — একদিকে রাজধর্ম হিসাবে ইসলামের অসীম প্রতিপত্তি, অন্যদিকে সুফী, পীর, ফকির, দরবেশদের প্রচারে ইসলামের সহজ লোকপ্রিয়তা।''

ইসলামের এই দ্বিমুখী অনুপ্রবেশের বিষয়টি মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বলে মনে করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রও। 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধের শেষে তিনি বলছেন — ''এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশ যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক — কৃষিজীবি। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবি হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম ত্যাগ করিল ? কেন মুসলমান হইল ? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে ? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।''

মন্তব্য

সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রসারের কারণ হিসেবে অনেক ঐতিহাসিক ইসলাম ধর্মের সামাজিক সমানাধিকারের বিষয়টিই ক্রিয়াশীল বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দার মনে করেন ভারত পর্যন্ত এসে পৌঁছোনোর পথে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও সেই সামাজিক সাম্য মোটামুটি বজায় ছিল। ''সামাজিক সমানাধিকারের এই আদর্শ এবং শ্রেণীগত সংস্কারের অনুপস্থিতিই বর্ণ-সংস্কারের জর্জরিত ভারতে ইসলামের বিজয়াভিযানের অন্যতম কারণ। আর ইসলামের পরিধির বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন উৎপীড়িত মানুষের কাছে ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ ও প্রলোভনরূপে কাজ করেছে। হিন্দু-সামাজিক সংস্থার নির্মম বিধানে যারা নির্যাতিত হচ্ছিল — বর্ণ-সমাজের অন্তর্গত নিম্ন বর্ণগুলি এবং বর্ণ-সমাজের বাইরের অস্পৃশ্য জাতিগুলি — তারা ইসলামিক সমাজ সংস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ করেছে। হিন্দু সমাজের বিধান-দাতাদের নিকট যারা ছিল শূদ্র এবং অস্পৃশ্য পর্যায়ের, ইসলাম তাদের দিলো মুক্ত মানুষের অধিকার, এবং তাই নয়, ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রভুত্ব করার ক্ষমতা। চৈতন্যদেবের আমলে বিবদমান হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতি উভয়ের বুকে ক্ষয়ের চিহ্ন বর্তমান থাকলেও, এইখানেই তুলনায় মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি ছিল প্রগতিশীল, আর সেজন্য তার বিজয়ও হয়েছে অপ্রতিহত। সামাজিক চিন্তাধারার এই উদারতা এবং সমানাধিকারের আদর্শই ভারতের সমাজেতিহাসে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।" ['মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ', পৃ. ৩৮]

তবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যেভাবে আত্ম সংরক্ষণের প্রয়াস করছিল তার প্রমাণ এই সময়কার অনুবাদ কাব্যগুলিতে প্রচুর পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এও ব্রাহ্মণ্যধর্মের রক্ষাকারী হিসাবেই রামকে চিত্রিত করা হয়েছে। তার উদাহরণগুলি আমরা পরে উল্লেখ করব। এই সময়কার ধর্ম-সামাজিক ইতিহাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ভগবানের স্নেহময়, রক্ষাকারী, ভক্তবৎসল রূপের সন্ধান।

জনসাধারণের এই প্রবণতাই বাল্মীকির 'নরচন্দ্রমা' রামকে পরিণত করেছিল ভক্তবৎসল দেবতায় যিনি তাঁর শত্রুরও আরাধ্য এবং বরদাতা। দেবী চণ্ডী কিংবা মনসার ভক্তবৎসলতাই তাঁদের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। বাংলার প্রচলিত শৈবধর্মের জনগণের কাছে দুর্গমতার কারণ আলোচনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন — ''জনসাধারণ 'শিবোহহং' বাক্য উচ্চারণ করিতে কখনও

সাহস করে নাই। ভগবানকে পিতৃরূপে এবং মাতৃরূপে তাহারা প্রত্যক্ষ করিতে চায়। বোধহয় শক্তি আরাধনা এইজন্য তাহাদিগকে অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছিল। ....বিশেষতঃ, যখন মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছিল, তখন তাহারা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে নাই। মুসলমানবিজয়ের পর এইজন্য শক্তি এবং বৈষ্ণবধর্ম বিশেষভাবে পুষ্টি লাভ করিয়াছিল।" ['বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ১ম খণ্ড পৃ. ১১২]

'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এ এমন অনেক ঘটনার সংযোজন পাওয়া যায় যেগুলি শক্তি এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবের কারণেই এসেছে।

৩। সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ঃ—

সামাজিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু ব্রাহ্মণেরা সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করলেন ফলে টোলে, চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতচর্চার পুনরুজ্জীবন ঘটল। দর্শন-স্মৃতি ন্যায়ের চর্চায় পীঠস্থান হয়ে উঠল নবদ্বীপ।

পাশাপাশি মুসলমান শাসকরাও উৎসাহিত বোধ করলেন বাংলার সংস্কৃতি চর্চায়। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুদিত হল 'ভাগবত', 'মহাভারত', 'রামায়ণ'।

তুর্কিবিজয়-পরবর্তী বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিবরণ শেষ করা হল 'শূন্যপুরাণ'-এর 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'-র কিছু অংশ উদ্ধৃত করে, যাকে সুকুমার সেন বিজিত মানুষের অদৃষ্টবাদ হিসেবে দেখেছেন। সাধারণ মানুষ মুসলমান বিজয়কে মেনে নিল এইভাবে —

'ধর্ম হৈলা যবনরূপী শিরে পরে কাল টুপি
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান;
চাপিয়া উত্তম হয় দেবগণে লাগে ভয়
খোদায় হইল এক নাম।
ব্রহ্মা হৈল মোহাম্মদ বিষ্ণু হৈল পেগম্বর
মহেশ হইল বাবা আদম,
গণেশ হইল কাজী কার্ত্তিক হইল গাজী
ফকীর হইল মুনিগণ।
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল শেখ
পুরন্দর হইল মৌলানা,
চন্দ্র সূর্য আদি যত পদাতিক হইয়া শত
উচ্চস্বরে বাজায় বাজনা।'

৮.৪ রামায়নের অনুবাদকগণ

মন্তব্য

এই অনুচ্ছেদে আমরা সংক্ষেপে পরিচয় নেব কৃত্তিবাস-পরবর্তী কবিদের 'রামায়ণ' অনুবাদগুলির এবং বাংলা ব্যতীত অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রচিত 'রামায়ণ'গুলি সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিক আলোচনা করব।

১। **অদ্ভুত আচার্যের 'রামায়ণ'**

উত্তরবঙ্গের ষোড়শ শতকের এই কবির রামায়ণের বৈশিষ্ট্য হল প্রচুর পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্ভুক্তি। কবি বর্ণিত কাণ্ডগুলির নাম — আদ্য, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা ও উত্তরা। তাঁর কাব্যে বিষ্ণুর রাম রূপে বাল্মীকিকে দর্শন প্রদান, কদ্রু-বিনতার কাহিনী, শিব-পার্বতীর বিবাহ, বলির বৃত্তান্ত, প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের উপাখ্যান প্রভৃতি পাওয়া যায়। তবে কবির সংযুক্ত কাহিনীগুলির সঙ্গে প্রায়ই মূল কাব্যের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পাওয়া যায় না।

২। **চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ'**

চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণও বটে। 'রামায়ণ'টি সংক্ষিপ্ত, কারণ এখানে মাত্র তিনটি ঘটনার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় — সীতার জন্ম, রামের জন্ম এবং সীতার বনবাসের কারণ বর্ণনা। এই 'রামায়ণ'এ সীতা — নির্বাসনের একটি অভিনব বর্ণনা পাওয়া যায়। কৈকেয়ীর কুকুয়া নামে একটি কন্যা ছিল। সে একদিন সীতার কাছে রাবণ কেমন জানতে চায়, সীতা মাটিতে রাবণের ছবি একে দেখান এবং কিছুক্ষণ পর শ্রান্তিবশত মাটিতে সেই ছবির পাশে ঘুমিয়ে পড়েন। কুকুয়া তখন রামের কাছে এই 'পাপের' কথা নালিশ করে —

'বিশ্বাস না কর দাদা দেখ গো আসিয়া।
তোমার সীতা নিদ্রা যায় গো, রাবণ বুকে লইয়া।।'

এই কাহিনীর পর 'রামায়ণ'-এর আর কোনো অংশ পাওয়া যায় না। এর আগে রামের হরধনু ভঙ্গ থেকে রাবণ-বধ পর্যন্ত কাহিনী সীতার বারমাস্যা বর্ণনা প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন মেয়েলি অনুষ্ঠানে পূর্ববঙ্গে চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ'-এর বিভিন্ন অংশ গাওয়া হয়।

৩। **শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ'**

এই রামায়ণ 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে খ্যাত। শঙ্কর কবিচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। লবকুশের বিবৃত 'রামায়ণ' গানই কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ'। তাই রাম-সীতার সিংহাসন আরোহনেই কাব্যের সমাপ্তি। কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ'-এর বৈশিষ্ট্য হল তিনি কৃত্তিবাসকে অনুসরণ না করে একটি স্বতন্ত্র 'রামায়ণ' রচনা করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি বাল্মীকি, অধ্যাত্ম প্রভৃতি সংস্কৃত 'রামায়ণ' ছাড়াও 'মহাভারত'-এর রামকাহিনী, 'ভাগবত' প্রভৃতি পুরাণের রামকথা এবং তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কবি প্রধানত রামের উপাখ্যানটিই বর্ণনা করতে চেয়েছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বিশ্বামিত্রের বংশবৃত্তান্ত, গঙ্গা উপাখ্যান, সগর রাজার উপাখ্যান ইত্যাদি বর্জন করেছেন। কবিচন্দ্রের 'রামায়ণ' সংক্ষিপ্ত ও একমুখী।

৪। **রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামায়ণ'**

কবি রামমোহনের জন্ম নদীয়া জেলার মটেরি গ্রামে। পিতার আদেশে তিনি বাড়িতে রামের মন্দির ও মূর্তি স্থাপন করেন। হনুমানের স্বপ্নাদেশে কবি 'রামায়ণ' রচনা করেন, তাই তাঁর কাব্যে হনুমানের প্রশস্তি দেখা যায়। হনুমানকে তিনি শিবের অবতার
বলেছেন এবং হনুমানের পূজা রামের পূজার সদৃশ বলেছেন।

রামমোহনের কাব্যে একাধারে বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ ও শাক্তপ্রভাব দুই-ই লক্ষ করা যায়। তিনি তুলসীদাস ও কৃত্তিবাসের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। সংস্কৃত 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর অনুসরণে তাঁর কাব্যে দশমুখ রাবণ ও শতমুখ রাবণের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাম দশমুখ রাবণকে বধ করেছিলেন। সীতা কালিকা মূর্তিতে শতমুখ রাবণকে বধ করেছিলেন।

৫। **বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষের 'নূতন রামায়ণ'**

কবি নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি এও জানিয়েছেন মহাকালীর ইচ্ছায় তিনি বুদ্ধের অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং হনুমানের আজ্ঞায় 'রামায়ণ' রচনা করেছেন। তিনি রাম এবং দারুব্রহ্ম জগন্নাথ উভয়কেই বুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর 'রামায়ণ'-এর কাহিনী-কাঠামো মূল 'রামায়ণ'-এর মতো হলেও যাগ, যোগ ও সাধনের বর্ণনা প্রচুর।

সেখানে বৌদ্ধ তন্ত্রাচার ও যোগাচারের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর কাব্যে রামের বাল্যকালের বর্ণনায় এবং বিভিন্ন পারিবারিক ক্রীড়া বর্ণনায় বাঙালির জীবনযাত্রার চিত্র পাওয়া যায়।

৬। **জগৎরাম ও রামপ্রসাদের 'রামায়ণ'**

সংস্কৃত 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর অনুকরণে বাংলায় 'রামায়ণ' রচনা করেন জগৎরাম ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদ। এই রামায়ণে আটটি কাণ্ড আছে — আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা, পুষ্কর ও উত্তরকাণ্ড। পুষ্করকাণ্ডের শেষাংশ রামরাস।

মন্তব্য

জগৎরাম প্রথমে সমগ্র 'রামায়ণ'টি রচনা করেন, পরে লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড পুত্র রামপ্রসাদ কর্তৃক বিস্তৃতভাবে লেখা হয়। পুথিটি সমাপ্ত হয় ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে। এই 'রামায়ণ'-এ ভরদ্বাজ-বাল্মীকি সংবাদে বিশেষভাবে সীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পুষ্করকাণ্ডটি বিশেষত্বমণ্ডিত। এই কাণ্ডেই সীতার হাস্যতত্ত্ব, পুষ্করাধিপ সহস্রস্কন্ধ রাবণের বৃত্তান্ত, সহস্রস্কন্ধ রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে রামের পরাজয়, সীতার মহাকালীরূপধারণ, সীতা কর্তৃক রাবণ বধ ও রাম-কর্তৃক প্রকৃতিরূপা সীতার স্তব বর্ণিত হয়েছে। এরপর
রামরাস। রামরাস সংস্কৃত 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এ নেই। এটি সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা এবং এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।

এই 'রামায়ণ'এ অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত উভয় 'রামায়ণ' একত্র করা হয়েছে। এছাড়া সহজিয়া বৈষ্ণব মত ও শক্তিবাদের প্রভাবও লক্ষ করা যায়।

৭। **রঘুনন্দন গোস্বামী-কৃত 'রাম রসায়ন'**

বাংলা 'রামায়ণ'-এ বৈষ্ণবীয় প্রভাবের বৃদ্ধির উদাহরণ রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রাম রসায়ন'। কবির জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে, বর্ধমানে। রাম-সীতার চরিত্র রচনা করার সময় কবির আদর্শ ছিল রাধা ও কৃষ্ণের চরিত্র। এই 'রামায়ণ' রামের বীরভূমিকার থেকে প্রেমিকরূপের পরিচয়ই বেশি পাওয়া যায়। সীতার বিরহে রামের বিলাপে তাই বৈষ্ণব কবিদের অনুসরণ লক্ষ করা যায়।

৮। **ষষ্ঠীবর ও গঙ্গানাথ দাসের 'রামায়ণ'**

ষষ্ঠীবরের জন্ম অষ্টাদশ শতকে বিক্রমপুরে। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তিনি ও তাঁর পুত্র গঙ্গানাথ 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও মনসাদেবীর উদ্দেশ্যে অনেক গান রচনা করেন। তাঁদের 'রামায়ণ' মূলত গীতি-'রামায়ণ'। 'রামায়ণ'- কাহিনী রচনা করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল 'রামায়ণ' — কাহিনী অবলম্বনে গান রচনা করে জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়া। গঙ্গানাথ দাসের বর্ণনায় কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

৯। **রাবণ — 'রামায়ণ'**

এই 'রামায়ণ'-এ ছটি কাণ্ড আছে — উদ্ভবকাণ্ড, শোভনকাণ্ড, সন্তাপকাণ্ড, মৈথিলীকাণ্ড, সংহারকাণ্ড এবং মীমাংসাকাণ্ড। এই কাব্যের অনেক কাহিনী বাল্মীকি 'রামায়ণ' বহির্ভূত কিন্তু সেগুলি কবির মৌলিক সৃষ্টি নয়, অন্যান্য 'রামায়ণ' থেকে সংগৃহীত।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে 'রামায়ণ'-এর বঙ্গানুবাদ

বর্ধমান রাজসভা থেকে বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এর সম্পূর্ণ গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ থেকে ১৮৮২ এই দীর্ঘ ষোলো বছর ধরে। রাজা মহাতাব চন্দ ও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আফতাব চন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় আশুতোষ শিরোরত্ন, আশুতোষ শিরোমণি, অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন, তারকনাথ তত্ত্বরত্ন, রাজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন প্রমুখ পণ্ডিতরা এই অনুবাদ সমাপ্ত করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৬৯-৮৪) সমগ্র বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এর গদ্যানুবাদ করেন।

এছাড়া কবি রাজকৃষ্ণ রায় পদ্যে সমগ্র 'রামায়ণ' অনুবাদ করেন। বিংশ শতাব্দীতে রাজশেখর বসু গদ্যে সমগ্র বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এর সারানুবাদ করেন।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার 'রামায়ণ'

উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অসমিয়া, বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি-র আগেই দক্ষিণ ভারতের তিনটি প্রাদেশিক ভাষায় 'রামায়ণ' রচিত হয়। জৈন ঐতিহ্যে লিখিত হয় প্রথম প্রাদেশিক ভাষার রামকথা — কর্ণাটক ভাষায় — 'পম্পা রামায়ণ' (১০০০ - ১০০০ খ্রি.)। হিন্দু ঐতিহ্যে রচিত প্রথম প্রাদেশিক ভাষার 'রামায়ণ' — তামিল ভাষায় কবি কম্বনের রচিত 'কম্ব রামায়ণ' (১১০০ - ১২০০ খ্রি.)।

তেলুগু ভাষায় রামকথার প্রথম প্রকাশ ১২০০-১৩০০ খ্রিস্টাব্দে তিক্কনের 'নির্বাচনোত্তর রামায়ণ'। অসমিয়া ভাষায় চতুর্দশ শতকে মাধব কন্দলী এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে শঙ্করদেবের 'রামায়ণ' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ওড়িয়া ভাষায় রামকথা দুই ভাগে বিভক্ত — পুরাণ ও কাব্য। বাল্মীকি-'রামায়ণ'কে অবলম্বন করে যাঁরা 'রামায়ণ'-এর উৎকলীয় সংস্করণ রচনা করেন তাঁদের মধ্যে মহাকবি শারলা দাস, বলরাম দাস, কৃপাসিন্ধু দাস, নরসিংহ মাঠ, বালকৃষ্ণ করের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রাজকবি কৃষ্ণচন্দ্র রাজেন্দ্র, কৃষ্ণচরণ পট্টনায়ক এবং আধুনিক যুগের কপিলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, ফকির মোহন
সেনাপতি প্রমুখ 'রামায়ণ' অনুবাদ করেন। হিন্দি ভাষায় সর্বাপেক্ষা প্রভাবসঞ্চারী রামায়ণ হল তুলসীদাস দুবের (১৫৩২ - ১৬২৩) 'রামচরিতমানস'। তুলসীদাস ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি শেষ করেন। তুলসীদাসের রচনায় মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর রাম শরণাগতবৎসলতা, ভক্তবৎসলতা, দীনবৎসলতা, গুরুভক্তি ও স্নেহ-প্রেম ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্যই বিপুল জনপ্রিয়তা ও ভক্তি লাভ করেছেন।

৮.৫ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণ

মন্তব্য

বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হবার আগেই বাংলা ভাষায় না হলেও বাংলাদেশে রামায়ণ চর্চা ছিল। তার প্রমাণ অভিনন্দ (আনু, খ্রী. ৯ম শতক) রচিত সংস্কৃত রামচরিত কাব্য। তাঁর পরে সন্ধ্যাকর নন্দীও (খ্রী. ১১শ-১২শ শতক) একটি রামচরিত কাব্য লেখেন। এটি দ্ব্যর্থবোধক শ্লেষকাব্য হলেও এর বহিরঙ্গ রামায়ণকে অবলম্বন করেই কল্পিত।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির উদ্ভবের পর সংস্কৃত রামায়ণ কাহিনী অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও প্রচারিত হয়। তবে রামায়ণ কাহিনী তখন গান, কথকতা ও পাঁচালী আকারে প্রচলিত ছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণও পাঁচালী কিংবা গান হিসেবে গাওয়া হত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে —

'বীণা যন্ত্রে কুশীলব রামায়ণ গায়।
মুনি ঋষি আদি সবে বিমোহিত তায়।।'

অবশ্য বাল্মীকি রামায়ণেও আছে এই কাব্য পাঠ্য এবং গেয়। যাই হোক কৃত্তিবাসী রামায়ণ শ্রোতাদের সামনে আসরে বসে গীত হত বলে শ্রোতাদের রুচি ও চাহিদার মুখ চেয়ে গায়কেরা নতুন নতুন বিষয় ও রসের অবতারণা করতেন। তাই বাল্মীকির আদর্শে রচিত হলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তা ভাবানুবাদ। —

'বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ, রামায়ণ।।'

আসলে প্রাদেশিক ভাষার সব রামায়ণকেই দেশকালোপযোগী করতে হয়েছিল। তাই বাল্মীকি সমস্ত ভারতীয়দের জন্যে কাব্য লিখেছিলেন, কৃত্তিবাস লিখেছেন শুধু বাঙালীর জন্যে। তবে একা কৃত্তিবাস এই রামায়ণের রচয়িতা নন। বাংলায় যুগে যুগে কত যে রামায়ণ লেখা হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। সেই সব রামায়ণের জনপ্রিয় অংশগুলি কালক্রমে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্তর্গত হয়ে গেছে এবং কৃত্তিবাস একাই সমস্ত গৌরব আত্মসাৎ করেছেন। ফলে আজকাল আমরা যে রামায়ণখানি পাই, তা শুধুমাত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ নয়, সেটি আসলে বাংলাদেশের জাতীয় মহাকাব্য।

১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর চেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে সর্বপ্রথম সমগ্র সাতকাণ্ড রামায়ণ মোট পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা এদেশী পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে একাজ করেছিলেন। তবে প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনার আধুনিক রীতি তাঁদের জানা ছিল না। তাই হাতের কাছে রামায়ণের যে পুঁথি তাঁরা পেয়েছিলেন তা অবলম্বন করে এবং সে যুগের ভাষা ও শব্দ অনুসারে পুরনো পুঁথির পাঠ বদলে ফেলে তাঁরা রামায়ণ মুদ্রিত করেছিলেন। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে পুঁথির পাঠ অবিকলভাবে গ্রহণ করা হয়নি। তবে এ পর্যন্ত যত পুঁথি পাওয়া গেছে তা শ্রীরামপুরী সংস্করণের চাইতেও আধুনিক। যাই হোক এই সংস্করণে ছন্দের সমতার জন্যে কিছু কিছু শব্দ যোজিত হয়েছে, কিছুবা বাদ গেছে, ভাষার ত্রুটিও কিছু কিছু সংশোধিত হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে বটতলা থেকে প্রকাশিত রামায়ণে যেমন যে কেউ যেমন খুশি হস্তক্ষেপ করেছিল, সেরকম কোনো আমূল পরিবর্তন শ্রীরামপুরের প্রথম সংস্করণে দেখা যায় নি।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের আগে কলকাতায় মুদ্রিত রামায়ণের কোনো কপি পাওয়া যায় নি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালংকারের সম্পাদনায় ১৮৩০-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে রামায়ণের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। শোনা যায় জয়গোপাল নাকি বলতেন, ''কৃত্তিবাসের রচনা বড় গ্রাম্য শব্দে দুষ্ট, বড়ই অশুদ্ধ, ভাবের অনেক স্থানে অসংলগ্নতা রহিয়াছে'' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০১)। আসলে জয়গোপাল এবং সে যুগের সাহিত্যরসিকরা বিশ্বাস করতেন যে কৃত্তিবাসী পুঁথিতে অনেক ভুলত্রুটি আছে এবং মুদ্রণের সময়ে তার সংশোধন ও পরিমার্জন করা দরকার। কাব্যের অধ্যাপক জয়গোপালের নিজেরও কিছু কবিত্বশক্তি ছিল। ফলে সম্পাদনার সময়ে তিনি প্রথম সংস্করণের ত্রুটিযুক্ত পাঠ ও ছন্দোপতন সংশোধন করে এবং প্রয়োজন মতো সংযোজন করে কাব্যটি আগাগোড়া সংস্কার করে দিয়েছিলেন।

এই জাতীয় সংস্কারের ফলে কাব্যটি সুখপাঠ্য হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কৃত্তিবাস পণ্ডিতের আদি ও অকৃত্রিম রচনা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। অবশ্য একথাও আমরা মানতে বাধ্য যে কৃত্তিবাসের আদি ভাষা যথায়ত রক্ষিত হলে এ কাব্য কীট-কবলিত হয়ে শুধু অতি উৎসাহী গবেষকের আলোচনার বস্তু হত। এমন ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়ে আধুনিককাল পর্যন্ত তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারত না। আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে মানসিক ঐতিহ্যের প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে অপরিহার্যভাবে

মন্তব্য

জড়িয়ে গেছে, চারিত্রনীতি ও গৃহধর্মের আদর্শ থেকে প্রবাদে প্রবচনে বাগ্‌ধারায় যেভাবে ওতপ্রোতভাবে মিশে যেতে পেরেছে তার জন্যে আমরা জয়গোপালী রামায়ণের কাছে ঋণী।

৮.৬ ঃ বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা

মহাকবির কবিত্বে থাকে সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তির বিশালতা, ভাবের সমুন্নত মহিমা ও ত্রিলোকসঞ্চারী গতিবিধি। বাল্মীকির আলোকসামান্য প্রতিভা কল্পনার প্রসারে, ভাবের গাম্ভীর্যে ও ভাষার ওজস্বিতায় তাঁর রচিত রামায়ণকে মহাকাব্য পদবাচ্য করে তুলেছে। অন্যদিকে সংকীর্ণ কল্পনা ও সীমিত অভিজ্ঞতা কৃত্তিবাসের রামায়ণকে পাঁচালি কাব্যের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে। তাই বাল্মীকির মহাকাব্যিক কল্পনা যখন সমুদ্র, পর্বত ও সীমাহীন আকাশে বিচরণ করে ফিরেছে, কৃত্তিবাসের কল্পনা তখন পল্লীর কুটীরপ্রাঙ্গণ ও পানাপুকুরের সীমানা ছাড়াতে পারেনি। সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য বা বনচর পশুপাখি বাল্মীকির অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা বা সুন্দরকাণ্ডে বারবার এসেছে। কিন্তু সমুদ্র, পর্বত বা অরণ্য যেহেতু বাঙালী শ্রোতাদের অভিজ্ঞতার বাইরে তাই স্বভাবতঃই সে সম্পর্কে তাদের আগ্রহ জাগেনি, কৃত্তিবাসও তা বর্ণনা করতে পারেন নি।

স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বশক্তির উল্লাসে বাল্মীকি প্রকৃতি-জগৎকে দেখেছেন এবং দণ্ডকারণ্যের শোভা, বর্ষাগমে ও শরৎকালে মাল্যবান পর্বতের সৌন্দর্য ইত্যাদি বর্ণনায় শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করেছেন। আবার মানবমনের সঙ্গে তার সম্পর্ক, সেকালের মানুষের আচার-আচরণ, প্রমোদ ও সম্ভোগ, আযোধ্যাপুর ও স্বর্ণলঙ্গাপুরীর অতুল বৈভব ইত্যাদিও সমান দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলে সমগ্রভাবে একটা রসঘন সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেছেন। এই রসদৃষ্টি ও বর্ণনানৈপুণ্য কৃত্তিবাসের কাছে আশা করা যায় না। সেইজন্যই কৃত্তিবাসের বর্ণনায় চিত্রকূট পাহাড় সমতল বাংলার ধানখেতের পাশে নেমে আসে, কল্লোলিত সমুদ্র বাংলা দেশের খাল-বিল-জলাশয়ে পরিণত হয় আর রাম রাবনের যুদ্ধ দুই জমিদারের কলহদ্বন্দ্বে গিয়ে দাঁড়ায়।

আসলে কবিত্বময় সৌন্দর্যসৃষ্টি কৃত্তিবাসের লক্ষ্য ছিল না। তিনি বাঙালীয়ানার সঙ্কীর্ণ বাতায়ন থেকে দেখে রামকাহিনীর অন্তর্গত ঘটনার জাল বুনে গেছেন। তাই বাল্মীকি-রামায়ণে কুণ্ঠাহীন দৃষ্টিতে দেখা বৈদিক ক্রিয়াকর্ম-সমন্বিত এক উদার সর্বভারতীয় সমাজের ছবি দেখতে পাই। আর কৃত্তিবাসে পাই বাঙালীর প্রথা ও সংস্কারবদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের যথাযথ সমাজচিত্র। বাঙালীর নৈতিক ও ধর্মীয় মুল্যবোধগুলি তাতে সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। অহল্যার বৃত্তান্ত বা লক্ষ্মণের গণ্ডিদান ইত্যাদি প্রসঙ্গে পাই তার প্রতিফলন।

বাল্মীকি রামায়ণে দেখি রামের জীবিতকালে বাল্মীকি ছিলেন এবং রামের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার (বনবাস, সীতাহরণ ও উদ্ধার ইত্যাদি) অব্যবহিত পরেই সম্ভবতঃ রামায়ণ রচনা করেছিলেন। আর কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখি রামজন্মের ষাট হাজার বছর আগেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন —

‘রামজন্ম পূর্বে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর।।’

রাম না হতেই রামায়ণ ইত্যাদি প্রবাদবাক্যও একথা সমর্থন করে। তবে এগুলি নিতান্তই জনশ্রুতি যার কোনে ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

রামায়ণে বর্ণিত চরিত্রগুলির চিত্রণেও বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য চোখে পড়ে। বাল্মীকির রাম ‘নরচন্দ্রমা’ বা নরশ্রেষ্ঠ কিন্তু তিনি দেবতা নন। তাই সর্বগুণাধার হয়েও তিনি মানবিক দুর্বলতার অতীত নন। তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ হলে মারীচের রাক্ষসী মায়ায় কেন ভুলবেন ? অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে সীতার উদ্ধার সাধনের পর কোন মনোবিকারের বশে সীতাকে দেখে তাঁর মনে হবে ‘নেত্ররোগীর সামনে দীপশিখার মতো অসহনীয় !’ মানুষী অবমাননা থেকেও মুক্তি নেই বলে তাঁকে স্বীকার করতে হয় বালীহত্যার হীনতা, সীতাবর্জনের কলঙ্ক, শম্বুকবধের অপরাধ। কিন্তু এগুলিই প্রমাণ করে যে তিনি নিতান্তই মানুষ। কিন্তু কৃত্তিবাসের ভক্তবৎসল রাম স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার। ঘটনার দিক দিয়ে তিনি বাল্মীকির অনুসরণ করলেও তাঁর করুণাময় পতিতপাবন মূর্তিকেই কৃত্তিবাস উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন। রামের হাতে নিহত হওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্যেই তরণী সেন, বীরবাহু এমন কি রাবণ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় যুদ্ধে গেছেন। আবার কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে অকারণে রামনামের মাহাত্ম্য কীর্তন করে রামের অবতারত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

বস্তুতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রধান হয়েছে দুটি রস — ভক্তিরস আর কৌতুকরস। ভক্তিরসের উপাদান সম্ভবতঃ বিভিন্ন সময়ে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে এসেছে। আর শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্যে

কৃত্তিবাস কখনও উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত উপাদান প্রয়োগ করে কখনও বক্র মন্তব্যে সরস করে কখনও বা বাঙালী সমাজসুলভ স্থূল রঙ্গ-রসিকতার মধ্যে দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। তবে সংস্কৃত শব্দ ও বাক্যের উদাত্ত ওজস্বিতায় বাল্মীকি যখন বীর ও রৌদ্ররসের ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে সার্থক হয়ে ওঠেন তখন কৃত্তিবাস যুদ্ধ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে, বাংলা বাগ্‌ভাণ্ডারে রৌদ্ররস পরিবেশনের উপযোগী শব্দসম্ভারের দীনতায় ও পয়ার ছন্দের একটানা সুরের আবেশের ফলে বীররস সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে যান। তাই যথেষ্ট হুঙ্কার ও আস্ফালন সত্ত্বেও বীররসের উপযুক্ত পরিবেশ তিনি তৈরী করে উঠতে পারেন নি। তেমনি বাংলা ভাষার পেলব ও নমনীয় শব্দযোজনায় ও সকরুণ তানে কৃত্তিবাস অশ্রুর প্রবাহ বইয়ে দিলেও বাল্মীকির মতো শোকের অন্তর্দাহ ও বিষাদের স্তব্ধ গাম্ভীর্য সৃষ্টি করতে পারেন নি।

বাল্মীকির প্রতিটি শ্লোকই প্রায় অলংকার-ভূষিত কিন্তু সেই অলংকার স্বচ্ছন্দ ও সংক্ষিপ্ত। উপমা অলংকারই বেশি। আর তিনি সমুদ্র, পর্বত বা আকাশ থেকে তাঁর উপমান আহরণ করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস তাঁর অতি চেনা পল্লীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে 'কলার বাগুড়ি' কিংবা 'কুমোরের চাক' থেকে উপমান সংগ্রহ করে ফেরেন। অবশ্য প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃত অলংকারও তিনি ব্যবহার করেছেন —

'চরণে নুপুর বাজে রুনুঝুনু শুনি।
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি।।'

কিন্তু দেশীয় উপমা ব্যবহারেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুপ্রাসের ব্যবহার কৃত্তিবাসে প্রচুর। যেমন —

'শ্রীরাম আইল দেশে পড়ে গেল সাড়া।
ঝা গুড়গুড় বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডাল পাড়া।।'

কিংবা —

'ডাল ভাঙ্গে হনুমান শব্দ মড়মড়ি।
আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি।।'

শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে বাল্মীকির অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য চোখে পড়ার মতো। বাল্মীকির সরল প্রাঞ্জল ভাষায় প্রসাদগুণ কিশোর রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল (মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা)। অবশ্য কৃত্তিবাসের ভাষাও সহজ ও সরল। তবে তাতে মহাকাব্যিক মহিমা নেই। তাঁর রামায়ণে ছড়া-পাঁচালীতে ব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগরীতি অনেক সময়েই চোখে পড়ে। যেমন 'সুবুদ্ধি পরশুরামে কুবুদ্ধি লাগিল' ইত্যাদি।

কৃত্তিবাস আর্ষ রামায়ণের বিশাল ও ব্যাপক কাহিনীর মহাকাব্যোচিত গতিময়তার মর্যাদা রাখতে পারেননি। অনেক জায়গাতেই তিনি মূল কাহিনীকে সঙ্কুচিত করে নিয়েছেন। কৃত্তিবাসের আঁকা চরিত্রগুলিও ভাবাদর্শের মহনীয়তা বা অমানুষিক বর্বরতা কোনদিক দিয়েই মহাকাব্যের যোগ্য হয়ে ওঠেনি। সৌন্দর্যসৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন কৃত্তিবাসের রচনায় বাল্মীকি বর্ণিত নিসর্গসৌন্দর্যের কোনো জায়গা হয়নি। ভাষা এবং অলংকার প্রয়োগেও কৃত্তিবাসের সীমাবদ্ধতা তাঁর রামায়ণকে মহাকাব্যের গৌরব থেকে বিচ্যুত করেছে। তবে কৃত্তিবাস যে নিঁখুত নৈপুণ্যে বাঙালীর মনোভাবের অনুকূল করে বাঙালী সমাজকে, তার জাতীয় জীবনের ভাবাদর্শকে তুলে ধরেছেন তাতে তা বাঙালীর জীবনকাব্য হয়ে উঠেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আসল গৌরব এইখানেই।

৮.৭ ঃ কবি কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় ও কৃত্তিবাস সমস্যা

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বিগত পাঁচশো বছর ধরে সারা বাংলার ঘরে ঘরে গীত ও পঠিত হয়ে আসছে। রাজমহল থেকে চট্টগ্রাম এবং উড়িষ্যার উপকূল থেকে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল যে কাব্যের রসধারায় প্লাবিত, দুঃখের বিষয় তার রচয়িতা সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলার মতো যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। জাতীয় কবি সম্পর্কে আমাদের এই উদাসীনতাই প্রমাণ করে যে আমরা সত্যিই আত্মবিস্মৃত জাতি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও এই পূর্বসূরীর কোনো উল্লেখ পাই না। একমাত্র জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে কৃত্তিবাসকে স্মরণ করেছেন —

'রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালি করিল কৃত্তিবাস অনুভবি।।'

তারপর ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কোনো বাঙালী কৃত্তিবাসের ব্যক্তি-পরিচয় জানতে উৎসুক হয়নি। শ্রীরামপুরে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম সংস্করণ (১৮০২-০৩) বা জয়গোপাল তর্কালংকার সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণেও (১৮৩০) কৃত্তিবাসের জীবন সম্পন্ধে কোনও জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

মন্তব্য

প্রথম ছাপার অক্ষরে কৃত্তিবাস পরিচয় দেখা যায় হরিশচন্দ্র মিত্রের 'কৃত্তিবাসের পরিচয় সংগ্রহ' নামক পুস্তিকায় (১৮৭০)। সম্ভবতঃ কুলজী গ্রন্থের সঙ্গে মিল রেখে কোনো রামায়ণ গায়ক বা কথক এই আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক বিবরণীটি রচনা করেছিলেন। তার কিছু পংক্তি এরকম —

'মুরারি নামেতে ওঝা ছিলেন কাশীবাসী।
করিলেন বসবাস ফুলিয়াতে আসি।।
হইলেন তাঁহার পুত্র বনমালী নাম।
রামভক্ত অনুরক্ত নানা গুণধাম।।
বাপ বনমালী ওঝা মান্‌কি উদরে।
জন্মিলেন কৃত্তিবাস চারি সহোদরে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতে জন্ম শুভক্ষণ।
ভাষা করি রচিলেন গ্রন্থ রামায়ণ।।
পরম আদরে বন্দি তাঁহার চরণ।
গাইব রচিলা যেমন রামায়ণ।।'

১৩০১ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত্তিবাসের বিভিন্ন পুঁথি ও মুদ্রিত রামায়ণ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তবে কৃত্তিবাসের ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে কোনো তথ্য তিনি দিতে পারেন নি। অবশ্য তখন থেকেই এ বিষয়ে মানুষের সচেতনতার সৃষ্টি হয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমিতি' গঠিত হয় (১৩০২)। তাতে যোগশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ পণ্ডিতেরা গবেষণা করে অনেক নতুন তথ্য উদ্ধার করলেও কৃত্তিবাস সমস্যার সমাধানসূত্র পাওয়া যায়নি। পণ্ডিতদের সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে অনেক অংসগতি আছে। তাঁদের কারো সঙ্গে কারো মতের মিল হয়নি। ১৩০৪ সালে নগেন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাণ্ডে সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় — শীর্ষক পয়ারের প্রথম ন'টি ছত্র উদ্ধৃত করেন। তাঁর পরে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০১) কৃত্তিবাসের একটি ১৫২ ছত্রের পূর্ণাঙ্গ আত্মবিবরণী প্রকাশিত হয়।

হুগলী জেলার বদনগঞ্জ নিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি এক বৃদ্ধ কথকের কাছে রামায়ণের অনেকগুলি পুঁথি পান। তারই একটি পুঁথিতে (১৫০১ খ্রীঃ অনুলিখিত) ভক্তনিধি মশায় কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ সংক্রান্ত পয়ারগুলি পান। কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের দীনেশচন্দ্র এই খবর পেয়ে ভক্তিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন ভক্তনিধি ওই আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পয়ারগুলি নকল করে তাঁকে পাঠান। ভক্তনিধি মূল পুঁথি কাউকেই দেখাননি। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাখা চারটি পুঁথির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে ওই আত্মবিবরণী জাল বা মিথ্যা নয়।

এর কিছুদিন পরে ডঃ ভট্টশালী নগেন্দ্র বসুর কাছে রক্ষিত কুলজী পুঁথিগুলি কিনে আনার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার অধ্যক্ষ ড. সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠান। সুবোধচন্দ্র পুঁথিগুলি দেখেছিলেন এবং আদিকাণ্ডের একটি পুঁথির প্রথম তিনটি পৃষ্ঠা পেয়েছিলেন যা নাকি প্রচলিত আত্মবিবরণীর হুবহু অনুরূপ। কিন্তু বসু মশায় পুঁথিগুলি বিক্রি করতে এমন কি নকল করতে দিতেও রাজি হন নি। যা হোক নগেন বসুর মৃত্যুর পর ১৩৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে পুঁথিগুলি কিনে নেন। তখন আদিকাণ্ডের ওই প্রথম তিন পৃষ্ঠা ড. ভট্টশালীর হাতে আসে এবং তিনি সন্ধান পান যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় রাখা ১৫ সংখ্যক খণ্ডিত পুঁথিটিই সম্ভবতঃ ওই তিন পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ। কেননা এই পুঁথির পাতা, আকার ও লেখা ওই তিন পৃষ্ঠার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। তাছাড়া ওই তিন পৃষ্ঠার সব শেষের পংক্তিটি হল — 'নারদ বলে গোসাঞি শুন মোর বাণী'। আর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি শুরু হচ্ছে যে পংক্তিটি দিয়ে তা হল — 'অত্রিক মুনির পুত্র আছে চাবন নামে মুনি।।' বোঝা যাচ্ছে পংক্তি দুটি একই শ্লোকের দুই চরণ এবং সাহিত্য পরিষদের পুঁথিটি আগের তিন পৃষ্ঠার পরবর্তী চতুর্থ পৃষ্ঠা। আবার সাহিত্য পরিষদের পুঁথির বিবরণীতে আছে যে এটি হুগলী জেলা থেকে সংগৃহীত এবং পুঁথির পুষ্পিকায় আছে এটি বদনগঞ্জে লেখা হয়েছিল। সুতরাং এই পুঁথিই বদনগঞ্জের হারাধন দত্তের কাছে ছিল এ অনুমান অসংগত নয়। তবে পুঁথিটি এমনভাবে খণ্ডিত হল কি করে এবং প্রথম তিনপৃষ্ঠা নগেন বসুর কাছে এবং অবশিষ্টাংশ সাহিত্য পরিষদে এল কিভাবে তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না।

দীনেশচন্দ্র সেনের মুদ্রিত আত্মবিবরণে ১৫২টি ছত্র এবং ভট্টশালী সংগৃহীত (নগেন্দ্র বসুর হেফাজতে রক্ষিত) পুঁথিতে ১৮২টি ছত্র পাওয়া যায়। দুই পুঁথিতে ৫০টি ছত্র হুবহু এক। বাকি পংক্তিগুলিতে মিল অল্প, কোথাও নতুন শব্দ, কোথাও বা নতুন পংক্তি যোজনা করা হয়েছে। সুতরাং বাধ্য হয়ে অনুমান করতে হয় যে হারাধন দত্ত যখন দীনেশচন্দ্রকে আত্মবিবরণীটি নকল করে পাঠান তখন এইরকম অজস্র পরিবর্তড় ঘটিয়েছিলেন। এই দুটি ছাড়া ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা

সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত পুঁথি চারটিতে কৃত্তিবাসের পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত, আট থেকে বারো ছত্রের বেশি নয়। এগুলিতে শুধু ফুলিয়া গ্রাম, কৃত্তিবাসের পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী, মাতা মেনকা (মানিকি, মালীকা বা মালিনী), ছয় সহোদর, বড়গঙ্গা পারে বিদ্যাভ্যাসের জন্য যাত্রা এই তথ্যটুকু পাওয়া গেছে। এবার দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে বা ভট্টশালীর পুঁথিতে পাওয়া বিবরণটি দেওয়া হলঃ—

কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গবাসী নরসিংহ ওঝা বেদানুজ রাজার পাত্র ছিলেন। ওই অঞ্চলে 'প্রমাদ' (সম্ভবতঃ মুসলমান অধিকার) হলে ওঝা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে আসেন। ওই গ্রামে ফুলবাগান করে মালীরা বাস করত বলে গ্রামের নাম হয়েছিল ফুলিয়া। তাঁর বংশধর মুরারি ওঝার পুত্র বনমালী। এই বনমালী এবং তাঁর স্ত্রী মালিনীর ছয় পুত্র ও এক কন্যা। কৃত্তিবাস জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি মাঘ মাসের রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মলাভ করেন এবং বারো বছর বয়সে বড় গঙ্গা পার হয়ে উত্তরদেশে বিদ্যালাভের জন্য যাত্রা করেন। আত্মবিবরণীর ভাষায় 'হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ' এবং 'পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার'। এই প্রসঙ্গে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন — কৃত্তিবাস নবদ্বীপে বা তন্নিকটবর্তী কোনও স্থানে পাঠাভ্যাস করিতে যান' (রামায়ণ, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৩, ভূমিকা পৃ. ২৭)। তাঁর যুক্তি হ'ল ফুলিয়া গ্রাম থেকে নবদ্বীপ নিশ্চিত 'উত্তরদেশ' এবং পদব্রজে গেলে তার দূরত্ব যথেষ্ট। তাছাড়া ফুলিয়ার আশপাশে নিশ্চয় গঙ্গার শাখানদী বা খাল ছিল। তাই 'বড়গঙ্গা' বলতে নবদ্বীপের নিম্নবাহিনী ভাগীরথীকেই বোঝানো হয়েছে ভাবা যেতে পারে। বিশেষ তখন গঙ্গার বিশালতা ও গভীরতা যথেষ্ট ছিল। তবে অন্যেরা অনেকেই 'বড়গঙ্গা পারে' বলতে পদ্মাপার বা যশোহর বুঝেছেন। এ বিষয়ে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ধারণা নবদ্বীপ বহুকাল থেকেই পণ্ডিতপ্রধান স্থান। সেখান ছেড়ে কবি বিদ্যালাভের জন্য কেন পদ্মাপার যাবেন — বিশেষতঃ বারো বছর বয়সে।

যাই হোক, দশ-বারো বছর অধ্যায়ন করে তরুণ কবি দেশে ফিরে আসেন এবং গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি সাতটি স্বরচিত শ্লোক গৌড়েশ্বরের কাছে পাঠালে রাজা তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি ন'টি সুসজ্জিত মহল পার হয়ে পাত্রমিত্র পরিবৃত রাজার কাছে পৌঁছলেন। তখন আঙিনায় 'রাঙা মাজুরি' পাতা হয়েছে যার চারদিকে সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রের বেষ্টনী, মাথার ওপর পাটের চাঁদোয়া। মাঘ মাসের সকালে সভাসদসহ রাজা ওই মাজুরিতে বসে 'খরা' অর্থাৎ রোদ পোয়াচ্ছিলেন। রাজার ইঙ্গিতে কবি তাঁকে স্বরচিত শ্লোকগুলি শোনালেন। শুনে রাজা খুশী হয়ে তাঁকে ফুলের মালা এবং একটি পাটের পাছড়া দান করলেন এবং কবির কি প্রার্থনা তা জানতে চাইলেন। কিন্তু নির্লোভ ব্রাহ্মণ কবি 'গৌরব' ছাড়া আর কিছুই চাইলেন না। তারপর তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এবং শেষে গুরু ও বাবা-মা'র আশীর্বাদে তিনি রামায়ণ পাঁচালী রচনা করলেন।

এই অসম্পূর্ণ বিবরণী থেকে তাঁর জন্মসাল বা কোন গৌড়েশ্বরের সভায় তিনি গিয়েছিলেন তা কিছুই জানা যায় না। যাই হোক, বহু গবেষণার পর নানা পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে সম্ভবত ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দই কৃত্তিবাসের জন্মসাল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। আর যে গৌড়েশ্বরের সভায় তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি সম্ভবত হিন্দু রাজা গণেশ। কোনো গবেষক তাঁকে দনুজমর্দন দেব, কেউ তাঁকে কংসনারায়ণ আর কেউ বা (সুখময় মুখোপাধ্যায়) তাঁকে রুক্‌নুদ্দীন বারবক শাহ বলে মনে করেছেন। তবে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার মতো যথেষ্ট প্রমাণের অভাব আজও রয়েছে। তবু তিনি কতদিন জীবিত ছিলেন তাও পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে অনুমান করা গেছে। সম্ভবতঃ তিনি ৭০-৮০ বছর জীবিত ছিলেন।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ কৃত্তিবাসের নিজের রচনা না গায়ক-কথকের রচনা না সম্পূর্ণ কাল্পনিক, সে নিয়েও মতভেদ আছে। এই আত্মবিবরণে কৃত্তিবাসের নিজের প্রশংসা এত বেশি আছে যে স্বয়ং কবির রচনা বলে মনে হয় না। রামায়ণ পুঁথির আরম্ভে যদি কোনো গায়েন কৃত্তিবাসের এই বংশপরিচয় সংযোজন করে থাকেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তবু সব পুঁথিতেই কৃত্তিবাসের বংশপরিচয়ের কোনো হেরফের হয় না। তাই এটির রচয়িতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া না গেলেও আত্মবিবরণীটি যে অলীক নয় তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সমস্যা ঃ- ১৩৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের অবির্ভাবকাল সম্পর্কে নিঃসংশয় মত না দিয়ে বরং বিরোধী মত উত্থাপন করলেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ। এঁরা আবার 'পূর্ণ মাঘ মাসে'র বিচারে ১৩৫৪ শক (১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ) কৃত্তিবাসের জন্মকাল বলে অভিমত পোষণ করেন। এইসব পণ্ডিতদের মতে, কৃত্তিবাস তাহিরপুরের হিন্দু রাজা কংসনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। ''ড. ভট্টশালী এই অভিমতের অসংগতি প্রদর্শন করেন। প্রধানত কুলপঞ্জীর সহায়তায় তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, কংসনারায়নের রাজত্বকাল ছিল আনুমানিক ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে (১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ) জাত কবির পক্ষে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কোনো রাজসভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। বসন্তরঞ্জন রায় বা অপর কোনো

মন্তব্য

প্রতিপক্ষীয় বিশেষজ্ঞ ড. নলিনীকান্তের এই আপত্তি খণ্ডন করেন নি'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১মা পর্যায়, শ্রী ভূদেব চৌধুরী)। অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু আবার কৃত্তিবাসের গ্রন্থ রচনার কাল পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ বলে অনুমান করেছিলেন। অধ্যাপকের অভিমত কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের অধিপতি জনৈক দনুজ মর্দনের রাজসভায় 'পাত্র' রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই কৃত্তিবাসের পক্ষে রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ কারো রাজসভাতেই উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক 'গৌড়েশ্বর' 'রাজা'-উপাধিকারী কোন জমিদার হওয়াই সম্ভব। অধ্যাপক বসু কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীকে স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেননি। তবে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেন এই পর্যায়ে মোটামুটি মত দিয়েছেন যে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব পঞ্চদশ শতকের শেষে হওয়াটাই মোটামুটি সঙ্গত।

কৃত্তিবাসের আবির্ভাব প্রসঙ্গে অপর দুটি বিচারের উপাদান-কুলজীগ্রন্থ এবং গৌড়েশ্বর। কৃত্তিবাস গৌড়নৃপতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলেছেন —

'পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়ের পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।।'

এই গুণবান গৌড়েশ্বরের এগারোজন পার্শ্বচরের নামের উল্লেখ কৃত্তিবাস দিয়েছেন, কিন্তু আসল গৌড়েশ্বরের নামটিই বাদ পড়ে গেছে। সেই এগারোজন পার্ষদ হলেন — জগতানন্দ, সুনন্দ, কেদার খাঁ, নারায়ণ, গন্ধর্বরায়, কেদার রায়, তরনী, সুন্দর, শ্রীবৎস, মুকুন্দ, জগদানন্দ রায়। কবির বিবরণে মনে হয় গৌড়েশ্বর জনৈক হিন্দু রাজা। কয়েকজন মুসলমান উপাধিক পার্শ্বচর হলেও বেশীরভাগই হিন্দু পার্ষদ, চন্দন, মাল্য, পট্টবস্ত্রের উপহারও হিন্দুরীতি সম্মত। এই হিন্দুরাজা আর কেউ নন, রাজা গণেশ। জ্যোতিষ হিসাবে, কুলজীগ্রন্থের বিচারের সঙ্গেও তাতে অসঙ্গতি ঘটে না। অন্যদিকে, ইতিহাস অনুসরণ করলে লক্ষ্য করা যায় — ইলিয়াস শাহি রাজাদের কাল থেকে হুসেনশাহি বংশের শাসন আমল পর্যন্ত মুসলমান গৌড়াধিপতিদের রাজসভা অলঙ্কৃত করে থাকতেন হিন্দু পার্ষদগণ। সুতরাং কৃত্তিবাসের উল্লিখিত গৌড়েশ্বর মুসলমান হওয়াটা অসঙ্গত নয়। এই মুসলমান সম্রাট হলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীঃ)। পার্ষদ কেদার রায়ের ঐ রাজসভাতে উপস্থিতি, গন্ধর্ব রায়ের ও বারবক শাহের রাজসভাতে উপস্থিতির অনুমান এবং আরো দু-একজন পর্ষদের নাম বারবক শাহের রাজসভার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় কৃত্তিবাস কথিত গৌড়েশ্বর বারবক শাহ হওয়াটাই অনেকে সঙ্গত বলে বিবেচনা করেন। এই সূত্রে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতকের কোন এক সময় জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়টা পঞ্চদশ শতকের প্রধমার্দ্ধে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে শেষ বিচার কুলজী গ্রন্থের সাক্ষ্যপ্রমাণ। কুলজীগ্রন্থে কুলীনদের বংশতালিকা থাকে। এর সাহায্যে ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিভিন্ন কুলজীগ্রন্থের সাক্ষ্যাদি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেন — ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দের পরে কৃত্তিবাসের জন্ম সম্ভব নয়। তিনি অনুমান করেন, ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের জন্মসাল এটা ধরে নেওয়া যায়। তাছাড়া কৃত্তিবাসের তিন পত্নীর একজনের পিতার নাম ছিল শংকর। এই শংকর আবার বিখ্যাত নৈয়ায়িক কণাদ তর্কবাগীশের বৃদ্ধপ্রপিতামহ উৎসাহের ভ্রাতা। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই তথ্য থেকে অনুমান করে, কৃত্তিবাস কণাদ তর্কবাগীশের প্রপিতামহের সমকালীন। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যায় কণাদ তর্কবাগীশের জীবৎকাল থেকে অনুমান করে কৃত্তিবাসের জীবৎকাল পঞ্চদশ শতকের ''সপ্তম, অষ্টম বা নবম দশক''-এর কোন একটি বলে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

৮.৮ ঃ কাহিনী বর্ণনায় কৃত্তিবাসের ঋণ, মৌলিকত্ব ও কবিত্ব

মূল বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃত্তিবাস-বর্ণিত রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাস পরিচিত ছিলেন না এবং শুধু গায়ক বা কথকের মুখে শুনেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন। আসলে কৃত্তিবাস মূল রামায়ণের অবিকল অনুসরণ করেন নি। তবে কৃত্তিবাস যে বাল্মীকি রামায়ণ পড়েছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অনেক জায়গাতেই তিনি পূর্বসূরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। —

'বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ।।'

— রামায়ণ ১৯৮৩ সাহিত্য সংসদ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

আবার কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীটি সত্য হলে তাঁকে তো সংস্কৃত ভাষায় পরম পণ্ডিত বলে ধরে নিতে হবে। প্রাচীন কুলজী গ্রন্থেও তাঁকে সর্বদা পণ্ডিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রামায়ণের ভণিতাতেও তিনি নিজের নামের সঙ্গে বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন।

মন্তব্য

যাইহোক রামায়ণ রচনা করতে বসে কৃত্তিবাস মূল বাল্মীকি থেকে কাহিনীর সারভাগটুকু নিয়ে, পুরাণ বা অন্যান্য রামায়ণের ঘটনা এবং নিজের কল্পনা মিশিয়ে পুরনো রামকথাকে বাংলাদেশের অনুকূল করে পরিবেশন করেছিলেন। সুতরাং বাল্মীকি রচিত কাহিনীর কিছু কিছু অংশ তিনি বর্জন করেছিলেন। সেই বর্জিত অংশগুলির মধ্যে প্রধান হল —

১) কার্তিকের জন্ম, ২) বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ, ৩) বিশ্বামিত্র কথা, ৪) অম্বরীষ রাজার যজ্ঞ, ৫) রামের আদিত্য-হৃদয় স্তবপাঠ ইত্যাদি।

কখনও কখনও কৃত্তিবাস বাল্মীকির বদলে বিভিন্ন পুরাণ বা অন্যান্য রামায়ণ থেকে কাহিনী চয়ন করেছেন। এবার তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

আদিকাণ্ড ঃ-

১) বাল্মীকি রামায়ণে বালকাণ্ডের শুরুতেই দেখি নারদ বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনার আদেশ দিচ্ছেন। এ গ্রন্থে রত্নাকর দস্যুর প্রসঙ্গ নেই। আর ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দশরথের পুত্র কামনায় যখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ শুরু করেন তখন দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু রাবণবধের জন্য দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করেন। কৃত্তিবাস তাঁর আদিকাণ্ডের সূচনায় বাল্মীকির অনুসরণ করেন নি। তিনি আধ্যাত্ম রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের বর্ণনা অনুসারে বিষ্ণুর স্বেচ্ছায় চার অংশে বিভক্ত হয়ে (রাম-ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন) অবতাররূপে জন্মগ্রহণের বিবরণ দিয়েছেন। তারপর রামনামের মাহাত্ম্যে রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকিতে রূপান্তর ও রামায়ণ রচনার জন্য ব্রহ্মার আদেশপ্রাপ্তির কাহিনী।

২) আদি কাণ্ডের হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান কৃত্তিবাস দেবী ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে নিয়েছেন।

৩) এই কাণ্ডে বর্ণিত ভগীরথের জন্মবৃত্তান্ত যোগবিশিষ্ঠ রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ থেকে নেওয়া।

৪) কাণ্ডার মুনির উপাখ্যানটি কৃত্তিবাস স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড থেকে নিয়ে আদিকাণ্ডের গঙ্গাবতরণ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

৫) দশরথের রাজ্যে শনির প্রকোপের বিবরণও তিনি স্কন্দ ও কালিকাপুরাণ থেকে গ্রহণ করে আদিকাণ্ডের অন্তর্গত করে দিয়েছেন।

সুন্দরাকাণ্ডে ঃ-

সেতুবন্ধনের সময়ে রামের শিবপ্রতিষ্ঠার যে বিবরণ কৃত্তিবাস দিয়েছেন তার উৎস হল কূর্মপুরাণ।

লঙ্কাকাণ্ড বর্ণিত ঃ-

১) চণ্ডিকার অকালবোধেনের কাহিনী কৃত্তিবাসী দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও কালিকাপুরাণ থেকে নিয়েছেন।

২) মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধ রামলক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে জাম্বুবান হনুমানকে ঋষ্যমূক পর্বত থেকে ওষুধ আনতে বলেন ও কাহিনী কৃত্তিবাস কোথা থেকে পেয়েছিলেন, নিজেই তা উল্লেখ করে দিয়েছিলেন —

'নাহিক এসব কথা বাল্মীকি বচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভূত রামায়ণে।।'

৩) গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী আনার সময়ে হনুমানকে কালনেমির বাধাদানের বৃত্তান্ত অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুসরণে লেখা।

শুধু ধান্যমালী অপ্সরা এখানে হয়ে গন্ধকালী।

৪) অযোধ্যায় ফিরে সীতা হনুমানকে যে স্বর্ণহার পুরস্কার দিয়েছিলেন তাতে রামনাম লেখা ছিল না বলে হনুমান তা খণ্ড খণ্ড করে ফেলে দেন। লঙ্কাকাণ্ডের এই ঘটনা কৃত্তিবাস অধ্যাত্ম রামায়ণ অনুসারে বর্ণনা করেছেন।

উত্তরাকাণ্ডে লব-কুশের হাতে ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ পরাজিত ও নিহত হলে তাঁরা যে বাল্মীকির প্রসাদে পুনর্জীবিত হন, এই বৃত্তান্তটির উৎস কৃত্তিবাস নিজেই নির্দেশ করে বলেছেন —

'এসব গাহিল গীত জৈমিনি ভারতে।
সম্প্রতি যে গাই তাহা বাল্মীকির মতে।।'

কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের এই জাতীয় ঋণ স্বীকার থেকে এই তথ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিভিন্ন সংস্কৃত রামায়ণ ও পুরাণের সঙ্গে তারঁ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলে। সুতরাং সংস্কৃতি ভাষার ওপর তাঁর যে পূর্ণ অধিকার ছিল তাতে সন্দেহ থাকে না।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের কতকগুলি উপাখ্যান কৃত্তিবাসের নিজস্ব পরিকল্পনার সৃষ্টি। এই মৌলিক

মন্তব্য

কাহিনীগুলি হল —

আদিকাণ্ড ঃ ১) সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনী, ২) জটায়ু ও শনির কাহিনী, ৩) গণেশের জন্ম, ৪) সম্বারাসুর বধ ৫) গুহকের সঙ্গে মিত্রতা ইত্যাদি উপাদান।

অরণ্যকাণ্ডে সীতাহরণের আগে লক্ষ্মণের গণ্ডী দেওয়ার বৃত্তান্তটি কৃত্তিবাসের যোজনা।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ১) বালীরাজার সন্ধ্যাহ্নিক, ২) রাবণকে লেজে বেঁধে লাঞ্ছনা, ৩) বালীবধে তারার অভিশাপ, ৪) সতীত্বের প্রশস্তি, ৫) সম্পাতির কাছে হনুমানের রত্নাকর ও রামের কাহিনীকীর্তন ইত্যাদিও কৃত্তিবাসের কল্পনা।

সুন্দরাকাণ্ডের সিংহিকাবৃত্তান্ত ও চামুণ্ডাপ্রসঙ্গ কৃত্তিবাসের সংযোজন।

এই সূত্রে বলতে ১) রাবণ-বিভীষণ বাদানুবাদ, ২) রামের সঙ্গে বিভীষণের মিত্রতা, ৩) সমুদ্রে সেতুবন্ধন ও ৪) রামের সসৈন্যে লঙ্কায় আগমন ইত্যাদি ঘটনাগুলি কৃত্তিবাস সুন্দরাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেগুলি বাল্মীকির রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডের অন্তর্গত ছিল। তবে এই পরিবর্তনে সুন্দরাকাণ্ডের ঘটনাগত ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই মনে হয়।

লঙ্কাকাণ্ডে কৃত্তিবাস অনেক নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন —

১) তরণী সেন-বীরবাহু-ভস্মলোচন বধ, ২) সূর্যকে হনুমানের কক্ষতলে ধারণ, ৩) মহীরাবণ ও অহিরাবণ বধ, ৪) অকাল বোধনে ১০৮টি নীলপদ্মের কাহিনী, ৫) ছদ্মবেশী হনুমানের মন্দোদরীর কাছ থেকে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, ৬) সীতার প্রতি মন্দোদরীর অভিশাপ এবং ৭) মুমূর্ষু রাবণের কাছে রামের রাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি কৃত্তিবাসের স্বকীয় উদ্‌ভাবনা। এগুলি নিঃসন্দেহে তাঁর মৌলিক কবিপ্রতিভার পরিচয় দেয়।

কাহিনী বিন্যাসে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব বিচার করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে পুঁথির মধ্যে কৃত্তিবাসের যে আদি কাব্যরূপের সন্ধান পাওয়া যায় তার কাহিনী ছিল অতি শিথিল। জয়গোপাল তর্কালংকার বা মোহনচাঁদ শীলের পরিমার্জনার ফলে কাহিনীটি কিছুটা সংহত আকার ধারণ করেছে। বর্তমান আলোচনা সেই পরিমার্জিত সংস্করণের ভিত্তিতেই করা।

বর্তমান রামায়ণে ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনায় কিছু শিথিলতা থাকলেও সাতটি কাণ্ডের মধ্যে যে কাহিনীগত ঐক্য নেই তা নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে সুলভ ভক্তির আবেগ উচ্ছ্বাস, কারণে অশ্রুর প্রবাহ, নিয়তি-নির্ধারিত জীবন-পরিণতি ইত্যাদি বিষয় বাল্মীকির মহাকাব্যিক কাহিনীর বিশালতা ও গভীরতাকে ক্ষুণ্ণ করলেও মোটের ওপর কাহিনীগত পারস্পর্য ও সংহতি রক্ষিত হয়েচে। অবশ্য তাড়কাবধ, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনা, ভরতের ছোঁড়া গুলি (বাঁটুল) লেগে আকাশ থেকে হনুমানের পড়ে যাওয়া, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ইত্যাদি শিশুতোষ কাহিনীগুলি কৃত্তিবাসের অতিরঞ্জনের ফলে অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। তার কারণ হিসেবে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন — 'কৃত্তিবাসের সময়ে বাঙালীর চিত্ত অনেকটা শিশুচিত্তের মত সরল, কল্পনাপ্রবণ ও কৌতুহলী ছিল। এই কাহিনীগুলি তাঁরা উপভোগ করতেন। অবশ্য পাশ্চাত্যের গ্রীক পুরাণে বা হোমার থেকে মিল্টনের কাব্যে পর্যন্ত অনেক অতিলৌকিক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচ্যেও রামায়ণ-মহাভারতে বা পুরাণে অনেক অনৈসর্গিক ঘটনার বর্ণনা আছে। আসলে তখন বৈজ্ঞানিক নানা সত্য বা আধুনিক যুক্তিবাদের জন্ম হয়নি। কাজেই এইসব শিশুসুলভ কাহিনীর জন্যে কৃত্তিবাসকে দোষী করা চলে না।

যাই হোক কৃত্তিবাসের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি তাঁর কাব্যে মহাকাব্যিক গতিশীলতা বজায় রাখতে পারেন নি। অনেক জায়গাতেই মূল কাহিনী কেটে ছেঁটে ছোটো করে নিয়েছেন। বাল্মীকির নিসর্গ বর্ণনার অপরূপ কবিত্ব ও মাধুর্যের স্বাদ কৃত্তিবাসে কিছুই পাওয়া যায় না। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা তো কৃত্তিবাস পুরোপুরি বাদই দিয়েছেন। তবু কৃত্তিবাসের কাহিনীতে (১) দশরথের সিন্ধুবধ, (২) রামের নির্বাসন ও ভরতমিলন, (৩) সীতাহরণে রামের বিলাপ, (৪) লক্ষমণের শক্তিশেল, (৫) সীতার অগ্নিপরীক্ষা, (৬) সীতা নির্বাসন, (৭) লবকুশের হাতে রামসেনার পরাজয়, (৮) সীতার পাতাল প্রবেশ, (৯) রামের লক্ষমণ বর্জন, (১০) হনুমানের দাস্যভক্তি ইত্যাদি বর্ণনায় মানবরস বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে — মানবজীবনের সুখদুঃখের চেনা রূপটি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। মহাকবির আকাশচারী কল্পনা গ্রাম বাংলার চণ্ডীমণ্ডপে ও ঘরের আঙিনায় নেমে এসে বাঙালীর জীবনকাব্যে রূপ লাভ করেছে।

কৃত্তিবাসের মৌলিকত্ব ঃ-

কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' বাঙালির জাতীয় কাব্য হিসেবে বহু প্রজন্ম ধরে স্বীকৃত। এত বিপুল জনপ্রিয়তা প্রাচীন-মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত আর কোনো কাব্য লাভ করেনি। তার কারণ

সম্ভবত একটাই, বাঙালি জাতি নিজেকে এই কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখেছে। এবং মূল কাব্যের সঙ্গে নিজেদের যোগ স্থাপন করেছে। মন্তব্য

এই পাঠে আমাদের আলোচ্য কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এর একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি অন্বেষণ করা, যেগুলি কাব্যটিকে এই মর্যাদা দিয়েছে। এই আলোচনায় আমরা প্রথমেই উদ্ধৃত করব সম্পাদক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশিত সূত্রগুলি।

''কৃত্তিবাস বাঙালির প্রিয়তম কবি। তাঁর রামায়ণ বাঙালির জাতীয় কাব্য। জাতীয় কাব্য একাধিক অর্থে।

প্রথম, সমগ্র জাতিই এই কাব্যকে বরণ করেছে; কোটিপতির প্রাসাদ থেকে দীনদরিদ্রের পর্ণ-কুটির — দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত এই কাব্যের সমান জনপ্রিয়তা।

দ্বিতীয়ত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ বর্তমানে যে রূপ লাভ করেছে, তা আর ব্যক্তিবিশেষের রচনা নেই, তার উপরে সমগ্র জাতির হাতের ছাপ পড়েছে।

তৃতীয়ত, কৃত্তিবাসের রামায়ণের চরিত্রগুলি ও তাদের জীবনযাত্রা অবিকল বাঙালির চরিত্র ও জীবন যাত্রার ছাঁচে ঢালা।

চতুর্থত, কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের স্বাক্ষর রয়েছে। রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাক্ষসদের রামভক্তি প্রদর্শনের বর্ণনা প্রক্ষেপ করায় বৈষ্ণব প্রাধান্যের স্তরের স্বাক্ষর; আবার শাক্তেরা যে স্তরে প্রাধান্য লাভ করেছিল, তার স্বাক্ষর রয়েছে রামচন্দ্রের শক্তিপূজা করার বর্ণনার মধ্যে। সম্প্রতি একটি পুঁথিতে ধর্মঠাকুরের উপাসকদের হাতের ছাপ দেখেছি, সেখানে নিরঞ্জন অর্থাৎ ধর্মঠাকুরকে দেখার জন্য হনুমানের শূন্যলোকে গমন বর্ণিত হয়েছে।"

এই সূত্রগুলি থেকে কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এর যে প্রধান বৈশিষ্ট্যটি ফুটে ওঠে তা হল এই 'রামায়ণ' মূল বাল্মীকি 'রামায়ণ'কে অনুসরণ করলেও তার হুবহু প্রতিরূপ নয়, এটি একান্তভাবেই বাংলা 'রামায়ণ'। রামের মূল উপাখ্যানটি তিনি মোটমুটি অনুসরণ করেছেন কিন্তু প্রয়োজন মতো অনেক আখ্যানকে আগে পরে স্থাপন করেছেন, অনেক আখ্যানের পরিবর্তন করেছেন, অনেক আখ্যান বর্জন করেছেন আবার কোনো বিস্তৃত বা দীর্ঘ অংশকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, এবং কোথাও বা সংক্ষিপ্ত অংশকে প্রলম্বিত করেছেন। এইসব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নতুন আখ্যান সংযোজন করেছেন যেগুলি বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এ ছিল না। এগুলির মধ্যে কোনো কোনো আখ্যান কৃত্তিবাসের মৌলিক রচনা, কোনোটি অন্য কোনো পুরাণ ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত।

কৃত্তিবাসের এই সংযোজন-বিয়োজন-পরিবর্তনের প্রক্রিয়া তাঁর জনচিত্ত অনুধাবনের ক্ষমতারই প্রকাশ। যে জনমণ্ডলীকে 'বোঝাবার' জন্য তাঁর কাব্যরচনা তাদের গ্রহণ ক্ষমতা বিচার করেই তিনি নিজের কাব্যকে বিন্যস্ত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গেই এই কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তা হল — কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' সম্ভবত পাঠ্য কাব্য হিসেবে গড়ে ওঠেনি, গেয় কাব্য হিসেবেই রূপ লাভ করেছিল। এ বিষয়ে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে সুকুমার সেন বলেছেন —

'কৃত্তিবাস গাহিবার জন্য কাব্য লিখিয়াছিলেন, পড়িবার জন্য নহে। ''গুণশালী'' কথাটির যদি কৃত্তিবাসের বিশেষণরূপে কোন সার্থকতা থাকে তবে বুঝিব তিনি নিজে রামায়ণ গাহিতেন। রামায়ণ রচনা ও গান বরাবর ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি ছিল ও আছে। কিন্তু এ বৃত্তি শুরু কখন হইতে জানি না। .... কৃত্তিবাসের কাব্যের মূলরূপ খুঁজিবার চেষ্টা হইয়াছে। .... কিন্তু কেহই মূলে পৌঁছাইতে পারেন নাই। কাব্যের জনপ্রিয়তার এ বড় কঠিন মূল্য। গায়কের পর গায়ক, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, পাঠ বদলাইয়া চলিযাছেন। সেই অনুসারে পুঁথিও বদলাইতেছে। যে পুঁথি সবই অনেক কবি-গায়কের রচনায় স্ফীত। কৃত্তিবাসের প্রাচীন পুঁথিতেও দ্বিজ মধুকণ্ঠ, প্রসাদ দাস ইত্যাদি অনেকের ভণিতা পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া অদ্ভুত-আচার্য প্রভৃতি রামায়ণ-কাব্য লেখকের রচনাও ঢুকিয়া গিয়াছে।" সুকুমার সেন আত্মকাহিনীর যে পাঠ অবলম্বন করেছেন সেখানে 'গুণশালী' শব্দটি পাওয়া যায়। এইভাবে —

'পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কৃত্তিবাস গুণশালী।
অনেক শাস্ত্র পড়্যা রচে শ্রীরামপাঁচালী।।'

বস্তুতপক্ষে প্রাচীন-মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এর সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ পুঁথি যত সংখ্যক পাওয়া যায়, তেমন আর কোনো কাব্যেরই পাওয়া যায় না। এই পুঁথিগুলির পাঠান্তরও অত্যন্ত বেশি। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অংশ গান করার জন্যই হয়তো অসম্পূর্ণ পুঁথিগুলি লিখিত হয়েছিল।

কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' কাব্য অপেক্ষা ধর্মগ্রন্থ হিসেবেই বাহালির কাছে সমধিক গৃহীত হয়েছিল। রামকে কাব্যের শুরু থেকে ভক্তবৎসল ভগবান হসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এমনকি তাঁর বৈরী

মন্তব্য

রাবণও তাঁর জন্ম মুহূর্ত থেকেই অপেক্ষা করে থাকেন তাঁর হাতে মৃত্যুবরণ করেই একদিন উদ্ধার পাবেন। কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের চরিত্রের দৃঢ়তা ও রুক্ষতাকে অনেকটা কোমল স্বভাবে পরিণত করে দিয়েছেন। তবে আমাদের মনে হয় কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এ রাম আপামর বাঙালির কাছে তাঁর ভক্তবৎসলতা ছাড়া আরও একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য জনপ্রিয়, তা হল দেবতা হয়েও তাঁর সাধারণ মানুষের মতো মান-অভিমান-অনুযোগপূর্ণ আচরণ। বাল্মীকির 'রামায়ণ'-এ যে সাধারণ সুখদুঃখের অতীত, নিরাসক্ত, নির্লিপ্তি দেবোপম নরচন্দ্রমা রামের বর্ণনা পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসের রাম তার থেকে অনেকাংশে পৃথক। তিনি অনেক বেশি সাধারণ মানুষের ধরাছোঁওয়ার মধ্যে। মহাকাব্যিক নায়কের দূরত্ব থেকে তাঁকে দেখতে হয় না।

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'-এ বাঙালি নিজেকে প্রতিফলিত দেখেছে, তার আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, বেশভূষা, খাদ্যাভ্যাস এমনকি প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যেও। এই বহিরাঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বাঙালির একান্ত নিজস্ব ভাবাবেগ, মূল্যবোধ, সমাজনীতি কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এর অন্যতম উপাদান। পঞ্চদশ শতকের ব্রাহ্মণ্যসমাজ যেবাবে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা করছিল তার প্রমাণও এই 'রামায়ণ'-এ পাওয়া যায়। রাম ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের রক্ষাকর্তা হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন, শুধু তাই নয়, বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে ব্রহ্মশাপের নিদারুণ ফল। কালিদাস রায় তাঁর 'কৃত্তিবাস' প্রবন্ধে কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এর আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

১) বাংলা 'রামায়ণ'-এ বারবার অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া হয়েছে। যে দুর্ঘটনা ঘটবে, আগে তার একটা করে স্বপ্ন যুক্ত হয়েছে। যে যাত্রায় কুফল হবে সে যাত্রার প্রারম্ভে কতকগুলি দুর্লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। পরে যা ঘটবে তা যে কারও না কারও অভিসাপের ফলেই ঘটছে — তা দেখানো হয়েছে। মূল 'রামায়ণ'-এ এগুলি যে ছিল না, তা নয়, কৃত্তিবাস এগুলির সংখ্যা বাড়িয়েছেন। যেমন তারার অভিশাপ, মন্দোদরীর অভিশাপ — মূলে ছিল না। জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাব বাংলা 'রামায়ণ'-এ কিছু বেশি। এ ছাড়া বাংলা দেশের অনেক কুসংস্কারের কথাও বাংলা 'রামায়ণ'-এ প্রবেশ করেছে। এর কারণ হিসেবে বাঙালির পল্লবিত অলৌকিক কাহিনী শ্রবণের প্রতি আগ্রহকেই ক্রিয়াশীল বলা যেতে পারে।

২) বাংলা 'রামায়ণ'-এ প্রাকৃতিক আবেষ্টনী বর্জিত হয়েছে। এই আবেষ্টনীর পট-পরিবর্তনে দেশকালের যে নির্দিষ্ট পরিচয় মূল 'রামায়ণ'-এ আছে, বাংলা 'রামায়ণ'-এ তা পাওয়া যায় না। মূল 'রামায়ণ'-এ শীত, বর্ষা ও শরৎ ঋতুর যে বর্ণনা এবং ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে মানবচিত্তের বেদনার যে পরিবর্তন দেখানো হয়েছে বাংলা 'রামায়ণ'-এ পাওয়া যায় না। সমস্ত ঘটনাই বাংলা দেশে ঘটেছে বলেই মনে হয়।

কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এ অনেক বেশি দীর্ঘ হল যুদ্ধ কাণ্ড। তিনি এর নাম বদলে দিযেছিলেন। কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এ 'যুদ্ধ-কাণ্ড'-এর নাম 'লঙ্কাকাণ্ড'। বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এর 'বালকাণ্ড'কে কৃত্তিবাস নাম দিয়েছিলেন 'আদি কাণ্ড' বা 'আদ্য কাণ্ড'। বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এ যেখানে বিস্তৃততম হল অরণ্যকাণ্ড — অরণ্যের শোভার বর্ণনা যার অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে। কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এ অরণ্যকাণ্ডেরও বেশির ভাগ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন যুদ্ধের বর্ণনা। এসবই শ্রোতাকুলকে আকর্ষণ করার মাধ্যম বলেই মনে হয়।

৩) কৃত্তিবাস বাল্মীকির 'রামায়ণ'-এর দার্শনিক অংশ, তত্ত্বমূলক বাদানুবাদের অংশ, বিচার-বিশ্লেষণ এবং সর্বাদিক আলংকারিকতা বাদ দিয়ে কেবল কাঠামোটি নিয়ে বাংলার মাটি দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করেছেন।

৪) কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' এদেশে লোককে শুধু আনন্দই দেয়নি, লোকশিক্ষার একটি চমৎকার প্রতিষ্ঠানের কাজ করেছে। বাহালি জনসাধারণ এই কাব্য থেকে গার্হস্থ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলি লাভ করেছে এবং সত্যনিষ্ঠাতার দীক্ষা লাভ করেছে। কৃত্তিবাস 'রামায়ণ'-এর চরিত্রগুলি জীবন্ত সত্য রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছে।

৫) এই কাব্য বাংলা ভাষারও পুষ্টি সাধন করেছে, ভাবপ্রকাশের বহু ব্যঞ্জনাময় সংকেত আমরা এই 'রামায়ণ' থেকে পেয়েছি, তাই কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' থেকে বহু লক্ষ্যার্থক বাক্যগুচ্ছের সৃষ্টি হয়েছে।

৬) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ প্রবণতা — কলহ, গালাগালি, ভোজনলুব্ধতা, স্বর্ণলোভ ও নারীপীড়ন, সবকটিই এই কাব্যে লক্ষিত হয়।

শিশুর মতো বিশ্বাসী, কল্পনাপ্রবণ ও আনন্দপিপাসু শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য নির্মিত হয়েছিল বলেই হয়তো বহু যুগান্তরেও এই কাব্যের আবেদন অমলিন রয়েছে।

কৃত্তিবাসের কবিত্ব ঃ- মন্তব্য

কৃত্তিবাসের কবিত্ব বিচারে সমালোচকের কথা অতি যথার্থ বলেই মনে হয়, ''কৃত্তিবাসের রামায়ণ সমগ্র বাঙালি জাতির অন্তরে যে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' ছেড়ে দিলে পূর্বভারতের আর কোনো কাব্য একটি বৃহৎ নরগোষ্ঠীর চিত্তলোকে এমনভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথমখণ্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। এই কথা যে কতখানি সত্য তা কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী' পাঠ করলেই বোঝা যায়। বাস্তবিক কৃত্তিবাস এই মহাকাব্য রচনা করে শুধু যে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছেন তা নয়, সুদীর্ঘকাল ধরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালির অন্তরে যে পরিমাণ আনন্দ সুধা বর্ষণ করেছেন, তা অন্য কোন বাঙালি কবির দ্বারা সম্ভব হয়নি। এককথায় বাঙালির প্রত্যেকটি পর্যায়ের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ একসূত্রে বাঁধা পড়ে গেছে। ''কৃত্তিবাস অপেক্ষা অন্য কোন বাঙালি কবি, প্রাচীন ও নবীন উভয় যুগের বাঙালির মানবিক জীবন প্রবাহকে এমনভাবে গৃহাদর্শের দিকে ফেরাতে পারেননি। কৃত্তিবাস বাঙালি জীবনের মূল সুর যথার্থ ধরেছিলেন। বাঙালি যা চেয়েছে, কৃত্তিবাসে সে তা পেয়েছে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ 'শ্রীরাম পাঁচালী' হিসাবে পরিচিত। সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. সুকুমার সেন অভিমত প্রকাশ করে, ''পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্য ত্রিধারায় প্রবাহিত। প্রথম গীতিকবিতা, দ্বিতীয় পৌরাণিক গেয় অথবা পাঠ্য আখ্যায়িকা, তৃতীয় অ-পৌরাণিক গেয় কবিতা-আখ্যায়িকা। শেষ দুই ধারার রচনার রূপ বা ফর্ম প্রায় একই রকম এবং সে ফর্মের নামও এক, 'পাঞ্চালী'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ১ম খণ্ড)। কৃত্তিবাসের রামায়ণ এই পাঁচালী জাতীয়। কুলজী গ্রন্থে তাই কবি কৃত্তিবাসকে 'ধীমান পণ্ডিত' বলা হয়েছে, কোথাও বা শুধু 'কবি কৃত্তিবাস', কিন্তু প্রাচীনকালে তিনি কোথাও মহাকবি বলে উল্লিখিত হননি। ''বাল্মীকি সংস্কৃত মহাকাব্যটিকে (অযোধ্যাকাণ্ড লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত) যেভাবে গতিশীল করেছেন, আকস্মিকভাবে ঝোড়ো হাওয়ায় স্বাভাবিক পারস্পর্যকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন, বীররস ও করুণরসের সমন্বয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তেমন আর্য শক্তি, একমাত্র বেদব্যস ছাড়া আর কোন্ কবি দাবি করতে পারেন ? সেদিক থেকে বাল্মীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের কোন তুলনাই চলে না'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তঃ প্রথম খণ্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। কবি কৃত্তিবাসও তেমন দাবী করেন না। তিনি আসলে পুরাণ-কথার আধারে বাঙালির জীবনরসই পরিবেশন করেছেন। কবি স্বয়ং পণ্ডিত হলেও পাণ্ডিত্য প্রকাশকেই মুখ্য করে তোলেননি, পাণ্ডিত্য এবং স্বভাব কবিত্বের গুণে রাম পাঁচালীকে বাঙালির জাতীয় আত্মার প্রতিফলন হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। কৃত্তিবাস তাঁর কবিধর্মের সেই স্বকীয়তা প্রসঙ্গে নিজেই উল্লেখ করেছেন —

'সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে
নানা ছন্দ, নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে।।'

বাস্তবিকই কবিধর্মের স্বাভাবিক প্রেরণায় একেবারে সহজ সরল ভঙ্গীতে কৃত্তিবাস তাঁর বৃহাদাকার পাঁচালী কাব্যটি গড়ে তোলেন। এককথায় বাহালি মানসের নানা বিচিত্র অনুভূতি পয়ার ছন্দে কৃত্তিবাসী রামায়ণে গ্রথিত। পরিচ্ছন্ন প্রাঞ্জল চিত্রধর্মীতাই কাব্যটির বিশিষ্ট গুণ। কৃত্তিবাসের অসাধারণ কবিত্ব প্রতিভার গুণে কাব্যটি বাঙালির অন্তরে অক্ষণ্ণ সম্পদে পরিণত হয়েছে। এককথায় রামায়ণের অমৃত রসধারাকে সংস্কৃত ভাষায় জটাজাল থেকে মুক্ত করে বাঙালির মহাকাব্য-রসপিপাসাকে চরিতার্থ করেছেন কবি কৃত্তিবাস। এক 'শ্রীরাম পাঁচালী'-র জন্যেই তিনি বঙ্গসাহিত্যের ভগীরথ। সংস্কৃত রামায়ণের যে অংশ বাঙালির কাছে গুরুভার বলে মনে হয়েছে, সে সব প্রসঙ্গ বর্জন করেছেন কবি। তার পরিবর্তে বাঙালির হৃদয়গ্রাহী বহুকাহিনী, যেমন গুহক চণ্ডাল প্রসঙ্গ, কৈকেয়ীর বরলাভ, লবকুশের যুদ্ধ প্রভৃতি সংযোজন করে কৃত্তিবাস বাঙালি জাতির আত্মাকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। এককথায় বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ, বাঙালির শান্ত জীবনাদর্শ, বাঙালির রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, সমাজ সংস্কারের ভাবাদর্শ, সর্বোপরি বাঙালির ভক্তিবাদ — 'শ্রীরাম পাঁচালী'কে বাঙালির ঘরের কথাতে পরিণত করে জাতির জীবনবেদে পরিণত করেছে। ''কৃত্তিবাসের অমর মহাকাব্য আকারে প্রকারে পাঁচালী হলেও বাঙালির সমগ্র চেতনাকেই আবিষ্ট করেছে। বাঙালির জীবন ও সাধনার আধখানি কৃত্তিবাস অধিকার করে রেখেছেন'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তঃ প্রথম খণ্ড ড.অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। আসলে বাঙালি পরিবারের গবীর প্রেম-প্রীতির বন্ধন, নিবিড় স্নেহ, সৌভ্রাতৃত্ব, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, অক্ষয় সঙ্গীত্বের আদর্শ-বাঙালির একান্ত এইসব মানসধর্মকে আশ্রয় করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পূর্ণ অর্থেই বাংলাদেশের যথার্থ বিষয় হয়ে উঠেছে। কৃত্তিবাসের কবিত্বের পেছনে বাঙালিয়ানা যেমন, একইভাবে ভক্তিভাব, করুণরস, ভাষা-ছন্দ-অলংকারের দক্ষতা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

মন্তব্য

৮.৯ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্র বিচার

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' রসপরিণতি ও রচনা কৌশলে যেমন বাল্মীকির মহাকাব্যের থেকে 'শ্রীরামপাঁচালি'-তে পরিণত হয়েছে, তেমনই তাঁর পার্শ্বের চরিত্রগুলিও মহাকাব্যের চরিত্রাবলি থেকে সরে এসে পৃথক রূপ লাভ করেছে।

মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে যে মহৎ জীবনাদর্শের নিখুঁত শিল্পরূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন মধ্যযুগীয় পাঁচালীকার কৃত্তিবাসের হাতে সে জাতীয় চরিত্রচিত্রণ আশা করা যায় না। কৃত্তিবাস বাংলার সমাজজীবনে দাঁড়িয়ে সাধারণ জনমানসের উপযোগী করে চরিত্রগুলিকে গড়েছিলেন। তাতে আর্য রামায়ণের চারিত্র্যমহিমা ও বৈচিত্র্য না থাকলেও বাঙালীর জীবনাদর্শ নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব এখানেই।

বাল্মীকি-রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণ-ভরত, সুগ্রীব-অঙ্গদ-হনুমান, রাবণ-বিভীষণ-ইন্দ্রজিৎ-কুম্ভকর্ণ কিবং কৈকেয়ী-মন্থরা-সীতা-তারা-মন্দোদরী প্রত্যেকটি চরিত্র স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত। তারা সবাই ভালোত্বের একঘয়ে ভূমিকায় অভিনয় করেনি। জীবনের সহজ ও সমতল পথ থেকে বাল্মীকি চরিত্রগুলিকে উঁচুনীচু, সরল-কুটিল সবরকম মানসিকতার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গেছেন। তাই সত্যবদ্ধ দশরথের অসহায় স্নেহব্যাকুলতা, কৈকেয়ীর নীচ স্বার্থপরতা, রাম-সীতার অসাধারণ সহিষ্ণুতা, লক্ষ্মণের বলিষ্ঠ পৌরুষের বাস্তবতা, ভরতের ত্যাগপুত চরিত্রমহিমা বা বারণের অত্যুগ্র দাম্ভিকতা চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

কৃত্তিবাসে আঁকা চরিত্রগুলিতে মহাকাব্যিক মহিমা কিংবা অমানুষিক বর্বরতা কোনটাই তেমনভাবে ফোটেনি। আসলে কৃত্তিবাসের আমলে দেশে পাঠান অধিকার কায়েমী হয়ে বসেছিল। গণেশ অল্প কয়েক বছর গৌড়ের সিংহাসনে বসলেও তাঁকে যে কোন পরিবেশের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হত, তাঁর পুত্র যদুর জালালুদ্দীন হওয়ার ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। তখন রাষ্ট্র মুসলিম-কবলিত, ভূ-সম্পত্তি বেশিরভাগ ওমরাহদের দখলে, হিন্দুর ধর্ম পীর-গাজী ও সুলতানদের উৎপাতে কোণঠাসা। এরকম সামাজিক অবস্থায় মহাকাব্যের বিশালতা ও চরিত্রের উচ্চতম সমুন্নতি আশা করা যায় না। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্রগুলি কাশী-কোশল-মগধ-বিদিশা ছেড়ে বাঙালীর ঘরের আঙিনায় চলে এসেছে আর অনিবার্যভাবে বাঙালীর জনজীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। তাই অনেক চরিত্রই মহত্ত্ব বিসর্জন দিয়ে হীন হয়ে পড়েছে। যেমন মহারাজ দশরথ রামের প্রতি স্নেহান্ধ হয়ে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে প্রতারণা করে রাম-লক্ষ্মণের বদলে প্রথমে ভারত-শত্রুঘ্নকে দিয়েছিলেন। এ জাতীয় তঞ্চকতা পরাক্রমশীল বীর দশরথের চরিত্রে কালিমা লেপন করেনি কি ? আবার রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলে গেলে 'ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন।' এ আচরণ কি রাজোচিত ? কৃত্তিবাসের হাতে পড়ে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা দশরথ দুর্বল স্ত্রৈণ ও হীন চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। আবার তাড়কাকে দেখে বিশ্বামিত্রের মাত্রাছাড়া ভয় এই মহাতপা মুনির চরিত্রকে লঘু ও হাস্যাস্পদ করে এমন বিকৃতি ঘটিয়েছে যা বাল্মীকির পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ছিল।

রাম ঃ- বাল্মীকির রাম 'নরচন্দ্রমা', মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গুণে ভূষিত। কেননা বাল্মীকি চেয়েছিলেন — 'তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দগানে'। তাই বাল্মীকির কল্পনায় রামচরিত্রে যে গুণগুলি আরোপিত হয়েছিল তা হল —

.... 'বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে নিয়েছে নিজ সিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম, —
কহ মোরে সর্বদশী হে দেবর্ষি তার পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে ''অযোধ্যার রঘুপতি রাম"।

— 'কাহিনী', ভাষা ও ছন্দ (রবীন্দ্রনাথ)

বাল্মীকির রাম মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম আদর্শের প্রতিভু হয়েও কতকগুলি নিষ্ঠুর অন্যায় করেছিলেন। বালীহত্যার হীনতা, সীতাবর্জনের কলঙ্ক, শম্বুকবধের অপরাধ তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল। অবশ্য সীতাবর্জন বা শম্বুকবধ উত্তর কাণ্ডের অন্তর্গত — যেটিকে বাল্মীকির রচনা না বলে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে

করা হয়। তবে বালীবধ তো বাল্মীকির কল্পনা, রামের যে কাজটিকে কোনো যুক্তিতেই মানা যায় না। আবার লঙ্কাযুদ্ধের পরে এত দুঃখে ফিরে-পাওয়া সীতাকে দেখে রাম বললেন —

তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এই রণ-পরিশ্রম.... এ তোমার জন্য করা হয়নি। .... তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে,

নেত্ররোগীর সামনে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরকম কষ্টকর .... এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই।....

লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাঁকে ইচ্ছা কর তাঁর কাছে যাও।....

এমন মর্মান্তিক কথা যে রামের মুখ দিয়ে বার হল, তার থেকে বোঝা যায় তিনি তখন মনোবিকারে ভুগছিলেন। তাই সীতাকে দীপশিখার মতো পবিত্র জেনেও তাকে সে-মুহূর্তে সহ্য করতে পারেননি। তবে শেষবারের মতো সীতা যখন অন্তর্হিতা হলেন তখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। তিনি 'মৈথিলীর জন্য উন্মত্ত' হলেন, জগৎ শূন্যময় দেখতে লাগলেন, কিছুতেই মনে শান্তি পেলেন না।' এই ধৈর্যহীন শোকের কারণেই তিনি হয়ে উঠেছেন মানুষ, দেবতার অবতার নয়। তাই মারীচের রাক্ষসী মায়া তাঁকে ভোলাতে পেরেছে। সীতা উদ্ধারের জন্যে তাঁকে এত পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে বর্ষার বাধা, সমুদ্রের ব্যবধান। সেই একই কারণে বালীকে মেরে সুগ্রীবকে রাজত্ব দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়েছে বানর-সেনা। এটাই আদি কবির বাস্তববোধ। তাঁর রাম অতিমানব নন, তাই মানুষের দুঃখ যত মর্মান্তিক হতে পারে তার সবটাই তিনি সম্পূর্ণ ভোগ করেছেন — এমন কি মানুষী অবমাননা থেকেও তিনি রেহাই পাননি।

কৃত্তিবাসের রাম বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার। তিনি করুণাময়, পতিতপাবন ও ভক্তগতপ্রাণ। তাঁর পায়ের ছোঁওয়ার অহল্যা জীবন ফিরে পায়, তাঁর হাতে নিহত হতে পেরে তরণী সেন, বীরবাহু, অহী ও মহীরাবণ এমন কি স্বয়ং রাবণ পর্যন্ত ধন্য হয়ে যায়। অন্যদিকে তিনি আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভাই, আদর্শ স্বামী, আদর্শ রাজা। সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিলেও, তপোবন দেখানোর ছলনায় সীতাকে বিসর্জন দিলেও (কৃত্তিবাসের রাম সীতাগতপ্রাণ) আজও বাঙালী পল্লীবালার ব্রতকথায় তিনিই আদর্শ স্বামী। আর রাম রাজত্বের সুখের কথা তো প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তবে কৃত্তিবাসী রামের মধ্যে ক্ষাত্রতেজের বদলে অশ্রুপাত প্রবণতা বেশি দেখা যায়, তা সে সীতাবিরহ বা ভক্তবৎসলতা যে কারণেই হোক (দ্রঃ রসবিচার ঃ করুণরস ও ভক্তিরস)।

সীতা ঃ- আর্য রামায়ণের সীতাচরিত্রও কৃত্তিবাসের হাতে সদাসহিষ্ণু অশ্রুমুখী কুলবধূ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বনবাসের সময় রাম সীতাকে সঙ্গে নিতে দ্বিধা করলে এই ক্ষত্রিয়াণী জনকনন্দিনী বলেছিলেন, আমার পিতা তোমাকে আকৃতিতে পুরুষ কিন্তু ব্যবহারে স্ত্রী বলে জানলে বোধহয় তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতেন না। সীতার এই উক্তি যে ক্ষুরধার ব্যঙ্গে ঝলসে উঠেছিল, কৃত্তিবাসের সীতার মুখে তার তীক্ষ্ণতা হারিয়ে গেছে। —

'পণ্ডিত হৈয়া বল নির্বোধের প্রায়।
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায়।।
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
দেখ তারে বীর বলে কোন বীর জনে।।'

সীতাহরণের সময় বাল্মীকির সীতা এই বলে আক্ষেপ করেছেন, যে রাম ধর্ম রক্ষার জন্য প্রাণ, সুখ ও অর্থ সবই ত্যাগ করে থাকেন, সেই তিনি সীতা অধর্ম কর্তৃক অপহৃতা হচ্ছেন দেখেও উপেক্ষা করছেন কেন ? শত্রুতাপন রাম অবিনয়ীদের শাসনকর্তা। তবে কেন পাপাঙ্ক রাবণকে তিনি শাসন করছেন না ? এখানে কৃত্তিবাসের সীতা শুধু অসহায়ের মতো কেঁদে কেঁদে বিলাপ করছেন —

'ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেলে প্রভুরাম গুণের সাগর।।
সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষণ।
শূন্য ঘরে পেয়ে মোরে হরিছে রাবণ।।'

এখানে সীতা অস্থিহীন কান্তকোমল বাঙালীনী হয়ে গেছেন। অগ্নিপরীক্ষার আগে রাম যখন সীতার চরিত্র সন্দেহ প্রকাশ করে তাঁকে লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন-সুগ্রীব বা বিভীষণকে বরণ অথবা যা খুশি তাই করার নির্দেশ দিয়ে রূঢ় ভাষায় তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন তখন ধার্মিক জনকদুহিতা সীতা সতীত্বের গৌরবে এবং পিতৃকুলের মহিমায় দীপ্ত হয়ে ক্ষত্রিয়াণী সুলভ তেজে রামচন্দ্রকে 'প্রাকৃতজন' অর্থাৎ নীচ বা ইতর বলে ভর্ৎসনা করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু কৃত্তিবাসের ব্যক্তিত্বহীনা সীতা রামের কাছে কৈফিয়ত দাখিল করতে বসেন। —

'সবেমাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ।।'

মন্তব্য

লক্ষ্মণ ঃ- লক্ষ্মণের চরিত্রচিত্রণেও বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসে এরকম তফাত দেখা গেছে। অযোধ্যাকাণ্ডে রামের প্রতি বনবাসের আজ্ঞায় ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ বলেছেন —

'হনিষ্যে পিতরং কৈকেয্যাসক্তমানসম্ ....'

অর্থাৎ কৈকেয়ীর প্রতি আসক্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি বধ করব। শুধু পিতা নয়, ভরত এবং কৈকেয়ীকেও লক্ষ্মণ বধ কারর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি রামকে পর্যন্ত লক্ষ্মণ বলেছেন, ধর্মের দ্বারা আপনার বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটেছে। এই দুর্ভাষী, দুর্বিনীত ও স্বজনদ্রোহী ভাইকে রাম অনবরত শান্ত ও সংযত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস লক্ষ্মণের মধ্যে ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে চেয়ে রামের প্রতি তার একান্ত অনুগত রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। অরণ্যকাণ্ডেও বাল্মীকির লক্ষ্মণ সীতার কর্কশ বাক্যে কুপিত হয়ে রামের কাছে চলে যান। কিন্তু কৃত্তিবাস লক্ষ্মণকে সংযত, সহিষ্ণু এবং সীতার প্রতি একান্ত ভক্তিমান করে এঁকেছেন।

রাবণ ঃ- এইভাবেই বীর্যবান, দৃঢ় চরিত্র দাম্ভিক রাবণ শেষ পর্যায়ে কৃত্তিবাসের হাতে রামভক্ত হয়ে উঠেছেন। মুমূর্ষু রাবণ রামকে 'ব্রহ্মসনাতন' ও 'অনাদি পুরুষ' বলে প্রার্থনা করেছে —

'অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।
দয়া করি মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।।
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার।।'

কিন্তু পরস্ত্রী-অপহারক পাপিষ্ঠ রাবণকে হঠাৎ এইভাবে রামভক্ত করে তোলায় চরিত্রটির পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় থাকেনি। আবার অসামান্য নৈপুণ্যে দুটি মাত্র উপমার সাহায্যে বাল্মীকি রাবণকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন ঃ 'পাপরাশি সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ সেই রাক্ষসপতি যেন ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।' এর সঙ্গে কৃত্তিবাসের বর্ণনা —

'নীলবর্ণ রাবণ যে পীতবস্ত্রধারী।
নবজলধর যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারী।'

তুলনা করে দেখলেই বোঝা যায় মহাকাব্যের চরিত্রাঙ্কণে কৃত্তিবাসের অপটুতা।

হনুমান ঃ- হনুমানকে বাল্মীকি পরম প্রাজ্ঞ ও বেদজ্ঞ হিসেবে দেখিয়েছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস যে হনুমানকে এঁকেছেন তাতে তার বানর স্বভাবটিই বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। হনুমান ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গিয়ে যজ্ঞ নষ্ট করার অভিপ্রায়ে পুজোর আয়োজন অপবিত্র করে দিয়েছে। —

'হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরি তায় করিল প্রস্রাব।।
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে।
ফুলফল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে।।'

এইরকম অসভ্য আচরণের অমার্জিত বর্ণনা বাল্মীকির কল্পনার অগোচর। সীতার খোঁজে লঙ্কাপুরীতে গিয়ে ঘুমন্ত মন্দোদরীকে সীতা ভেবে উল্লসিত হনুমান যে আচরণ করেছিল বাল্মীকির ভাষায় তা হল মহাবাহু পবনন্দন 'বানর স্বভাব প্রদর্শনপূর্বক এক প্রান্তে গিয়া বাহু আস্ফোটন, পুচ্ছচুম্বন, আনন্দে নৃত্য, বিবিধ ভাবভঙ্গি, গান ও লম্ফপ্রদানপূর্বক স্তম্ভে আরোহণ করিয়া পুনর্বার ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন।' বাল্মীকি এখানে বানর-যুথপতির স্বাভাবিক চাপল্যকে বজায় রেখেও তার মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন।

বাল্মীকির মহাকাব্য যেমন বিশাল, তাঁর আঁকা চরিত্রগুলিও তেমনি মহিমান্বিত। আবার মনস্তত্ত্ববিচারে এবং ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যেও তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। কৃত্তিবাসের চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে কবি তাঁর সমসাময়িক দেশকালের ছায়াকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি। কোনো কবি এমন কি আত্মমগ্ন গীতিকবিও তা পারেন না। সুতরাং রামায়ণের মতো আখ্যান কাব্যের চরিত্রচিত্রণে কৃত্তিবাস যে মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের জীবন ও চরিত্রাদর্শ গ্রহণ করবেন সেটাই স্বাভাবিক। সপ্তদশ শতকের কবি তুলসীদাসও মধ্যযুগীয় ভারতের আত্মনিবেদনমূলক ভক্তির আদর্শেই তাঁর চরিত্র-পরিকল্পনা করেছিলেন। আসলে সমাজে বাস করে বিশেষ ধরণের সমাজচেতনার মধ্যে বেড়ে ওঠার ফলে শিল্পীর সৃষ্টিতে যে পরিমাণ দেশকালের প্রভাব পড়া সম্ভব কৃত্তিবাসের আঁকা চরিত্রে সেটুকু থেকেছে। তাই সীতা হয়েছেন বাঙালী ঘরের কোমলস্বভাবা কল্যাণী গৃহবধূ, রাম হয়েছেন গৃহচারী বাঙালীর উপযোগী আদর্শ পুত্র, আদর্শ অগ্রজ ও আদর্শ স্বামী, লক্ষ্মণ হয়েছেন আদর্শ অনুজ ও ভক্তিনত দেবর, রাবণ হয়েছেন প্রচ্ছন্ন ভক্ত এবং বীরবাহু-তরণী সেন প্রমুখের মধ্যে ভক্তিমিশ্রিত বীররস যে করুণকোমল অথচ বীর্যবান জীবনাদর্শকে ফুটিয়ে তুলেছে তা বাংলাদেশের নরনারীর জীবনের ছায়াতলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইখানেই কৃত্তিবাসের চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা এবং এর ফলেই তাঁর রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় কাব্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

মন্তব্য

ভরত ঃ- ভরতের চরিত্র রামায়ণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দুর্ভাগ্য যে, অন্যকৃত অপরাধের শাস্তি তাঁকে বহন করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর সৌজন্য ও বিনয় দ্বারা সকলের চিত্ত জয় করেছিলেন। ভারতের চরিত্র নির্মাণে কৃত্তিবাস বাল্মীকিরই অনুসরণ করেছেন।

দশরথ ভরত সম্পর্কে বলেছিলেন — ''আমি ভরতকে রাম অপেক্ষাও অধিকতর ধার্মিক বলিয়া মনে করি।'' কিন্তু পরে রামের অভিষেকের উদ্যোগ নিয়ে রামকে তিনি বলেন — ''যে সময়ে ভরত এই রাজধানী ছেড়ে প্রবাসে আছে সেই সময়ই অভিষেকের উপযুক্ত, এই আমার মত। সত্য বটে তোমার ভ্রাতা ভরত সৎ-স্বভাব, জ্যেষ্ঠের অনুগত, ধর্মাত্মা, স্নেহশীল জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু আমি মনে করি যে মানুষের চিত্ত অস্থির, সাধু ও ধার্মিকদের মনও কারণ উপস্থিত হলে বিকারযুক্ত হয়।''

কৃত্তিবাস দশরথের এই ভাবান্তরকেই আরও পাকাপোক্ত করার জন্যেই হয়তো আদিকাণ্ডেই ভরত ও কৈকেয়ীকে রামের বিপক্ষে স্থাপন করেছেন।

'রামের শত্রু কৈকেয়ী রাজা সকল জানে।
সর্ববক্ষণ যুক্ত করে পাত্রমিত্র সনে।।
ভরত বিদ্যমানে যদি দেও ছত্রদণ্ড।
তবে কৈকেয়ী মোরে পাড়িবে পাষণ্ড।।
ভরত পাঠাইয়া দেহ পড়িবার ছলে।
রাজগিরি পড়ুক গিয়া মাতামহের ঘরে।।'

— আদিকাণ্ড

রাজগৃহ থেকে ভরত ফিরে আসেন দশরথের মৃত্যুর পর। উদ্ভুত পরিস্থিতি দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কৈকেয়ীকে হত্যা পর্যন্ত করতে উদ্যত হন, কিন্তু রামের অসন্তুষ্টির আশঙ্কায় নিরস্ত হন। শোকসন্তপ্ত কৌশল্যাকে ভরতই আশ্বস্ত করতে সক্ষম হন রামের প্রাপ্য সিংহাসন তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন — এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

ভরতের দানশীলতা ও ধার্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায় পিতার শ্রাদ্ধে ভাণ্ডার শূন্য করে দান-ধ্যানে।

ভরত তাঁর নির্লোভ এবং স্বার্থশূন্য চরিত্রের প্রমাণ দিয়ে আরও একটি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন ভরদ্বাজের আশ্রমে। তার আগে গুহকের রাজ্যেও ভরতকে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য সপ্রমাণ করতে হয়। ভরদ্বাজ ভরত ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য প্রভুত বিলাসের আয়োজন করেন। সেই আয়োজনে বশিষ্ঠ এবং কৌশল্যাও শোক বিস্মৃত হলেন, কিন্তু ভরতকে লুব্ধ করা গেল না। ভরদ্বাজও স্বীকার করলেন তাঁর নিষ্ঠা।

'মুনি বলেন ভরত পরীক্ষিলাম তোমার তরে।
তুমি হেন ভাই ভক্ত নাহিক সংসারে।।
যেই রাম সেই তুমি বিষ্ণু আপনি।
তোমার তরে লোভাইতে পারে কোন্ মুনি।।'

— অযোধ্যাকাণ্ড

রামের পাদুকা নিয়ে ভরত রাজ্যখণ্ড পালন করেন নন্দীগ্রামে, রাম তাঁকে অযোধ্যায় রাজপ্রতিনিধি হবার অনুমতি দেননি, তাঁর জন্যই অযোধ্যার সিংহাসন শূন্য রাখতে বলেছিলেন চোদ্দ বছর।

দশরথ ঃ- রাজা দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি অত্যন্ত আশক্ত ছিলেন, কৈকেয়ী তাঁকে অতি সহজেই বশীভূত করে ফেলতে সক্ষম ছিলেন — তাঁর সেই চরিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণেও প্রকাশিত। কৃত্তিবাস স্পষ্টই বলেছেন —

'কৈকেয়ী যুবতী স্ত্রী দশরথ বুড়া।
বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী প্রাণ হইতে বাড়া।।'

কৈকেয়ী যখন রামকে বঞ্চিত করার বর চাইলেন দশরথের কাছে, দশরথের রামের প্রতি স্নেহ এবং একান্ত নির্ভরশীলতার পাশাপাশি প্রকাশ পেল মৃত্যুভয়।

'রাজ্য ছাড়িয়া রাম যখন যাইবেন বন।
সেই দিন সেই ক্ষণে আমার মরণ।'

এরপর থেকে তিনি কৈকেয়ীকে তিরস্কার করতে লাগলেন শুধু পতিহন্তা হিসেবে। স্ত্রীর একমাত্র সম্পদ স্বামী কাজেই চণ্ডালহৃদয় কৈকেয়ীর এই কাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। এই যুগে দশ হাজার বছর লোক জীবিত থাকে, দশরথ নয় হাজার বছর বয়স্ক, তিনি অনায়াসে আরও এক হাজার বছর বাঁচতে পারতেন, তিনি কৈকেয়ীর পায়ে ধরে নিজের আয়ু ভিক্ষা করলেন। বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এ

মন্তব্য

দশরথের মানসিক দ্বন্দ্ব অনেক তীব্র। একদিকে প্রাণাধিক পুত্রে সঙ্গে বিচ্ছেদ ও লোকসমাজে ঘোরতর লজ্জা ও অন্যদিকে কৈকেয়ীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে ধর্মপ্রবণ চিত্তের দ্বিধা দশরথের চিরত্রকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। কৃত্তিবাসে দশরথ অনেকটাই বিলাপপ্রবণ, অসহায় বৃদ্ধ রাজায় পরিণত হয়েছেন।

৮.১০ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালী জীবনের প্রতিফলন

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একসময় বলেছিলেন —

''এই বাংলা মহাকাব্য কবি বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙালী সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।''

বাংলা রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যে কতদূর সত্য এবার তার পরিচয় নেওয়া যাক।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের, তার মানসপ্রবণতা ও জীবনাদর্শের যে অনিবার্য ছায়াপাত ঘটেছে চরিত্রচিত্রণ ও রসবিচার প্রসঙ্গে আমরা তার উল্লেখ করেছি। সামাজিক আচার-আচরণের বর্ণনাতেও আমরা দেখি ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়েছেন। তাই বাঙালীর রুচি পছন্দের মুখ চেয়ে বাঙালী কবি বিবাহ বর্ণনার সুযোগ পেলে ছাড়েন না, আর বিয়ের অনুষ্ঠানের যাবতীয় খুঁটিনাটি যথেষ্ট দক্ষতা ও উৎসাহের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। সেইজন্যে তিনি দশরথের বিয়ের বর্ণনা দেন, যা বাল্মীকি রামায়ণে নেই। এমন কি বাসি বিয়ে, কালরাত্রি, আড়িপাতা ইত্যাদি বিয়ের কোনো পর্বই তিনি বাদ দেন নি। আবার রাম-লক্ষমণ, ভরত-শত্রুঘ্নের জন্ম হলে নবজাতকের জাতকর্ম ইত্যাদি বর্ণনায় বাঙালী হিন্দুর আচরণীয় সব সংস্কারকেই অনুসরণ করেছেন। যেমন শিশুর জন্মের পর পাঁচদিনে 'পাঁচুটি', ছ'দিনে, 'ষষ্ঠীপুজো', আটদিনে 'অষ্টকলাই', তেরো দিনে 'জননাশৌচান্ত', ছ'মাসে 'অন্নপ্রাশন' ইত্যাদি। রাম-সীতার বিয়ে উপলক্ষ্যেও কৃত্তিবাস অধিবাস, স্ত্রী-আচার, যৌতুকদান, বাসরঘরের রঙ্গরসিকতা, বধূবরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলির নিখুঁত বিবরণ দিয়ে বাঙালীর সামাজিক আচার-আচরণকে যেন প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেক জায়গাতেই পশ্চিমবঙ্গের দৃশ্য ও দৈনন্দিন জীবনের ছবি ফুটেছে। গঙ্গা-অবতরণের বর্ণনায় কৃত্তিবাস গঙ্গাতীরের যে সব তীর্থের নাম করেছেন, যেমন মেড়াতলা, নদীয়া, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, আক্‌নামাহেশ প্রভৃতি, সেগুলি সবই পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ গ্রাম। রামের খোঁজে ভরত গুহকের কাছে এলে গুহক তাঁকে দই-দুধ, নারকেল-সুপারি, কলা-আম-কাঁঠাল দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তার সঙ্গে রুই ও চিতল মাছও দিতে ভোলেন না। আর ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর আশ্রমে ভরতের সৈন্যদের যা দিয়ে অতিথি সৎকার করেছেন তা হল —

'চন্দ্রাবতী বড়া পীঠে মুগের সাম্‌লী।
সুধাময় দুগ্ধে ফেলে নারিকেল পলি !! ...' ইত্যাদি।

আবার অযোধ্যায় ফেরার পথে রামের বানর বাহিনীকে ভরদ্বাজ 'ক্ষীর লাড়ু পাঁপড় মোদক রাশি রাশি' দিয়ে পরিতুষ্ট করেছেন। বলা বাহুল্য এ সবই বাঙালীর রসনালোভন ভোজ্য। কৃত্তিবাসের সীমিত কল্পনা এইসব খাদ্যতালিকায় মতিচুর, মোণ্ডা, রসকরা সরুচাকলি, গুড়পিঠে, চিতুইপুলি, কলাবড়া, তালের বড়া, ছানাবড়া, খাজা, গজা, পায়েস ইত্যাদি বাঙালীর প্রিয় মিষ্টান্নগুলিকে স্থান দিয়েছে। শুধু পরিবেশনের পাত্রগুলিকে স্বর্ণময় করে তুলে ভরদ্বাজের তপোবলের দিব্য প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। উত্তরাকাণ্ডে সীতাদেবী চোদ্দ বছরের উপবাসী লক্ষ্মণকে স্বহস্তে রান্না করে যা খেতে দিয়েছিলেন তার বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য —

'প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সুপ আদি দিলেন সানন্দ।।
ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকার কৈল বিতরণ।।
শেষে অম্বলান্ত হলে ব্যঞ্জনে সমাপ্ত।
দধি পরে পরমান্ন পিষ্টকাদি যত।।'

এইসব ভোজ্য অযোধ্যার বা মিথিলার নয়। এ নিতান্তই সাধারণ বাঙালীর পাকশালায় প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন। এর মধ্যে রাজকীয় আড়ম্বরের ছিটেফোঁটাও নেই। অযোধ্যার রাজবধূ সীতাও আচারে ব্যবহারে খাঁটি বাঙালী কুলবধূ। মুনিপত্নীরা সীতার কাছে রামের পরিচয় জানতে চাইলে —

'লাজে অধোমুখী সীতা, না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি যে আমার।।'

এখানে গুরুজনের সামনে সীতার লজ্জানম্র বধূমূর্তি সেকালের বাঙালী ঘরের কুলললনার চমৎকার

প্রতিচ্ছবি। উত্তরাকাণ্ডে 'গৃধিনী ও পেচকের দ্বন্দ্ব' আখ্যানে যে পাখপাখালির বর্ণনা দেখি তারাও বাংলার ঘরের আনাচে কানাচে উড়ে বেড়ানো অতি পরিচিত পাখি। সে তালিকায় কাক-কোকিল-বক-সারস, চিল-শকুন, পায়রা-বাবুই থেকে শুরু করে শুকসারী-কাকাতুয়া, মাছরাঙা-পেঁচা, কাঠঠোকরা, কাদাখোঁচা কেউই বাদ পড়েনি।

বাঙালীর পারিবারিক পরিহাসেরও একটি সুন্দর ছবি উত্তরাকাণ্ডে পাওয়া যায়। রামের আজ্ঞায় সীতাকে নির্বাসনে নিয়ে যেতে এলে সীতা সরল মনে ভ্রাতৃজায়াসুলভ রসিকতা করেছেন। 'লক্ষ্মণে দেখিয়া পরিহাস করে সীতে' —

'আইস দেবর আজি বড় শুভদিন।
এবে হে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীণ।।
চৌদ্দ বৎসর একত্রে বঞ্চিলাম বনে।
রাজশ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে।।
কহিয়াছি কত মন্দ কথা অবিনয়।
সে কারণে দেবর হে হয়েছ নির্দয়।।
বৈসহ বৈসহ লক্ষ্মণ সীতাদেবী বলে।
বার্তা কহ দেবর হে আছত কুশলে।।
তোমা না দেখিয়া মম সদা পোড়ে মন
উত্তর না দেহ কেন বিরস বদন।।'

এই পরিহাস বাঙালী পরিবারের বৌদি-দেবরের রঙ্গ কৌতুক। আগেই দেখেছি 'অঙ্গদ রায়বারে'র (দ্রষ্টব্য ঃ রসবিচার, হাস্যরস) 'আধা তর্জা' জাতীয় স্থূল হাস্যপরিহাস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ বাঙালীর মধ্যযুগীয় জীবন ও সমাজ পরিবেশকে কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে থেকেই সে যুগের সাধারণ মানুষ তার জীবনের ছোটো বড়ো সবরকম আদর্শ খুঁজে পেয়েছিল। রাম-লক্ষ্মণের মধ্যেকার আদর্শ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সতীত্ব ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি সীতার বধূজীবন, রাম-সুগ্রীব-বিভীষণের অকপট বন্ধুত্ব, হনুমানের দাস্যভক্তি-এ সবই বাল্মীকির অযোধ্যা বা লঙ্কাপুরী ছেড়ে বাঙালীর ঘরের জিনিস হয়ে উঠেছিল। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণ সীতা শুধু নন, দেব-দানব-রাক্ষসেরা সুদ্ধ মধ্যযুগীয় গৃহস্থ বাঙালী চরিত্রে পরিণত হয়েছেন।

বাল্মীকি রচিত রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে যুদ্ধ বিজয়ী রাম যখন সীতাকে প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন সীতা তাঁকে 'প্রাকৃতজন' অর্থাৎ নীচ ছোটলোক বলেছেন। কিন্তু বাঙালী কবি বাংলার জনগণের সামনে ভ্রাতৃত্বে, পুত্রত্ব ও সতীত্ব আদর্শের গৌরব রক্ষার খাতিরে এগুলি বর্জন করেছেন। সুতরাং কৃত্তিবাস শুধু যে সমসাময়িক দেশকালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তা নয়, সাধারণের সামনে চারিত্রিক আদর্শকে তুলে ধরে তার দ্বারা বাঙালীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণও করেছেন। তাই নির্বিকার বাল্মীকি যখন ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য অহল্যার ইন্দ্রকে স্বেচ্ছায় বরণের কথা বলেন তখন কৃত্তিবাস ইন্দ্রের ওপর প্রবঞ্চনার দোষ চাপিয়ে অহল্যার সতীত্বকে নিষ্কলঙ্ক করে দেখান। তেমনি সীতাহরণের সময় রাবণ-সীতার দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় কুণ্ঠাহীন। কিন্তু কৃত্তিবাসের নীতিবোধের কাছে সেটি বর্জনীয় বলে মনে হয়েছে। আবার সীতার সঙ্গে রাবণের দূরত্ব ও সীতার বিশুদ্ধি বজায় রাখার জন্যে কৃত্তিবাস লক্ষ্মণের গণ্ডি দেবার ব্যাপারটি কল্পনা করেছেন যেটি বাল্মীকিতে নেই। এইভাবেই বাঙালী কৃত্তিবাস বাঙালী জীবনাদর্শের উপযোগী করে আর্য রামায়ণের চরিত্রগুলিকে শোধন করে নিয়েছেন। সেইজন্যে বনবাসী রাম-লক্ষ্মণেরা বাল্মীকি রামায়ণে স্বাভাবিক কারণেই মাংসভোজী ও মদ্যপায়ী হলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণে তারা ফলমূলাহারী হয়ে সাত্ত্বিক জীবনযাপন করে।

অরণ্যকাণ্ডে রামকে-খুঁজতে আসা সৈন্যদলকে ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর তপোবনে দেবভোগ্য উপকরণে আপ্যায়িত করেছিলেন। বাল্মীকি তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন —

এক একজন পুরুষকে সাত আটজন সুন্দরী স্ত্রী নদীতীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে অঙ্গ সংবাহন করে মদ্যপান করাতে লাগল।

পানভোজনে এবং অপ্সরাদের সহবাসে পরিতৃপ্ত সৈন্যগণ রক্তচন্দনে চর্চিত হয়ে বললে, — আমরা অযোধ্যায় যাব না, দণ্ডকারণ্যেও যাব না, ভরতের মঙ্গল হোক, রাম সুখে থাকুক।

এদিকে কৃত্তিবাসের বর্ণনায় দেখি —

'দেবকন্যা অন্ন দেয় সৈন্যদল খায়।
কে পরিবেশন করে জানিতে না পায়।।
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স।
নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানারস।
চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ।

মন্তব্য

যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ।।
মধুকর মধুকরী কঙ্কারে কাননে।
অপ্সরারা নৃত্য করে গীত আলাপনে।।
সবে বলে দেশে যাই হেন সাধ নাই।
অনায়াসে স্বর্গ মোরা পাইনু হেতাই।।'

এখানে দেখা যাচ্ছে অন্যসব প্রসঙ্গের মতো ইন্দ্রিয়সুখের প্রসঙ্গেও বাল্মীকির কল্পনা অকুণ্ঠ। কিন্তু নীতিবাগীশ কৃত্তিবাসের মনে সঙ্কোচ আছে বলেই ভরদ্বাজের আতিথ্যে 'তিনি শুধু দেখেছেন ঔদরিকতার আকণ্ঠ উদারতা'। কৃত্তিবাসের সৈন্য সামন্তরা শাক-ভাত খেয়ে মানুষ, হঠাৎ বড়ো দরের নেমন্তন্ন পেয়ে এত খেয়ে ফেলেছে যে আর নড়তে পারছে না। বাল্মীকির ভোজ্যতালিকা রাজকীয়; কিন্তু মদ্যমাংস বাদ দিতে গিয়ে কৃত্তিবাস সুবৃহৎ ফলারের বেশী কিছু জোটাতে পারেননি। তাই বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন —

কৃত্তিবাস যে সভ্যতার প্রতিভু তার অশন বসন রীতিনীতি সবই অনেকটা নিচু স্তরের; আর বাল্মীকি যদিও তপোবনবাসী বলে কথিত, তবু তিনি রাজধানীরই মুখপাত্র, শ্রেষ্ঠ অর্থে নাগরিক, তুলনায় কৃত্তিবাসকে মনে হয় রাজার দ্বারা বৃত হয়েও প্রাদেশিক, কেননা তাঁর রাজা নিজেই তাই।.... বাল্মীকির পাশে কৃত্তিবাস বাঙালী মাত্র, শুধু বাঙালী। — প্রবন্ধ সংকলন; রামায়ণ ১৯৪৭ তাই কৃত্তিবাস বাল্মীকির বাংলা অনুবাদক নন, তিনি রামায়ণের বাংলা রূপকার। এবং গ্রন্থটির প্রাকৃতিক এবং মানসিক আবহাওয়া একান্তই বাংলার।

৮.১১ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়নের জনপ্রিয়তা

বাঙালী পাঠকের কাছে কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এর জনপ্রিয়তা অপরিসীম। প্রচারের শুরু থেকেই কবি ও তাঁর কাব্য 'এ বঙ্গের অলংকার'। কোন গুণে এই 'রামায়ণ' এতদূর জনপ্রিয় হয়ে উঠল তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধের অংশ উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছিলেন — ''কৃত্তিবাস এবং তৎপরবর্তী অনেকে একই রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য নির্মাণ করিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রিয়, সকল সমাজের আদরণীয় হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কী ?

কৃত্তিবাস মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ মাত্র অবলম্বন করিয়াই কাব্য লিখেন নাই। আমাদের দেশে কথকতায়, যাত্রায়, গোষ্ঠীবন্ধনে, সর্ব্বত্রই নানাভাবে ও নানা আকারে রামবিষয়ক বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে, কৃত্তিবাসের বহু পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ফলতঃ লোকমুখে স্ত্রী পুরুষ সমাজে রামসীতার কথা কীর্ত্তিত হইত, এখনও হইতেছে। কৃত্তিবাস তদীয় গ্রন্থরচনায় এই লোকপরম্পরা গত গাথার অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল অনুবাদে মহর্ষি চিত্রিত আলেখ্যাবলীর পুনশ্চিত্রণেই যদি কৃত্তিবাস রত থাকিতেন, তাহা হইলে, তদীয় কাব্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার পরবর্তী রামায়ণ-লেখকগণের অনেকের গ্রন্থে কৃত্তিবাসোচিত মৌলিকতা নাই। অধিকাংশ স্থানেই অনুবাদ মাত্রে পর্য্যবসিত।

কৃত্তিবাস জানিতেন যে, যাঁহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি চান, কতটুকু বা কতটা তাঁহাদের অভিলষিত ? কিরূপ আলেখ্যে তাঁহাদের নয়ন রঞ্জন হইবে ? কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন সর্ব্বদা এই মন্ত্রের স্মরণপূর্ব্বক কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে। এই জন্যই কেবল বাল্মীকির আদর্শই তাঁহার উপজীব্য ছিল না, তিনি প্রয়োজনমত, অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, আধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ প্রভৃতি হইতেও তিনি আদর্শ সংকলন করিয়াছেন।

অনেক কাব্য কবির সমসাময়িক সামাজের রুচি এবং ছায়ার অনুসরণে নির্মিত হওয়ায় সেই নিয়মিত সমাজে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সেই কাব্য আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্তী ও পরিবর্তিত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া যায়। যে কবির কাব্য, যত অধিক পরিমাণে এইরূপ সাময়িকভাবে পরিপূর্ণ, সে কবির কাব্য, ততই অল্পকালস্থায়ী। অন্যান্য অনুবাদকগণের রামায়ণ গ্রন্থের অপ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ।.....

বস্তুত সরল ভাষা এবং সুস্পষ্টভাব — এই দুই দুর্লভ সম্পদে কৃত্তিবাসের কাব্য বঙ্গ সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতি সরল কথায়, সকলের বোধগম্য ভাষায়, তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভাষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাঁহার কাব্য কুত্রাপি দুষ্ট হয় নাই। তিনি যখন যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা

রাখেন নাই। যে কবি, যত অধিক পরিমাণে প্রাঞ্জলভাষায় মনের ভাবরাশি, তদীয় সমাজের সমক্ষে অতি সুস্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত অধিক আদৃত হইবেন। কৃত্তিবাস সেইটি অতি উত্তমরূপে পারিতেন বলিয়াই, তাঁহার ''রামায়ণ'' অপরাপর ''রামায়ণ'' অপেক্ষা ভাবুকসমাজে, অথবা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সমাজেই এত প্রিয় হইযাছে।....

কৃত্তিবাস মহর্ষিকৃত আদর্শের উপর সর্তক হস্তে বর্ণসংযোগপূর্ব্বক, তৎ তৎ চিত্রাবলী বঙ্গীয় সমাজের অনুগতভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অলঙ্কারের গুরুভারে, বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্লিষ্ট হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্র একভাবে, ভাগীরতীর প্রবাহের ন্যায় তর তর করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ দুষ্ট হয় নাই, বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অমর্য্যাদা ঘটে নাই। অন্যান্য কবি অপেক্ষা তদীয় প্রাধান্যের এইটিই মুখ্য কারণ। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতার সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য চিত্রনৈপুণ্যের সম্মিলনে তদীয় কাব্য ত্রিবেণীসঙ্গমের ন্যায় পবিত্র ও সর্ব্বজনসেব্য হইয়াছে।" [বৈশাখ ১৩২৩ ব., 'নারায়ণ']

কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এর জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ নির্দেশ করেছেন দীননাথ সান্যাল।

''কোন গুণে কৃত্তিবাসের রামায়ণ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্ব্বিচারে সকলের গৃহে এমন অভূতপূর্ব্ব সমাদর পাইল, ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ধর্ম্মকাব্য। রাম-লক্ষ্মণাদি চারি ভ্রাতা, নারায়ণের চারি অংশে অবতার এবং সীতা লক্ষ্মীদেবীর অবতার — এইভাব কৃত্তিবাসের রামায়ণে বিশিষ্টরূপে প্রকটিত। গ্রন্থের সর্ব্বত্র পাঠকের মনে এইভাব জাগ্রত রাখিতে কৃত্তিবাস সর্ব্বদা সচে,ট। রামায়ণের ঘটনাপুঞ্জের বিবৃতি বিষয়ে তিনি প্রধানত বাল্মীকির অনুসরণ করিলেও, রামায়ণকে ধর্ম্ম-ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে তিনি আধ্যাত্ম রামায়ণেরই অনুসরণ করিয়াছেন। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কাব্যের আদর্শ-চরিত্র যত বড়ই হউক না কেন, তাহা যদি কেবলমাত্র মানবচরিত্র হয়, তাহাতে জনসাধারণের মন আকৃষ্ট হয় না। সেই চরিত্রের প্রতি লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিতে হইলে তাহাতে দেবত্বের আরোপ করিতে হয়। নতুবা, সাধারণের কাছে তাহা যথোচিত সমাচর পায় না। সাধারণ লোকের মনোমধ্যে উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এই পন্থাই সমীচীন — অবশ্য সাধারণ লোক যতদিন অসাধারণ না হইতেছে ততদিন এই পন্থাই সমীচীন। শুধু মানব-চরিত্রের উচ্চ আদর্শ লইয়া কেহ সাধারণ লোকের মনে সিংহাসন পাতিতে পারিয়েছেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু রামায়ণকে ধর্ম্ম-ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া বাঙ্গালায় কৃত্তিবাস ও পশ্চিমে তুলসীদাস সাধারণের কাছে কিরূপ ভক্তির সহিত সমাদর পাইয়া আসিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কৃত্তিবাস ''লোক বুঝাবার তরে'' যখন রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন লোক-হৃদয়ের এই গূঢ়-তত্ত্বটুকু বুঝিয়াই তিনি আধ্যাত্ম-রামায়ণের অনুসরণে তাঁহার রামায়ণে অবতার-বাদ ওতপ্রোতভাবে প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন এবং দেশের লোক তাহা সাদরে গ্রহণ করিল।" ['মানসী ও মর্মবামী' / বৈশাখ ১৩২৬ ব.]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও দীননাথ সান্যাল — দুজনের রচনাই মূলে কৃত্তিবাস স্মরণোৎসবের সভাপতির অভিভাষণ।

এই দুটি রচনাংশ থেকে কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এর জনপ্রিয়তার যে কারণগুলি পাওয়া গেল আমরা তাকে সূত্রাকারে সাজাতে পারি —

১। কৃত্তিবাস বাল্মীকির অনুবাদমাত্র করেননি। লোকপরম্পরাগত কাহিনিগুলি মৌলিকভাবে স্বীকরণ করেছেন।

২। কবিত্বের সার্থকতার মূলমন্ত্রটি কৃত্তিবাসের আয়ত্ত ছিল — কাদের জন্য, কতটুকু এবং কেমন ভাবে বলতে হবে। এই জন্যই তিনি 'কালিকাপুরাণ', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'অদ্ভুত রামায়ণ' থেকে কাহিনি গ্রহণ করেছেন।

৩। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ধর্মকাব্য হিসেবেই গড়ে উঠেছে। রামকে দেবতা বলে তুলে ধরা হয়েছে শুরু থেকেই, ফলে বিশুদ্ধ কাব্যরসের থেকেও বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে এই কাব্য।

৪। 'লোক বুঝাবার তরে'-ই তাঁর কাব্য রচনা এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি সফল।

৫। কাহিনি নির্মাণ ও চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি মহাকাব্যিক দূরত্ব না রেখে, সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার আয়ত্তে নিয়ে এসেছেন কাব্যকে।

৬। সাধারণ বাঙালি তাদের চেনা পরিবেশ মানুষজন এবং মূল্যবোধ-আবেগ, রীতি-নীতিকে প্রতিফলিত দেখেছে এই কাব্যে।

৭। তবে কৃত্তিবাসের কাব্য শুধুই সমকালীনতায় আবদ্ধ নয়। ভাব ও ভাষার প্রাঞ্জলতা, চিত্রনৈপুণ্য, আবিলতাহীন স্বচ্ছ কবিত্বশক্তির

মৌলিকতায় এই কাব্য চিরকালীন হয়ে উঠেছে।

৮। কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এর জনপ্রিয়তার একটি অন্যতম কারণ হল এর সহজবোধ্য ভাষা।

মন্তব্য

ভাষার সরলতাই সাধারণ মানুষের কাছে এই কাব্যকে পৌঁছে দিয়েছে। কৃত্তিবাস সংস্কৃত 'রামায়ণ'-এর বর্ণনা, উপমা — অলংকার হুবহু গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাকে প্রকাশ করেছেন লোক সাধারণের বোধগম্য রূপে। তাই বিরাধ রাক্ষসের আক্রমণে 'নবীন কদলীপত্রের ন্যায় কম্পমান সীতা' কৃত্তিবাসে রূপান্তরিত হয়েছেন —

'ঝড়ে ব্যাকুলি যেন ফলার বাগুড়ি
বিরাধের কোলে কাঁদেন সীতা তো সুন্দরী'

৯। কৃত্তিবাসের কাব্যে শ্রোতার মনোরঞ্জনের উপাদানগুলি যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যুদ্ধের বর্ণনায় আড়ম্বরের পাশাপাশি আবেগময় করুণরস সৃষ্টিতেও তিনি শ্রেষ্ঠ।

১০। তাঁর কাহিনি কথনের দক্ষতাও তাঁর জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ, প্রতিটি কাণ্ডেই কৃত্তিবাস শুরুতে অথবা শেষে আগে যা ঘটেছে এবং পরে যা ঘটতে চলেছে তার সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কাহিনির গুরুত্বপূর্ণ বাঁকগুলিতে তিনি শ্রোতার কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ভবিষ্যদ্‌বাণীর আশ্রয় নিয়েছেন।

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'-এর অসামান্য জনপ্রিয়তার নিদর্শন শুধু বাংলায় নয়, বহির্ভারতেও ছড়িয়ে আছে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যগুলির মধ্যে কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এর যত পুঁথি পাওয়া যায়, তত পুঁথি আর কোনো কাব্যের পাওয়া যায় না। পটচিত্রে এবং মন্দির গাত্রে কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যজীবনের পাশাপাশি এই 'রামায়ণ'-এর কাহিনির চিত্রায়ণ দেখা যায়। দশরথের অন্ধ ঋষিপুত্র বধের চিত্র, রামের অকালবোধনে, দশভুজা দুর্গার চিত্র বেশি দেখা যায়। বর্হিভারতে কম্বোডিয়ার আঙ্কোর থমে অবস্থিত বেয়ন মন্দিরের গায়ের ভাস্কর্যে লক্ষ্মণের গণ্ডি কাটার চিত্র, সমুদ্রের তীরে বানর সেনার সমাবেশ ও সেখানে গরুড়ের পিঠে আসীন বিষ্ণুর চিত্র, লঙ্কাযুদ্ধ শেষে রাম লক্ষ্মণের ফেরার চিত্র, সেখানে তাদের দেখানো হয়েছে শিবের ভক্তরূপে ত্রিশূলধারী হিসাবে — ইত্যাদি কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'-এর বিস্তারেরই নিদর্শন।

৮.১২ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণের রসবিচার

করুণারস ঃ- প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রমতে বীর, করুণ, আদি ও শান্ত এই চারটি রসের যে কোন একটি মহাকাব্যের প্রধান রস হতে পারে। আর আমরা সকলেই জানি আদি কবির শোক থেকে উচ্চারিত শ্লোকেই রামায়ণের উদ্‌ভব। তাই করুণ রসই রামায়ণের মুখ্য রস। রামায়ণের আগাগোড়া কাহিনীটিই তো করুণরসের আকর। অযোধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত রামের নির্বাসন, অযোধ্যাবাসীর বিলাপ, কৌশ্যলার খেদ, দশরথের মৃত্যু থেকে শুরু করে অরণ্যকাণ্ডে সীতাহরণ, রামলক্ষমণের বিলাপ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বালীবধে তারার ক্রন্দন, লঙ্কাকাণ্ডে বংশানশে রাবণের শোক, রাবণের পতনে তার বিধবা পত্নীদের আর্তনাদ, সীতার অগ্নিপ্রবেশ ইত্যাদি কাহিনীতে করুণরসের প্রবাহ বয়ে গেছে। উত্তরাকাণ্ডেও সীতার নির্বাসন, রামের বেদনা, সীতার পাতালপ্রবেশ এবং শেষে তিন ভাইসহ রামের সরযূ নদীতে দেহত্যাগ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই বেদনার অশ্রুজলে অভিষিক্ত। কৃত্তিবাস এই কাহিনীরই অনুবর্তন করেছেন। কিন্তু মহাকবি ও প্রাদেশিক কবির মধ্যে কবিত্ব শক্তির পার্থক্য যত তাঁদের পরিবেশিত করুণরসের অভিব্যক্তিতেও পার্থক্য ততদূর। মহাকবি বাল্মীকির করুণরসে যে সংযত মহিমা দেখা গেছে কৃত্তিবাসে সেই সংযম, সেই মহিমা ফোটেনি। তাই তাঁর রামায়ণে কান্না ও বিলাপের আতিশয্য দেখা গেছে।

আদিকাণ্ডে ঋষি বিশ্বামিত্র যখন রাক্ষস বধের জন্য রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে যাচ্ছেন তখন দশরথ তাঁদের বিদায় দিতে কেঁদেই আকুল —

'শ্রীরাম লক্ষ্মণে লইয়া বিশ্বামিত্র যান।
মহারাজ নেত্রনীরে ধরমী ভাসান।।
কতদূরে গিয়া রাম হ'ন অদর্শন।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন।।'

দশরথের মতো বীর্যমান প্রতাপান্বিত রাজার পক্ষে এমন কান্না অশোভন ও অসংগত। রামের অভিষেকের প্রাক্কালে কৈকেয়ীর বর প্রার্থনায় সত্যবদ্ধ দশরথের দুর্দশার যে ছবি কৃত্তিবাস এঁকেছেন তা হল —

'কৈকেয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমি তলে।
সর্বাঙ্গ তিতিল তাঁর নয়নের জলে।।'

কৃত্তিবাসের রামলক্ষ্মণ পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাই —

'রাজার দুঃখেতে দুঃখী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাজার ক্রন্দনে কাঁদেন ভাই দুইজন।।'

সেইসঙ্গে রামনির্বাসনে রাজধানী অযোধ্যাতেও 'রাত্রিদিন কান্দে লোকে করে জাগরণ।' আবার সীতাহরণের পরে রামের যে বিলাপ তাও চোখের জলে তরল —

'কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশুপাখী।'

এরপর বর্ষাসমাগমে রাম মাল্যবান পর্বতে গেলেন। ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরূপ। কিন্তু — 'সীতা বিনা সর্বসুখে শ্রীরাম বঞ্চিত' এবং পুরো বর্ষাকাল ধরে — 'সীতা লাগি শ্রীরাম কান্দেন চারিমাস।'

সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময়ে প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে সীতাকে না দেখে কৃত্তিবাসের রামের অবস্থা হল —

'কুণ্ডমধ্যে চাহি তবে সীতারে না দেখি।
ঝরিতে লাগিল তার দুটি পদ্ম-আঁখি।।
দেখেন সংসার শূন্য যেমন পাগল।
ভুমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল।।'

কৃত্তিবাসের রামের চরিত্রে বীরোচিত ধৈর্য-গাম্ভীর্যের নিতান্তই অভাব। তাঁর অধীরতার জন্য তাঁর আচরণ কাপুরুষের মতো বোধ হয়। আবার শুধু রাম নন, রামের প্রতি সহমর্মিতায় উপস্থিত সকলেই কেঁদে ভাসাচ্ছেন —

'রামের ক্রন্দনে কাঁদে সর্ব দেবগণ।
কান্দিছে বরুণদেব শমন পবন।।
যত লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর।
জলের ভিতরে তাকি কান্দেন সাগর।।
নল নীল কান্দে আর সুগ্রীব বানর।
জাম্বুবান সুষেণ ও বালির কোঙর।।....
কান্দিতে কান্দিতে রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
সীতার পরীক্ষা গীত গায় কৃত্তিবাস।।'

এখানে কান্না অনেক আছে, কিন্তু করুণরসের মর্মস্পর্শী গভীরতা আছে কি ? সীতা বিসর্জনের পরেও রামের অশ্রুধারা প্রবহমান —

'লক্ষ্মণ বলেন তুমি করিলে বর্জন।
আপনি বর্জিয়া কেন করহ রোদন।।
ক্রন্দন সম্বর প্রভু ক্ষমা দেহ মনে।....'

কৃত্তিবাসের রাম-এর সঙ্গে বাল্মীকির রামের আচরণ তুলনা করলে কাব্য কিভাবে প্রকৃত করুণ রসসৃষ্টির আধার হয়ে ওঠে তা বোঝা যাবে। সীতার লোকাপবাদ শুনে পরম দুঃখিত মহাবীর রামচন্দ্র কেবল সভাসদদের জিজ্ঞাসা করলেন যে সকলেই কি একথা বলে ? সকলে তা সমর্থন করলে ধীরপ্রকৃতি রাজা বিনাবাক্যে সভাসদদরে বিদায় করলেন এবং তিন ভাইকে ডেকে পাঠালেন। তিনি মুর্ছাও গেলেন না — মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে মাথাও কুটলেন না। ভাইরা এলে শুধু অশ্রুজল চোখে কিন্তু অবিচলিত মুখে তাদের জানালেন যে তিনি অন্তরে সীতাকে পবিত্র বলে জানেন — অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্। কিন্তু যেহেতু লোকাপবাদ প্রবল অতএব তিনি সীতাকে ত্যাগ করবেন। তারপর স্থিতপ্রতিজ্ঞ রাম লক্ষমণকে সীতা বিসর্জনের জন্য আদেশ দিলেন।

মহাকবির লেখনীতে শোকের অন্তহীন দাহ ও বিষাদের স্তব্ধ গাম্ভীর্য যে করুণরস সৃষ্টি করেছে কৃত্তিবাস তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারেন নি। কান্না ছাড়া করুণরস সৃষ্টির আর কোনো উপকরণ তাঁর হাতে ছিল না। তাই সীতার পাতাল প্রবেশেও শোনা গেল —

'অযোধ্যার নগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন।।
শ্রীরামের ক্রন্দন হৈল অনিবার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার।।'

সুতরাং কৃত্তিবাসী রামায়ণে বহু দুঃখজনক ঘটনা এবং তার জন্য বিলাপের হাহাকার যথেষ্ট থাকলেও যথার্থ করুণরস সৃষ্টি হয়েছে কিনা তাতে সংশয় থেকে যায়।

বীররস ঃ- বীররস সৃষ্টিতে ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ কবি কৃত্তিবাস তেমন সফল হতে পারেন নি।

মন্তব্য

বাল্মীকির সঙ্গে তুলনা করলেই বিষয়টি ভালো বোঝা যাবে। বীররস ও রৌদ্ররস সৃষ্টিতে বাল্মীকির যুদ্ধকাণ্ডই শ্রেষ্ঠ। তবে অরণ্যকাণ্ডের যুদ্ধ বর্ণনাও যথেষ্ট উত্তেজক। বিরোধ বিশেষ করে খরের সঙ্গে রামের যুদ্ধ বর্ণনায় পরস্পরের আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের প্রতিটি স্তর নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তুলনায় কৃত্তিবাসের বর্ণনা অনেক নিষ্প্রভ —

'হাতে অস্ত্র নাহি আর উঠি দিল রড়।
রামেরে রুষিয়া যায় খাইতে কামড়।।'

এই জাতীয় বর্ণনায় যুদ্ধজনিত বীররসের সৃষ্টি হয় না।

যুদ্ধের অতিবিস্তারিত ও ক্রমোত্তেজক বর্ণনায় বাল্মীকির যুদ্ধকাণ্ড অতুলনীয়।

কৃত্তিবাসের যুদ্ধ বর্ণনা অনেকটাই নিরুত্তাপ ও উত্তেজনাহীন। অবশ্য বাহুযুদ্ধের চেয়ে বাগ্‌যুদ্ধেই কৃত্তিবাসের দাপট অনেক বেশি। হনুমান-মেঘনাদের বাগ্‌যুদ্ধ বা অঙ্গদের রায়বার তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যুদ্ধ বর্ণনায় বাঙালী কবি তাঁর সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন লেখেন —

'অশ্বকর্ণ বৃক্ষ ধরে দিল তিন পাক।
বায়ুবেগে ঘুরে যেন কুমোরের চাক।" (লঙ্কাকাণ্ড)

তখন তাতে বীররস সৃষ্ট হয় না।

আসলে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেছিলেন সাধারণ শ্রোতাদের জন্যে যাদের কল্পনাশক্তি ও রসবোধ নিতান্তই খাটো মাপের। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না, তাদের পাঁচালীকারেরও সে অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব। অতএব কবি কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ডে মৌখিক আস্ফালনের মধ্যেই যুদ্ধের ভয়াবহতাকে সীমাবদ্ধ রেখে বাঙালী শ্রোতাদের উত্তেজনার আগুণ পোয়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাই কৃত্তিবাসের বীররসের বর্ণনা নেহাৎই যাত্রাদলের কৃত্রিম যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছে লঙ্কাকাণ্ডে দিয়েছিলেন। তাই কৃত্তিবাসের বীররসের বর্ণনা নেহাৎই যাত্রাদলের কৃত্রিম যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছে লঙ্কাকাণ্ডে ভক্তিরসের অনধিকার প্রবেশ। রাবণ থেকে শুরু করে বীরবাহু, তরণী সেন সকলেই কেউ প্রচ্ছন্নভাবে কেউ বা প্রকাশ্যভাবে রামভক্ত। মুক্তিলাভের আশায় তারা স্বেচ্ছায় রামের হাতে প্রাণ দিতে এসেছে। ফলে ভক্তবৎসল রামের পক্ষে সংকট ঘনিয়েছে — কিভাবে তিনি এমন ভক্তের প্রাণ সংহার করবেন। সুতরাং লঙ্কাকাণ্ডে সামরিক পরিবেশটাই ভক্তিরসে আর্দ্র হয়ে গিয়ে রৌদ্ররসের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেছে।

ভক্তিরস ঃ- কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্তিবাদের দুটি ধারা দেখা যায়। একটি নামাশ্রয়ী রাম ভক্তিবাদ, অন্যটি রামচন্দ্রের প্রতি দেবী চণ্ডীর বাৎসল্যভাব। নামতত্ত্ব যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত তা কিন্তু কৃত্তিবাসেরও আগে থেকে এদেশে প্রচলিত ছিল। অধ্যাত্ম রামায়ণ বা অদ্ভুত রামায়ণে তার নিদর্শন পাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডে রত্নাকর দস্যু যে রামনাম উচ্চারণ করতে না পারলেও শুধু 'মরা মরা' জপ করেই উদ্ধার পেল, অধ্যাত্ম রামায়ণেও সে নামতত্ত্ব পাওয়া যায় —

'ইত্যুক্ত্বা রাম তে নাম বাত্যস্তাক্ষরপূর্বকম্।
একাগ্রমন মাত্রেব মরেতি জপ সর্বদা।।'

এই রামনামের মাহাত্ম্য দশরথ ও অন্ধকমুনির বিবরণেও কীর্তিত হয়েছে। দশরথ ভুল করে অন্ধক মুনির ছেলেকে শব্দভেদী বাণে বধ করে ফেলার পর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বশিষ্ঠপুত্র বামদেবের শরণাপন্ন হয়। বামদেব দশরথের পাপ স্খালনের জন্য তাঁকে তিনবার রামনাম জপ করান এবং দশরথ মহাপাতক থেকে মুক্তি পান। কিন্তু বশিষ্ট তাঁর পুত্রের অজ্ঞতার জন্য মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন —

'এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিনবার রাম নাম বলালি রাজারে।।
মোর পুত্র হয়ে তোর অজ্ঞান বিশাল
দূর হ'রে বামদেব হবি যে চণ্ডাল।।'

পিতৃশাপে বামদেব শেষে গুহক চণ্ডাল হয়ে জন্ম নেন। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেও কারণে অকারণে তাঁকে রামনামের মহিমা কীর্তন করতে দেখা যায় —

'রাম নাম জপ ভাই অন্য কর্ম পিছে।
সর্ব ধর্ম কর্ম রাম নাম বিনা মিছে।।'

এমন জপের মহিমা তিনি বার বার ব্যক্ত করেছেন —

'রামনাম লৈতে ভাই না করিও হেলা।

সংসার তরিতে রামনামে বান্ধ ভেলা।।
রামনাম স্মরি যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায়।।'

অবশ্য রামতত্ত্ব কৃত্তিবাসের আবিষ্কার নয়। ১২শ শতকের লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল)-রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে' নামতত্ত্বের আভাস আছে, আর ওই গ্রন্থ বাংলাদেশে অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত ছিল না। লঙ্কাকাণ্ডেই এই ভক্তির চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়। রামের সঙ্গে যাত্রায় বিভীষণ-পুত্র তরণী সেনের সমরসজ্জার যে বর্ণনা কৃত্তিবাস দিয়েছেন তা হল —

'অঙ্গে লেখা রামনাম রথ-চারিপাশে।
তরুণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে।।'

ভক্তবৎসল রামের চিন্তা এমন ভক্তের গায়ে কি করে অস্ত্রাঘাত করবেন ?

'কার্য নাই সীতায় না যাইব রাজ্যেতে।
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে।।
কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে।
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে।।'

কিন্তু রামের হাতে মৃত্যুবরণ করে স্বর্গে যাওয়ার জন্যেই যে তরণীর যুদ্ধে আসা। তরণীর ভক্তি এত বেশি যে মুণ্ড কাটা যাওয়ার পরেও তার মুখে রামনাম উচ্চারিত হতে থাকে —

'দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তরুণীর কাটা মুণ্ড রামনাম বলে।।'

রামভক্ত বীরবাহু তো নিজেই বৈষ্ণব অস্ত্র দিয়ে তাঁকে নিধন করার কথা বলেছেন —

'জানিলাম রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
অগতির গতি তুমি সংসারের সার।।
শ্রীচরণে অধীনের এই নিবেদন।
বৈষ্ণব অস্ত্রেতে মোরে করহ নিধন।।'

রাবণের যুদ্ধ যাত্রার সময়ে অশুভ লক্ষণ দেখে মন্দোদরী বিলাপ করলে রাবণ তাঁকে এই বলে আশ্বাস দেন —

'মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে।
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে।।
বিষ্ণুদূত লয়ে যাবে তুলিয়া বিমানে।
সমান প্রতাপে যাব জীবনে মরণে।।'

যুদ্ধের সময়ে অনুতপ্ত রাবণ রামের স্তুতি করলে রাম ব্যাকুল হয়ে ভাবতে থাকেন —

'কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রামনাম না লইবে আর।।'

শেষ যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের পতন হতে মুমূর্ষু রাবণকে রাম দর্শন দিলেন এবং রাবণ তাঁর মধ্যে ব্রহ্ম সনাতনকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলেন —

'অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।
দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।।
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
পাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার।।'

এই ভক্তি বাঙালীর জীবনের সাধনায় এমনকি তার অস্থিমজ্জায় পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। মনে রাখতে হবে কৃত্তিবাসের এই ভক্তের ভগবান রাম স্বয়ং বিষ্ণু, অবতার রূপে যিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ। তিনি বাল্মীকির 'নরচন্দ্রমা' অর্থাৎ নরশ্রেষ্ঠ নন।

লঙ্কাকাণ্ডেই রামনামের মহিমা আর এক ভাবও প্রচারিত। লঙ্কাযুদ্ধে বানরদের সদ্‌গতি হল না, অথচ রাক্ষসেরা মুক্তি পেল দেখে রামচন্দ্র ইন্দ্রকে তার কারণ জিজ্ঞেস করলে ইন্দ্র বলেন —

'রাবণেরে মার বলি কপিগণ মরে।
উদ্ধার পাইবে বল কি নামের জোরে।।
রামে মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষস।
রামনাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস।।'

রামনামের এমনই মহিমা। এই প্রসঙ্গে হনুমানের দাস্যভক্তির কথাটিও উল্লেখযোগ্য। রামে সমর্পিতপ্রাণ

মন্তব্য

হনুমান তাই বলে —

'তুমিই আশ্রয় মোর ওহে দয়ারাম।
তোমারি চরণে মোর মতি অবিরাম।।
দুর্বল হনুর তুমি একমাত্র বল।
তোমা বিনা নাহি কিছু হনুর সম্বল।।....
রাম হনুমৎ প্রভু হনু রামদাস।
থাকুক সর্বদা এই হনুর বিশ্বাস।।'

এই দাস্যভক্তি পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তখন ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কটি নিছক প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে নি। হনুমান তার প্রভু রামচন্দ্রকে যে সেবা করেছে তা কোনো কিছুর প্রলোভনে নয়। নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজের সেবাকে সে উৎসর্গ করেছিল। পরবর্তীকালে যে বৈষ্ণবীয় দাস্যভক্তি দেখা গেছে তার উৎস হয়তো এখানেই নিহিত ছিল।

আসলে বাংলাদেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে ভক্তির স্রোত বয়ে চলেছিল। একদিকে শাক্ত আর একদিকে বৈষ্ণব এই দু'রকম ভক্তিরস বাঙালীর স্বাভাবিক চিত্তধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর বাংলার কোমল মাটির সন্তান স্বভাবত ভাবপ্রবণ। আর বাঙলার জাতীয় কবি কৃত্তিবাস বাঙালী চিত্তের এই প্রবণতার উপযোগী করে তাঁর কাব্যে ভক্তিরসের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন। তবে এই ভক্তিরস কৃত্তিবাসের মৌলিক আবিষ্কার নয়। মন্দোদরী, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, কালনেমি প্রমুখ রাক্ষসেরা যে আসলে প্রচ্ছন্ন রামভক্ত তা রামকথাযুক্ত নানা পুরাণে কিংবা অধ্যাত্ম, যোগবাশিষ্ঠ ইত্যাদি রামায়ণে উল্লেখিত আছে। অধ্যাত্ম-রামায়ণে আছে রাবণ যখন জানতে পারলেন যে বিষ্ণুর হাতে নিহত হলে অন্তিম মোক্ষ অনিবার্য তখন বিষ্ণু-অবতার রামের হাতে হত হবার জন্যেই তিনি স্বেচ্ছায় সীতাকে হরণ করেন। কৃত্তিবাস সম্ভবত ওই সমস্ত উৎস থেকেই তাঁর রামায়ণে এই রাম ভক্তিবাদের অবতারণা করেছিলেন। তাঁর কাব্যে বর্ণিত দুর্গোৎসব ও কালিকা স্তুতিও শ্রোতাদের ভক্তিভাব চরিতার্থ করার জন্যেই রচিত হয়েছিল।

হাস্যরস ঃ- ভক্তিরসের মতো হাস্যরস সৃষ্টিতেও কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব তর্কাতীত। বাঙালী মনের রুচি ও রসগ্রাহিতার উপযোগী করে তিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। কৃত্তিবাসের কালে বাঙালী সমাজ তেমন রুচিবাগীশ বা শিক্ষাভিমানী ছিল না। তাই স্থূল, গ্রাম্য এবং কিছু পরিমাণে অশ্লীল হাসি উপভোগে তার বাধা ঘটে নি। কৃত্তিবাস তথা রামায়ণ গায়েন বা কথকদের উদ্দেশ্যই ছিল বাঙালী জনমানসের মনোরঞ্জন। তাই কৃত্তিবাস-পরিবেশিত হাস্যরস কখনও রঙ্গব্যঙ্গে শাণিত, কখনও বাক্‌চাতুর্যে উজ্জ্বল, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উদ্ভট কৌতুকে উচ্ছ্বসিত, যা মাঝে মাঝে ভাঁড়ামির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

আদিকাণ্ড থেকেই কৃত্তিবাস হাস্যরসের স্রোতকে মুক্ত করে দিতে চেয়েছেন এবং তার জন্যে মহাতপা মুনির চরিত্রবিকৃতি ঘটাতেও তাঁর দ্বিধা হয়নি। তাড়কা রাক্ষসীকে নিধন করার জন্যে বিশ্বমিত্র রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইকে দশরথের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। এই তাড়কাকে দেখে বিশ্বামিত্রের অতিমাত্রায় আতঙ্কিত হবার বর্ণনা দিয়ে কবি কৌতুকরস উদ্রেক করতে চেয়েছেন।

'উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর।
দূর হৈতে দেখালেন তাড়কার ঘর।।
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া।
অতি ত্রাসে মুনিবর যান পলাইয়া।।'

বিশ্বামিত্র চরিত্রের এমন হীন বিকৃতি বাল্মীকির পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

সীতার বিবাহসভায় হরধনু ভাঙার ব্যাপারেও কৃত্তিবাস কৌতুকরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। হরধনু ভাঙতে এসে রাবণ কিভাবে নাকাল হচ্ছে কৃত্তিবাস তার সরস বিবরণ দিয়েছেন —

'দ্বারেতে দাঁড়ায়ে বীর উঁকি দিয়া চায়।
দেখিয়া দুর্জয় ধনু অন্তরে ডরায়।....
আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে।
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে।।
আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুকখানি টানে।
তুলিতে না পারে আর চায় চারিপানে।।'

এইভাবে বারবার তিনবার রাবণ ধনুক তোলার চেষ্টা করেও পারল না। তখন —

'কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে।।'

শেষপর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়া তার পলায়ন এবং মিথিলায় 'সকল বালক দেয় তারে টিটকারী।।' মন্তব্য

আমরা যাকে পছন্দ করি না তার লাঞ্ছনা আমরা উপভোগ করি। তাই রাবণের দুর্দশায় শ্রোতা খুশী হয়। এখানে কৌতুক বিশুদ্ধ নয়, আমাদের সংস্কার, আমাদের ন্যায়নীতিবোধই এখানে পরিতৃপ্ত হয়েছে। কিষ্কিন্ধ্যা এবং উত্তরাকাণ্ডে বর্ণিত বালীর রাবণকে নাকাল করার বিবরণ অনুরূপভাবেই শ্রোতাদের কাছে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অঙ্গদের রায়বারে দেখি এই প্রসঙ্গ তুলে বালীনন্দন রাবণকে খোঁটা দিতে ছাড়েনি।

অযোধ্যাকাণ্ডে কুঁজীর লাঞ্ছনাও দর্শন-শ্রোতারা চিরকাল পরম প্রসন্নতায় উপভোগ করেছে। মন্থরা না হয়ে অন্য কেউ এমন দুরবস্থায় পড়লে আমাদের সহানুভূতি জাগত নিশ্চয়। ঠিক এই কারণেই অরণ্যকাণ্ডে শূর্পণখার নাক কান কাটার যন্ত্রণায় আমাদের সমবেদনা জাগে না। বিধবা শূর্পনখার এই অনুচিত প্রণয় কবির রঙ্গব্যঙ্গের খোরাক হয় মাত্র। সুন্দরকাণ্ডে লঙ্কাদহনের সময় রাক্ষস বধূরা আত্মরক্ষার তাগিদে জলে ডুবে মুখটা ভাসিয়ে রাখে। তখন হনুমান 'লেজের অগ্নিতে তার পোড়ায় কুন্তল' আর 'অগ্নিতে পোড়ায় মুখ দেকিতে কৌতুক'। শ্রোতাদের এবং হনুমানের কাছে এটা কৌতুকাবহ হলেও রক্ষোরমণীদের কাছে এটা নিশ্চয় কৌতুক ছিল না। তবু তাদের দুঃখে আমরা সমবেদনায় আর্দ্র হই না, বরং প্রতিহিংসার আনন্দ উপভোগ করি।

বিবাহবাসরে রঙ্গরসিকতা বাঙালীর চিরাচরিত প্রথা। বাঙালী সমাজে ঠাট্টা রসিকতার যে বিশিষ্ট ভাষা ও ভঙ্গি আছে তার হুবহু প্রতিফলন দেখি কৃত্তিবাসী রামায়ণে। বিয়ের পরে রামসীতাকে বাসরঘরে বসিয়ে জনকপুরীর অন্তঃপুরিকারা রামের সঙ্গে পরিহাস করতে থাকেন —

'এই কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল।
সীতা বড় সুন্দরী তুমি বড় কাল।।'

রামের মুখে শোনা যায় তার যোগ্য জবাব —

'হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর।
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর।।'

সুন্দরকাণ্ডে দেখি রাবণের অনুচরেরা অশোকবন ভাঙার জন্যে হনুমানকে বেঁধে ফেলল। তাতে হনুমানের ভ্রুক্ষেপ নেই। সে নিজের দেহকে সত্তর যোজনে বড় করে পড়ে থেকে ধুয়ো তুলল — 'রাজ সম্ভাষণে যাব কান্ধে কর আমা'।

দু'লক্ষ রাক্ষস তাকে কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে যেতে হিমহিম খেল। কিন্তু প্রতিদানে হনুমান যা করল তা অবর্ণনীয় —

'মনে মনে হাসে তবে পবনকুমারে।
প্রস্রাব করিয়া দিল কান্ধের উপরে।।'

গ্রাম্য শ্রেতারা স্থূল ও অশ্লীল রসিকতায় আমোদ পেত বেশি। বর্ণনা যত অশ্লীল হাসির প্রচণ্ডতা ততো বেশি, আর কৃত্তিবাসের রচনাও তো এই পল্লীসমাজের বিনোদনের জন্যেই।

রাবণের কাছে পৌঁছে হনুমান পিছন ফিরে বসল। সে তাকে রাজা বলে স্বীকার করতে নারাজ। সেই সঙ্গে রাবণ কোন কোন যুদ্ধে হেরে জব্দ হয়েছে তারও ফিরিস্তি দিতে বসে। তবে রাক্ষস হলেও রাবণের রসবোধ যথেষ্ট। সে রাগ না করে হাসতে থাকে। এদিকে বন্দী হনুমানকে দেখতে এসে রাক্ষসীরা তাকে নিয়ে পরিহাস করতে শুরু করে ---- 'ফুলের মালায় তুমি ভুবন মোহন।' নারীদের মধ্যে হনুর রসিকতা খোলে ভালো। সে সঙ্গে সঙ্গে সরস কথায় জবাব দিয়ে বলে যে রাবণ তাকে জামাই করার জন্য বেঁধে এনেছে, সে কুলীন, রাবণ মৌলিক। সুতরাং এই বিয়ে রাজযোটক। এই বিয়ে হলে সে মন্দোদরীর মত সুন্দরী শাশুড়ী এবং ইন্দ্রজিতের মতো শ্যালক পাবে। সেই সঙ্গে —

'প্রমীলা শালাজ পাব পরম রূপসী।
রসরঙ্গে তার সঙ্গে রব দিবানিশি।।'

বাঙালীর বৈবাহিক রসিকতা বাসরঘর ছেড়ে লঙ্কায় গিয়ে হাজির হয়েছে। আবার বানরের মুখে মানুষের এই বিবাহ প্রথার বর্ণনা আরও কৌতুককর হয়ে উঠেছে। রক্ষোনারীরাও রসিকতায় কম যায় না। তাদের অনুরোধ — 'ঠাকুরজামাই হলে নাচ তো এখন।' হনুমানও উত্তর দিতে ছাড়ে না —

'দণ্ড দুই থাক নারীগণ।
কত নাচ দেখাইব কে করে গণন।'

হনুমান রায়বারে তরল পরিহাস, সরস রঙ্গরস। কিন্তু অঙ্গদ রায়বারে তীক্ষ্ন ব্যঙ্গ বিদ্রুপের উগ্র জ্বালা ফুটে উঠেছে। মহাবীর বালীনন্দনকে ডেকে —

'শ্রীরাম বলেন শুন, হে অঙ্গদ বলী।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়া এস গালি।'

মন্তব্য

রামের এই আদেশ থেকে মহাবীর অঙ্গদের দৈহিক পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া না গেলেও বাগ্‌যুদ্ধে তার পটুত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অঙ্গদের ভয়ে রাবণ ও তার সভাসদেরা শত শত রাবণমূর্তি ধারণ করে অঙ্গদকে ছলনা করতে চাইলে যুবরাজ যে বিদ্রুপাত্মক ভাষায় রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে গালিগালাজ করেছে তা অশালীন হলেও তাতে বাক্‌চাতুর্যের অভাব নেই —

'অঙ্গদ বলে, সত্য করি কওরে ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসিয়াছে, সবাই কি তোর পিতা।।
ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্যরে তোর মাকে।
এক যুবতী শতেক পতি ভাব কেমনে রাখে।।'

রাবণ-অঙ্গদের এই বাগ্‌যুদ্ধ কলহরসিক বাঙালীর কাছে পরম উপাদেয় ছিল। রাবণ অঙ্গদকে তার মা কুলটা বলে গাল দিলে অঙ্গদ তার যোগ্য জবাব দিয়েছি। এই ধরণের সরস উক্তি-প্রত্যুক্তি, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, শ্রোতাদের পরম উপভোগের বস্তু হয়ে উঠত। ভাষা যত কটু ও ঝাঁঝালো শ্রোতাদের আমোদও ততো বেশি। প্রথমে শ্লেষবিদ্রুপের লড়াই, তারপর ক্রোধের সঞ্চার যার পরিণতি গালিগালাজে।

অতিরঞ্জন হাসির একটা বড়ো উপাদান। বিকটাকৃতি কুম্ভকর্ণের আচরণে অসংগত রকমের বাড়াবাড়িতে শ্রোতারা না হেসে পারত না। তার 'নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় পবন' এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ঝড়ে রাক্ষসেরা কখনও উড়ে যায়, কখনও নাকে ঢুকে যায়। আর —

'অঙ্গ ভঙ্গে আলস্যে যখন তুলে হাই।
মুখের গহ্বর যেন বড় গড়খাই।।'

এই কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের উৎকট আয়োজনে এক লক্ষ ঢাক, তিন লক্ষ শাঁখ বাজানো হয়। তবু তার রাজকীয় ঘুম ভাঙার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। শেষপর্যন্ত মদ্যমাংসের গন্ধে সে নিজেই উঠে বসে। এবং ঘুম ভেঙেই তার রাক্ষুসে আহারের বর্ণনা। সাতাশ কলসী মদ্যপানের পর —

'হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে।
বারো তের শত পশু খায় একবারে।।'

তারপর যুদ্ধযাত্রার সময়ে সে আরও খেতে চায়। তার যুদ্ধের ধরনও আলাদা — অস্ত্রের ধার সে ততো ধারে না — শেষপর্যন্ত সুগ্রীব — কর্ণ টানে দুহাতে কামড় ছিঁড়ে নাক'। তখন কুম্ভকর্ণের —

'এত বল বিক্রম সকল হৈল মিছা।
সুগ্রীব বানরা বেটা করে গেল বোঁচা।।'

কুম্ভকর্ণের এই দুর্গতি কৃত্তিবাসের শ্রোতারা নিশ্চয় পরম আনন্দে উপভোগ করত, ঠিক যেমন মন্থরা, শূর্পনখা কিংবা রাবণের দুর্দশায় তারা খুশী হত।

হাস্যরস সৃষ্টির আর একটি সহজ উপায় ঔদারিকতার আতিশয্য। লঙ্কাকাণ্ডের শেষে অযোধ্যায় ফেরার পথে ভরদ্বাজের আশ্রমে বানরেরা চর্বচূষ্যলেহওপেয়ের বিপুল আয়োজন দেখে লোভ সামলাতে না পেরে 'যতো পায় ততো খায় নাহি অবসাদ।' এবং 'নড়িতে চড়িতে নারে পেট পাছে ফাটে।' শেষপর্যন্ত 'ঊর্ধ্ব দৃষ্টে রহে সবে নাহি চায় হেঁটে। কোনরূপ চিত হয়ে শুইলেক খাটে।।' কৃত্তিবাসের কালে বাঙালী জনসাধারণের রসবোধ অনেকটা শিশুর মতো ছিল। তাই আকণ্ঠ ভোজনে কাতর বানরদের অবস্থা তারা শিশুর সারল্যে সানন্দে উপভোগ করত।

লঙ্কাকাণ্ডে আরও অনেক যুদ্ধ বর্ণনা আছে। কিন্তু তা বীর বা করুণরস না জাগিয়ে হাসির খোরাকই জোগায়। কৃত্তিবাসের হাতে বানরদের বীরত্ব ও যুদ্ধরীতি সর্বত্র একটা মজার প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের পলায়ন-তৎপরতা দেখে যেমন হাসি পায়, ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তাদের যুদ্ধক্ষেত্র-বহির্ভূথ ক্রিয়াকাণ্ড দেখে তেমনি কৌতুক জাগে। রামায়ণের শ্রোতারা কোনো গভীর রসাবেগে আলোড়িত হওয়ার চেয়ে হাসি-কৌতুকের টুকরো টুকরো বর্ণনা শুনতেই বেশি আগ্রহ দেখাতেন। তাই রামায়ণ মূলতঃ করুণরসাত্মক হলেও তার আনুষঙ্গিক হিসেবে কৌতুকরস শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছে — এবং বলা বাহুল্য কৃত্তিবাস হাস্যরস পরিবেশনে যোলো আনা সফল হয়েছিলেন।

৮.১৩ ঃ অনুশীলনী

১। মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
২। তুর্কি আক্রমনোত্তর বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিচয় দিন।
৩। রামায়ণ রচয়িতাগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৪। রামায়ণ অনুবাদে কৃত্তিবাসের মূলানুগত্য ও মৌলিকতার পরিচয় দাও। মন্তব্য

৫। কবি কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। ''কৃত্তিবাস সমস্যা বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়'' — আলোচনা করুন।

৭। কৃত্তিবাসী রামায়নের চরিত্র বিচার করুন।

৮। টীকা লিখুন — কৃত্তিবাসী রামায়নে বাঙালীয়ানা।

৯। শ্রীরামপাঁচালীর জনপ্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

১০। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রসবিচার করুন।

১১। বাল্মীকি-র রামায়ণ এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ-এর মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা নির্ণয় করুন।

৮.১৪ ঃ গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ শ্রী সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) ঃ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়) ঃ শ্রী ভূদেব চৌধুরী।

৪। রামায়ন ঃ কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত ঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়।

৫। রামায়নের চরিতাবলী ঃ সুখময় ভট্টাচার্য।

৬। রামায়নী কথা ঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

৭। কৃত্তিবাসী রামায়ন ও বাংলার লোক ঐতিহ্য ঃ তনিমা চক্রবর্তী।

মন্তব্য

একক ঃ ৯ ঃ মহাভারতের অনুবাদ

বিন্যাসক্রম

৯.১ ঃ উদ্দেশ্য।

৯.২ ঃ মহাভারতের অনুবাদ।

৯.৩ ঃ বাংলা মহাভারতের বৈশিষ্ট্য।

৯.৪ ঃ কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও তাঁর কাব্যপরিচয়।

৯.৫ ঃ শ্রীকর নন্দী ও তাঁর কাব্যপরিচয়।

৯.৬ ঃ কবি সঞ্জয় ও তাঁর কাব্যপরিচয়।

৯.৭ ঃ কাশীরাম দাসের 'ভারতপাঁচালী'।

৯.৮ ঃ কবি কাশীরাম দাসের পরিচয়।

৯.৯ ঃ 'ভারতপাঁচালী'-র রচনাকাল।

৯.১০ঃ কাশীরাম দাসের কবিত্বের পরিচয়।

৯.১১ঃ অষ্টাদশ শতকের মহাভারত — অনুবাদক গোষ্ঠী ও শঙ্কর কবিচন্দ্র।

৯.১২ঃ মহাভারতের অন্যান্য অনুবাদকগণ।

৯.১৩ঃ অনুশীলনী।

৯.১৪ঃ গ্রন্থপঞ্জি।

মন্তব্য

৯.১ ঃ উদ্দেশ্য

মহাভারতের ক্ষাত্রধর্ম তথা বীর ধর্মই প্রাধান্য লাভ করায় তা বাঙালির প্রাণে তত সাড়া জাগাতে পারেনি। সমসাময়িক হিন্দু এবং মুসলমান রাজন্যবর্গ মহাভারতের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে এর অনুবাদের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন। ফলতঃ প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতাই কবিদের মহাভারত অনুবাদে আগ্রহী করে তুলেছে। রামায়ণের যুদ্ধ কাহিনী রয়েছে, কিন্তু তা অপেক্ষাকৃত বর্বর যুগের। পক্ষান্তরে মহাভারতের যুদ্ধ যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তেমনি এতে কূটনীতির সঙ্গেও সম্পর্ক যুক্ত রয়েছে। সমসাময়িক রাজন্যবর্গ তাই মহাভারতের যুদ্ধে স্ব-কালের চিত্রই দেখতে পেতেন। অতএব, সাধারণ বাঙালী অপেক্ষাকৃত অনাগ্রহী হলেও রাজপুরুষদের তাগিদে মহাভারতের অনুবাদ শুরু হয় এবং প্রচারও স্বভাবতই কিছুটা বিলম্বিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় এই সমস্ত কারণেই মহাভারতের বিলম্বিত আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পরবর্তীকালে অবশ্য অনুবাদের সংখ্যা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। এই একক এর মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলা মহাভারতের অনুবাদ ও বৈশিষ্ট্য, অনুবাদক কবিদের পরিচয় এবং তাঁদের কাব্য কৃতিত্ব আলোচনা করা, মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কবিদের পরিচয় এবং তাঁদের কাব্য কৃতিত্ব আলোচনা করা, মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাসের 'ভারত পাঁচালী' সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।

৯.২ ঃ মহাভারতের অনুবাদ

তুর্কি আক্রমনোত্তর বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ ও ভাগবত অনুবাদের প্রধান প্রেরণা ছিল 'লৌকিক নিস্তারণ' ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আকাঙ্খা। তাছাড়া বাঙালি জাতিকে শক্তি ও বীর্যের মন্ত্রে জাগিয়ে তোলাও ছিল সেযুগের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু মহাভারতের অনুবাদের জন্য বাঙালিকে চৈতন্যের কাল কিংবা চৈতন্যোত্তর কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। চৈতন্যদেবের প্রবাবে ভক্তি-ব্যাকুল বাঙালির জীবনে দেখা দেয় নতুন যুগচেতনা ও যুগধর্ম। গৌড়িয় বৈষ্ণব ধর্মের রাগানুগা ভক্তির প্রভাবে মহাবারতের বীর্যদীপ্ত পৌরুষ ও ঐশ্চর্যভাব মিশ্রিত ও প্রশমিত হয়ে ভক্তিরসের দিকে ধাবিত হয়। মহাশক্তিশালী সুদর্শন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসসিক্ত কোমল বাঙালির দৃষ্টিতে দ্রৌপদী সখা ও পার্থ-সখায় পরিণত হ'ন।

রামায়ণ ও ভাগবত অনুবাদের এত সময় পরে মহাভারত অনুবাদের কারণ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের অভিমত এইরকম, ''বাংলার পুরাতন সাহিত্য ভারত পাঁচালীর উদ্ভব ও প্রসার প্রধানত রাজদরবারের আওতায়ই হইয়াছিল।" এককথায় মুসলিম শাসকদের কাব্যানুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই মহাভারতের অনুবাদ সম্ভব হতে পেরেছিল। তাছাড়া মহাভারতকে বাঙালির জীবনচর্যা ও ভাবসাধনার অনুগামী করে নেওয়া যখন সম্ভব হয়েছে, সেই অনুকূল মুহূর্তেই মহাভারত অনুবাদের দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে। রচনাকালের বিচারে রামায়ণ, মহাভারতের পূর্বে রচিত। এই ব্যাপারে শ্রীভূদেব চৌধুরীর অভিমত হ'ল, ''ষোড়শ শতকের আগে বাংলা ভাষায় 'মহাভারত' রচনার সূচনা হয়েছিল বলে জানা যায়নি। অথচ, এই কালসীমায় অন্তত একশ বছর আগে থেকেই বাংলা অনুবাদকাব্য হিসেবে 'রামায়ণ' ও 'ভাগবত' জনপ্রিয়তার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল" (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ২য় পর্যায়)। এর কারণস্বরূপ মহাভারত অনুবাদের উদ্ভব ও প্রসারের জন্য রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাভারতের আদি কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস। তার এই বিখ্যাত কাব্যের শ্লোকসংখ্যা ছিল ৮,৮০০। পরবর্তীকালে নানাভাবে সংযোজিত হয়ে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৪,০০০ এবং কাব্যটি একটি বিরাট সংহিতার আকার ধারণ করে। পঞ্চমবেদ হিসেবে পরিচিত এই সুবিসাল গ্রন্থটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত, ''ইহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।" বাস্তবিকই ভারতীয় জাতির অন্তরাত্মা এই মহাকাব্যের স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত পুষ্প স্তবকের মত বিকশিত। এই কাব্যটির মধ্যে সমগ্র জাতির ধর্মমত, আদর্শ, নীতি, সাধনা, সমাজ ও ইতিহাসের নানা তথ্য ও দার্শনিক মনন ঠাঁই করে নিয়েছে। সেই কারণেই বলা হয়, যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।' এই কাব্যটির চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ মন্তব্য করেছেন, ''ভারতের অমৃত আত্মা, জীবনের সময় সত্তা, প্রাণ ও মনের ক্ষুধা ও সুধা সমস্তই মহাভারতের শিলাস্তূপে এখনও যেন মৃত্যুঞ্জয় হয়ে আছে। রাম-রাবণের যুদ্ধনিনাদ সিংহলের সমুদ্রতটে শান্তি লাভ করেছে; কিন্তু কুরুবংশের ভ্রাতৃবিরোধ অনাগতকালের বুকে দুরপনেয় ক্ষতচিহ্ন রূপে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। তাছাড়া

মন্তব্য

মহাকাব্যটির বিষয় বৈচিত্র্য ও রসের বিভিন্নতা এবং নানা শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত আখ্যায়িকা একাধারে বিস্ময় ও কৌতুহল সৃষ্টিকারী। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত হ'ল, বিশেষত ইহার যুদ্ধ বর্ণনা রামায়নের মত কেবল গাছ-পাথর-ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপার নয়, রাক্ষস ও বানরের বীভৎস রসপ্রধান শক্তি আস্ফালনের ক্ষেত্র নয়। ইহার মধ্যে ব্যূহ নির্মাণ, সৈনাপত্য-কৌশল, কূট ষড়যন্ত্র ও মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রাধান্য। ইহাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিবরণ এবং রাজনীতি ও ধর্মনীতির সূক্ষম আলোচনা অনেক স্থান অধিকার করে" (বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ঃ প্রথম খণ্ড, আদি ও মধ্য যুগ)। একদিকে সংস্কৃত ভাষার মত ক্ল্যাসিক গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা, অন্যদিকে বিপুল কলেবর, বিচিত্র চরিত্র, জটিল কাহিনি বিন্যাসের দুরূহতা অনুবাদের ক্ষেত্রে মহাভারতকে রীতিমত একটি সমস্যায় পরিণত করেছিল। তবু বাংলা ভাষায় কাশীরাম দাসের পূর্বে দু-একজন কবি এই অকুল সমুদ্র সন্তরণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কাশীরামের মত কেউই সফল হননি। তাছাড়া এঁরা কেউই কাশীরামের মতো সমগ্র মহাভারতের অনুবাদে মনোযোগী হননি। এবং তাঁর মতো মহতী প্রতিবার অধিকারীও ছিলেন না। তবু আদি অনুবাদক হিসেবে তাঁদের প্রচেষ্টাকে কোনোভাবেই খর্ব করা যাবে না। মহাভারতের প্রাচীন অনুবাদক হিসেবে এ পর্যন্ত চারজন কবির নাম পাওয়া গেছে — (১) কবীন্দ্র পরমেশ্বর, (২) শ্রীকর নন্দী, (৩) সঞ্জয়, (৪) বিজয়পণ্ডিত। এই কবিদের অস্তিত্বের প্রামাণিকতা নিয়ে নানান মতভেদ থাকলেও মোটামুটি প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে উক্ত চারজন কবিরই কাব্য পরিচয় গ্রহণ করব।

৯.৩ ঃ বাংলা মহাভারতের বৈশিষ্ট্য

বাংলার রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক অন্ধকার যুগের অবসানে জাতীয় জীবনে যখন জাগরণ-লক্ষমণসমূহ প্রকট হ'য়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল, তখনই বাঙালী মহৎ আদর্শের অনুসন্ধানে তাকিয়েছিল প্রাচীন সাহিত্যের দিকে। এই প্রয়োজনেই বাংলা বাষায় রামায়ণ মহাভারত মহাকাব্য এবং ভাগবতাদি পুরাণের অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। রামায়ণ-অনুবাদ কালে কবিরা যেমন সমসাময়িক যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুবাদে অনেকখানি স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিলেন, মহাভারত অনুবাদ কালেও তাঁরা একই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। মহাভারত মূলতঃ যুদ্ধপ্রধান কাব্য, যুদ্ধের প্রতি বাঙালীর স্বাভাবিক অনীহা, অতএব বাঙালী মহাভারতকে আপন স্বভাবধর্মের অনুকূল করে নিয়েছিল এবং ভক্তিধর্মের স্রোতে তাকে চালিত করেছিল। ভক্তিবাদের দেশ বাংলায় বীররস অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভক্তিরসে পরিণত হয়েছে। বেদব্যাস সেখানে বিস্তৃতভাবে যুদ্ধোদ্যোগ এবং তার ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন, বাঙালী কবি সেখানে তাকে সংক্ষিপ্ত আকারে নিয়ে এসেছেন। আবার কৃষ্ণপ্রসঙ্গ পেলেই বাঙালী কবি উচ্ছ্বসিত। যখনই বাঙালী কবি সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচার করেছেন, সুযোগ না পেলে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন।

লক্ষ শ্লোকাত্মক ব্যাস-মহাভারতকে কোন কবিই আক্ষরিকভাবে অনুবাদের চেষ্টা করেন নি। বাংলায় যুগধর্ম ও বাঙালীর স্বভাবধর্ম অনুসরণে বাঙালী কবি গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে ব্যাস-মহাভারতকে বাংলা মহাভারতে পরিণত করেছেন। যুদ্ধ ও তথ্যপ্রধান 'রাজধর্মানুশাসন পর্ব, আপদ্ধর্ম পর্ব এবং অনুশাসন পর্ব, বাংলা মহাভারতে বর্জিত হয়েছে। বহু কাহিনী উপকাহিনীযুক্ত মহাভারতের অনেক কাহিনীই বাংলা মহাভারতে বর্জিত হয়েছে। আবার নতুন কাহিনীও অনেক যুক্ত হয়েছে। রুরু-প্রমদ্বরা প্রেম, বিদুলার তেজস্বিতা, উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তযজ্ঞ-আঁদি কাহিনীর বর্জন ঘটিয়ে নতুন যোগ করা হয়েছে — অকাল আম্র-বিবরণ, শ্রীবৎস-চিন্তা উপাখ্যান, জনা-প্রবীর কাহিনী, ভানুমতীর স্বয়ম্বর, লক্ষণার স্বয়ম্বর প্রভৃতি। অনুমান করা হয়, অধুনা লুপ্ত জৈমিনি-সংহিতা থেকে এই সমস্ত কাহিনী আহরণ করা হয়েছে। বাংলা মহাভারতে 'গীতা'র বৃহত্তম অংশ এবং 'অনুগীতা'র সমগ্র অংশই বাদ পড়েছে।

বাংলা মহাভারতে এছাড়াও বহু মহাভারতীয় কাহিনীর বিকৃতি সাধন করে দেশকালোপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। ব্যাসোক্ত বিভিন্ন দেশ-নামের পরিবর্তে বহু নতুন দেশের নাম যুক্ত হয়েছে, বহু নতুন রাজার নামও এখানে পাওয়া যায়। বাংলা মহাভারতের পর্ব সংখ্যা অষ্টাদশ, কিন্তু নাম ও বিন্যাসের দিক থেকে মূলের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে। এই সমস্ত কারণে বাংলা মহাভারতকে মূল মহাভারতের অনুবাদরূপে গ্রহণ করা যায় না, বস্তুতঃ এতে মৌলিক কাব্যের স্বাদই বর্তমান।

৯.৪ ঃ কবীন্দ্র পরমেশ্বর

''বাংলা ভাষায় 'মহাভারত' কাব্যের প্রথম অনুবাদক কবির পরিচিতি বিষয়ে পণ্ডিত মহলে

নানারকমের মতভেদ রয়েছে। প্রাচীনতম যে কবির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেছে, তিনি 'পরাগলী মহাভারত'-এর লেখক কবীন্দ্র পরমেশ্বর'' (শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)। ষোড়শ শতকে হুসেন শাহের আমলে মহাভারতের অনুবাদ শুরু হয়। পরাগল খাঁ নামে হুসেনের এক লস্কর, চট্টগ্রাম অধিকার করে হুসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পুরস্কার স্বরূপ সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সুলতান হুসেনের মতো পরাগল খাঁও ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, কাব্যানুরাগী এবং হিন্দু সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত। ''মহাভারত''-এর কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী শুনে পরাগল মুগ্ধ হন, এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসকে 'দিনেকে' শুনে শেষ করতে পারার মতো একখানি 'মহাভারত' রচনা করার নির্দেশ দান করেন (শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১ম পর্যায়)। এই লস্কর পরাগল খাঁরই অনুরোধে পরমেশ্বর মহাভারতের মূল কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করে ''কবীন্দ্র'' উপাধি লাভ করেন। কারো কারো মতে অবশ্য কবির আসল নাম শ্রীকর নন্দী; 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' পরাগলের দেওয়া খেতাব। কিন্তু শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর যে একই কবি, এমন কোন উপযুক্ত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। 'কবীন্দ্র ও শ্রীকর এক কবি হলে অশ্বমেধ পর্বের দুটি পালা (একটি কবীন্দ্রের, অপরটি শ্রীকরের) মিলত না, কিন্তু দুজনেরই অশ্বমেধ পর্বের দুটি পৃথক পুঁথি পাওয়া গেছে'' (ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)।

মন্তব্য

কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারত কাব্যটির নাম দেন 'পাণ্ডববিজয়'। অন্যদিকে লস্কর পরাগল খাঁর আদেশে কাব্যটি রচিত বলে কবীন্দ্রের রচিত মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামেও পরিচিত। পরমেশ্বরের 'পাণ্ডব বিজয়' কাব্যটির রচনাকাল আনুমালিন ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়। এই কাল নির্ণয়ের পেছনে একটি কারণ হল কবি পরমেশ্বর কাব্য মধ্যে সাহিত্যানুরাগী হুসেন শাহ এবং লস্কর পরাগল খাঁর অসাধারণ সুখ্যাতি করেছেন। তাই মনে হচ্ছে হুসেন শাহের সিংহাসন প্রাপ্তি (১৪৯৩) থেকে তাঁর রাজত্বের সমাপ্তিকাল। (১৫১৮ খ্রীঃ)-এই সময়সীমার মধ্যে পরাগল খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশেই ''পাণ্ডব বিজয়'' কাব্যটি রচিত হয়।

কাব্য পরিচয় ঃ- পৃষ্ঠপোষক লস্কর পরাগল খাঁর ইচ্ছানুযায়ী কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের অনুবাদ করেন অতি সংক্ষিপ্তাকারে। সেই কারণে এটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। যদিও ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত হল, ''পরমেশ্বরের কাব্য বড় রচনা, একদিনে শুনিবার মতো নয়'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড)। তবু অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হলেও মহাভারতের কোন ঘটনাই কবি এড়িয়ে যাননি। কেবল সংক্ষেপে সারতে গিয়ে কবি কবিত্ব বিকাশের সুযোগ লাভ করতে পারেননি। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে গ্রন্থটি রচিত এবং কবি কর্তৃক কেবল কাব্যধারাই অনুসৃত। কোন কোন স্থানে কবি অবশ্য মূলানুসৃতি দেখিয়েছেন। পরমেশ্বরের কাব্য পরিচয় সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত হল, ''কবীন্দ্রের রচনার প্রধান গুণ স্বচ্ছতা, স্বতঃ প্রবাহমানতা। বস্তুত তাঁর পরিচ্ছন্ন, সহজ অনলঙ্কৃত বর্ণনা অভুতপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত না হলেও মোটামুটি সুখপাঠ্য। কবীন্দ্রের রচনার বড়ো গুণ সারল্য'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। কাব্যটির কাব্যরস অসাধারণ কিছু না হলেও একেবারে উপেক্ষা করার মতো বস্তুও নয়। যেমন —

'দ্রৌপদী বোলেন্ত সৈরন্ধ্রী মোর নাম।
দ্রৌপদীর পরিচর্যা কৈলু অনুপাম।
দুই উরু গুরু তোর অতি সুললিত।
নাভী গভীর তোমার বাক্য সুললিত।।
দশন দাড়িম্ব বিজলী নয়ন।
রাজার মহিষী যেন সর্ব সুলক্ষণ।।'

এছাড়া কোন কোন জায়গায় বেশ নাটকীয়তা সঞ্চারিত হয়েছে। আদি মহাভারত রচনাকার হিসেবে পরমেশ্বর মোটামুটি সফল হয়েছিলেন। ''তিনি কিছু কিছু সংস্কৃত জানতেন। পয়ার ত্রিপদীগুলিও অনেকটা মসৃণ হয়েছে। দু-চারটি স্থানীয় (অর্থাৎ চট্টগ্রাম) উপভাষ্য বাদ দিলে দেখা যাবে, তাঁর বাক্যগঠন সাধুভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। .... আর একটা কথা, এটি মুসলমান শাসনকর্তার জন্য রচিত হয়েছিল, কিন্তু এতে বিশেষ কোনো ইসলামি শব্দ নেই'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)।

৯.৫ শ্রীকর নন্দী ও তাঁর কাব্যপরিচয়

''কেউ কেউ বলেন যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী একই কবি। আসলে নাকি কবির নাম

মন্তব্য

শ্রীকর নন্দী, উপাধি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। এ অনুমানের কারণ, কবীন্দ্রের কোনো কোনো পুঁথিতে শ্রীকর নন্দীর ভণিতাও আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকখানি কবীন্দ্রের পুঁথিতে শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্রের ভণিতা একসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে" (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। কিন্তু নানারকম তথ্য প্রমাণাদি ও বিচারের উপর নির্ভর করে বলা যায়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী দুজনেই পৃথক কবি। কেননা শ্রীকর নন্দীর ভণিতায় কেবল অশ্বমেধপর্ব (জৈমিনি) পাওয়া যায়; অন্যদিকে কবীন্দ্রের ভণিতায় সমগ্র ব্যাস মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পাওয়া গেছে। যাইহোক লস্কর পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসরৎ খাঁ ওরফে ছুটি খাঁ বা ছোট খাঁ শাসনকার্য পরিচালনায় দক্ষতার পাশাপাশি পিতার মতো বিদ্যোৎসাহী মনোভাবের পরিচয় রেখেছেন। তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যে অপর একটি মহাভারতের অনুবাদ গ্রন্থ পাওয়া যায়। তবে পিতার মত সমগ্র মহাভারতের প্রতি আসক্তি ও আকর্ষণ বোধ করেননি। শ্রীভূদেব চৌধুরীর অভিমত, ''পরমেশ্বরের কাব্যের বস্তু সংক্ষেপ ছুটি খাঁর তৃপ্তি সাধন করতে পারেনি। তাই তিনি আরো বিস্তৃত করে কাব্য রচনা করবার জন্য শ্রীকর নন্দীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে 'জৈমিনি মহাভারত' এর ওপরে নির্ভর করেই শ্রীকর কেবলমাত্র 'অশ্বমেধ পর্ব' নিয়ে বিস্তৃত কাব্য রচনা করেন" (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)। আসলে সংস্কৃতে রচিত জৈমিনি মহাভারতের কেবল অশ্বমেধ পর্বই মেলে। তাছাড়া ব্যাস মহাভারতের চেয়ে জৈমিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বর্ণনা অনেক দীর্ঘ, অনেক বিস্তৃত। কাব্য রচনার উপলক্ষ্য সম্বন্ধে শ্রীকর নন্দীর মন্তব্য —

'শুনিব ভারত-গাথা অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনির পুরাণ-সংহিতা।।
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়।।'
কিংবা — 'শ্রীকর নন্দী যে পয়ার রচিল।
জৈমিনি কহিলেক যে হেন দেখিল।।'

ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর বা শ্রীকরণ নন্দী কর্তৃক মহাভারত রচিত বলে, এই মহাভারত ''ছুটি খানী মহাভারত" নামেও প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। কাব্যটির রচনাকাল মোটামুটি ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ হুসেন শাহের রাজত্বকালের অবসানের পূর্বেই।

কবিত্ব পরিচয় ঃ- একটি মাত্র পর্ব অনুবাদ করলেও কিংবা বলা যায় একটিমাত্র পর্ব অনুবাদ করার কারণে শ্রীকর নন্দী কবিত্বশক্তি প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা লাভ করেছেন। ''শ্রীকর নন্দী জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন, আক্ষরিক অনুবাদ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, মূল ঘটনাকে শাসকের বোধগম্য ভাষায় বর্ণনা করে তিনি নিজ পৃষ্ঠপোষকের অনুগ্রহ অর্জন করতে চেয়েছিলেন। কাজেই হুবহু অনুবাদের দিকে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, কিন্তু তাই বলে তিনি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মতো মূল বর্ণনাকে অতিশয় ক্ষীণকায় করেও তোলেননি" (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। অন্যদিকে জৈমিনি মহাভারতের নানা জায়গায় সূক্ষ্ম হাস্যরসের উপস্থিতি থাকায়, শ্রীকর নন্দীর রচনায় ব্যাস-মহাবারতের ব্যঙ্গ বিদ্রুপের পরিবর্তে লঘু হাস্যরসের স্পর্শ ঘটেছে। যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের সঙ্গে ভীমের যাওয়া নিশ্চিত হলে, কৃষ্ণ ভীমের প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি করে বলেন ভীম স্থূলোদর, বহুভক্ষক, রাক্ষসীর পতি। ব্যঙ্গের এই দংশন সহ্য না করে ভীমও ব্যঙ্গের সুরে তার উত্তর দিয়েছেন —

'কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল।
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল।।
তোমার উদরে কৃষ্ণ বৈসে ত্রিভূবন।
আম্মার উদরে কত ওদন ব্যাঞ্জন।।'
'সংসার উপাড়িয়া সৃষ্টি খাইয়া তুমি।
তোমা হোন্তে বহু ভক্ষ হইলু কি আম্মি।।
ভাল্লুকুমারী তোম্মার স্মরে জম্বাবত
তা হতে অধিক নিকি হিড়িম্বা যুবতী।।'
'তুমি নারীজিত নহে আম্মি নারীজিত।
আপন না চাহি মোকে বোল বিপরীত।।'

এছাড়া, ''জৈমিনি ভারতে ভীম ও কৃষ্ণের আহার ও রঙ্গরসের যে বর্ণনা আছে, সংস্কৃত সাহিত্যে তা একপ্রকার দুর্লভ বললেই চলে। শ্রীকর নন্দী এই অংশে সংক্ষেপে যা বলেছেন তাও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত অনুবাদ সাহিত্যে, খুবই বিরল ব্যাপার" (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। কবির পয়ার ছন্দে প্রায় ত্রুটিহীন শব্দ প্রয়োগ এককথায়

অসাধারণ। এই রীতিতে কবি সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করলে বাঙালি কাশীরামের আগেই সম্পূর্ণ ও কবিত্বপরিপূর্ণ মহাভারতের আস্বাদ লাভ করার অধিকারী হত। মন্তব্য

৯.৬ ঃ কবি সঞ্জয় ও তাঁর কাব্যপরিচয়

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ''একসময়ে বাংলা সাহিত্যে সঞ্জয়-সমস্যা শিরঃপীড়া সৃষ্টি করেছিল। যথার্থত সঞ্জয় ক'জন, এই সঞ্জয় কি অনুদিত মহাভারতের প্রথম কবি, সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের ভাষার মধ্যে এত সাদৃশ্য কেন, তা নিয়ে এক সময়ে সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকায় বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। তবে কিছুকাল পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'কবি সঞ্জয় বিরচিত মহাভারত (১৯৬৯) প্রকাশের পর সঞ্জয় সমস্যায় যবনিকা পড়া উচিত'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। যদিও ড. সুকুমার সেনের মতো সাহিত্যের ইতিহাসকার সঞ্জয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং এই নামের কোন কবি মহাভারত রচনা করেননি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এছাড়া অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু, ড. দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ এ সম্পর্কে নানামত প্রদান করলেও সঞ্জয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত কোনোটিই সংশয়ের ঊর্দ্ধে নয়। কবি সঞ্জয়ের অস্তিত্বজ্ঞাপক কালও পুরোপুরি অজানা। কবির ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে শ্রীভূদেব চৌধুরী অভিমত প্রকাশ করেছেন, ''ড. দীনেশচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন শ্রীহট্ট থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সঞ্জয়ের কাব্য-পুঁথি। কবি ঐ অঞ্চলের অধিবাসীও ছিলেন বলে মনে হয়; বানান রীতি শ্রীহট্টীয় উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য কোথাও কোথাও ধরে রেখেছে। .... 'মহাভারত'-এর সম্পাদক এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য উপস্থিত করতে পারেননি। তবে, কবি যে ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তার উল্লেখ কাব্য মধ্যেই রয়েছে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)।

লোক বোঝানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত্তিবাস ও মালাধর বসু যেমন অনুবাদে মনোযোগী হয়েছিলেন; সেই একই উদ্দেশ্যে কবি সঞ্জয় মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন। কবির নিজের উক্তিতেই তার প্রতিফলন মেলে —

'অনন্ত অপূর্ব কথা পুণ্য ভারযত্র
লোক বুঝাইতে পদ কহিল সঞ্জয়ত্র।।'

এই বিষয়টি নিয়ে কোনো বিতর্ক না থাকলেও, সঞ্জয় মহাভারতের সম্পাদক যে কবিকে বাংলা ভাষায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদক কবি বলতে চেয়েছেন, এটা কোনোভাবেই মানা যায় না। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্যমত উপস্থিত করেছেন, ''কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীর ভাষা থেকে সঞ্জয়ের ভাষা কোনো মতেই প্রাচীন নয়। ভাষাভঙ্গিমা, বিশেষত শব্দ ভাণ্ডার ও ব্যাকরণ দেখে আমার মনে হয়েছে, সঞ্জয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নন।..... তাঁর রচনাভঙ্গিমা বেশ সহজ সরল, এ-ও পুরাতন লক্ষণ নয়। কবি কিছু কিছু উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন, যা প্রশংসনীয়'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। যাইহোক সঞ্জয়ের কবিত্বপ্রতিভা খুব উঁচুদরের না হলেও একটি বিষয়ে তিনি গৌরব দাবী করবেন এবং সেই বিষয়টি হল, লোকসাধারণের উপযোগী করে সংস্কৃত 'মহাভারতে'র অনুবাদ কর্মের পথিকৃৎ কবি সঞ্জয়, এছাড়া, ''ষোড়শ শতাব্দীতে রামচন্দ্র খান ও দ্বিজ রঘুনাথের অশ্বমেধ পর্বের কিছু কিছু পুঁথি পাওয়া যাচ্ছে — এঁরা জৈমিনি ভারতকেই অবলম্বন করেছিলেন'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)।

ষোড়শ শতাব্দী ও সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'মহাভারত' অনুবাদকের নাম তালিকায় যে সব কবির নাম উল্লিখিত তাঁদের মধ্যে সমগ্র 'মহাভারত' কিংবা বিপুল মহাকাব্য অনুবাদের প্রতিভা প্রায় কারোরই ছিল না। কাশীরামের মতো না হলেও, জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে নিত্যানন্দ ঘোষ নামের এক মহাভারত অনুবাদক কবি সেকালে বেশ প্রচার লাভ করেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার জটাজাল মুক্ত করে যিনি বাঙালির জীবনপ্রবাহের সঙ্গে ভারতরসের স্রোতকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন — তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর 'মহাভারত' অনুবাদক কবি কাশীরাম দাস।

কাশীরাম দাসের কবিপ্রশস্তি করে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — ''কৃত্তিবাসের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হইয়া এই কায়স্থ কবি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েরও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। .... বস্তুত বাঙালির সমস্ত জাতি-মানস, ব্যক্তি জীবন, সামাজিক আদর্শ ও নীতি কর্তব্যকে এই দুইজন কবি যেভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ব্যাস বাল্মীকির মতো আর্য কবি বলিতে ইচ্ছা করে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)। কাশীরাম দাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি মধুসূদন উচ্চারণ করেছেন —

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।।'

মন্তব্য

অন্যদিকে শ্রীচৌধুরী অভিমত প্রকাশ করেছেন, ''সপ্তদশ শতকের কবি সমাজে প্রথমেই সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় নাম কাশীরাম দাসের। এই মহাকবির সাধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েই রাজসভার কাব্য 'মহাভারত' সাধারণ বাঙালির জীবন-বেদীতে চিরন্তন প্রতিষ্ঠার অধিকার অর্জন করেছিল" (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)। প্রাচীন মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের মতো কাশীরাম দাসকে নিয়েও কম বিতর্ক তৈরী হয়নি। যেমন — বিপুল মহাভারত মহাকাব্যের সবটা কাশীরামের নিজের রচনা নয়, পুত্র জামাতা ভ্রাতুষ্পুত্র কিংবা অন্য কবিদের রচনাও কাশীরামের নামে প্রচলিত, ইত্যাদি। তবে এই বিতর্ক জটিলতার বাইরে একটি কথাই বলতে ইচ্ছে করে, ''কাশীরাম দাসের নামের এমন মহিমা যে, অনেক ছোট-বড়ো কবির রচনা তাঁহার কাব্যে আত্মদান করিয়া ধন্য হইয়াছে।.... তাঁহার ভারত-পাঁচালীতে যতই ভেজাল চলিয়া যাক না কেন, তবু তাহার গৌরব ও মহিমার খর্বতা ঘটে নাই" (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)।

৯.৭ ঃ কাশীরাম দাসের 'ভারত পাঁচালী'

কাশীরাম দাসের কবিপ্রশস্তি করে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ---- ''কৃত্তিবাসের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হইয়া এই কায়স্থ কবি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েরও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। .... বস্তুত বাঙালির সমস্ত জাতি-মানস, ব্যক্তি জীবন, সামাজিক আদর্শ ও নীতি কর্তব্যকে এই দুইজন কবি যেভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ব্যাস বাল্মীকির মতো আর্য কবি বলিতে ইচ্ছা করে" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)। কাশীরাম দাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি মধুসূদন উচ্চারণ করেছেন —

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।।'

অন্যদিকে শ্রীচৌধুরী অভিমত প্রকাশ করেছেন, ''সপ্তদশ শতকের কবি সমাজে প্রথমেই সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় নাম কাশীরাম দাসের। এই মহাকবির সাধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েই রাজসভার কাব্য 'মহাভারত' সাধারণ বাঙালির জীবন-বেদীতে চিরন্তন প্রতিষ্ঠার অধিকার অর্জন করেছিল" (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)। প্রাচীন মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের মতো কাশীরাম দাসকে নিয়েও কম বিতর্ক তৈরী হয়নি। যেমন — বিপুল মহাভারত মহাকাব্যের সবটা কাশীরামের নিজের রচনা নয়, পুত্র জামাতা ভ্রাতুষ্পুত্র কিংবা অন্য কবিদের রচনাও কাশীরামের নামে প্রচলিত ইত্যাদি। তবে এই বিতর্ক জটিলতার বাইরে একটি কথাই বলতে ইচ্ছে করে, ''কাশীরাম দাসের নামের এমন মহিমা যে, অনেক ছোট-বড়ো কবির রচনা তাঁহার কাব্যে আত্মদান করিয়া ধন্য হইয়াছে। .... তাঁহার ভারত-পাঁচালীতে যতই ভেজাল চলিয়া যাক না কেন, তবু তাহার গৌরব ও মহিমার খর্বতা ঘটে নাই" (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)।

৯.৮ ঃ কবি কাশীরাম দাসের পরিচয়

কাশীরাম তাঁর 'মহাভারত' কাব্যের দুই একটি জায়গায় নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। একটি পুঁথির আত্মপরিচয় এইরকম —

'ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম।।
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।।
পাঁচালি প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ।।'

কাশীরাম দাসেরা তিন ভাই — কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর দাস। কৃষ্ণদাস ও গদাধর দাসের নামেও কাব্য পাওয়া গেছে। যাইহোক, ইন্দ্রানী ও ইন্দ্রাবণী পরগণার 'সিঙ্গি', মতান্তরে 'সিদ্ধি' গ্রামে কায়স্থ বংশে কাশীরামের জন্ম হয়। কাশীরামের কৌলিক পদবী 'দেব'; কিন্তু কবিরা তিন ভাইই নিজ নিজ কাব্যে বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুসরণে 'দাস' ব্যবহার করেছেন। কোন এক হরিহরপুরের অভিরাম মুখুটির আশীর্বাদ ও নির্দেশে কাশীরাম তাঁর গ্রন্থ ''ভারত পাঁচালী" রচনায় উদ্যোগী হন —

'হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম-নন্দন মুখটি অভিরাম।।
কাশীরাম বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্তে রহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে।।'

কাশীরামের নামে প্রচলিত কাব্যের কতটুকু কবির নিজস্ব, কতটুকুই বা অপরের রচনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় বর্তমান। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেন, ''কাশীদাস যে গোটা মহাভারত অনুবাদ করেন নাই, এরূপ বহু প্রমাণ পুঁথির মধ্যেই আছে। এই পুঁথির উল্লেখ হইতে মনে হয়, তিনি বোধহয় তিন বা চার পর্ব রচনার পর লোকান্তরিত হন, এবং বাকি অংশ তাঁহার জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র মিলিয়া সম্পূর্ণ করেন'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)। এই রকম দুই একটি পুঁথির বর্ণনা —

(১) 'ধন্য ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারতের করিল প্রকাশ।।'

(২) 'ধন্য ধন্য কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
চারিপর্ব্ব ভারতের করিল প্রকাশ।।
আদিসভা বন বিরাট রচিয়া পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য বলি।।'

সর্বোপরি ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত মহাভারতের উপসংহারে লিখিত আছে —

'আদি সবা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।।'

কোন কোন কাব্যে এর বিপরীত ধারণা প্রতিষ্ঠিত। যেমন — 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে —

'অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ।।'

''কিন্তু কাশীরামের ভণিতায় যাহা রচিত হইয়াছে তাহার সবটা তাঁহার রচিত নহে, তাহার নানা প্রমাণ আছে। এ পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মহাভারতের আদি-সভা-বন-বিরাট পর্বগুলি কাশীরামের নিজস্ব রচনা হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও অপর কবিরা অন্য পর্বগুলি সম্পূর্ণতা সাধন করেন।'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)। কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামের বর্ণনায় এর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে —

'কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা।
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা।।
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিহঁ খুল্লতাত।
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ।।
আত্মত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক।
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক।।'

'কাশীদাস মহাশয় আশীর্বাদ দিল।
তাহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল।।'

এই ব্যাপারে শ্রী ভূদেব চৌধুরীর অভিমত হল, ''স্পষ্টই বোঝা গেল, 'যম-দায়' হেতু কাশীরামের 'মহাবারত' কাব্য সমাপ্ত হতে পারেনি। নন্দরাম এই অসমাপ্ত কাব্যের কতটুকু অংশ লিখে সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন, সে সম্পর্কেও সংশয় আছে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)।

৯.৯ ঃ 'ভারত পাঁচালী'-র রচনাকাল

ড. সুকুমার সেন কাশীরাম দাসের 'মহাভারতে'র রচনাকাল প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''কাশীরামের কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে যেটুকু তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা খুব নির্ভরযোগ্য না হইলেও আপাতত নেওয়া চলে। ১২২৬ সালে (১৮১৯ অব্দে) লেখা একটি বিরাট পর্বের পুঁথির শেষে রচনা সমাপ্তিকাল দেওয়া আছে — ''চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু'' অর্থাৎ ১৫২৬ শকাব্দ (১৬০৪-১৬০৫ অব্দ)'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ দ্বিতীয় খণ্ড) রচনাকাল সূচক ঐ শ্লোকটি হল —

'চন্দ্রবাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হৈল সাঙ্গ কাশীদাস কয়।।'

মন্তব্য

অঙ্কের দক্ষিণগতি বিচারে কাশীদাসের কাব্য অন্ততঃ ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের কিংবা তার কিছুটা আগে রচিত হয়ে থাকবে। অন্যদিকে বিষ্ণুপুরের রাজা রাধাদামোদর সিংহের কালে লেখা আদি পর্বের একটি পুঁথিতে আর একজাতীয় রচনাকালের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে —

'শকাঙ্ক বিধুমুখ রহিলা তিন গুণে।
রক্মিনীনন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে।।'

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই অঙ্ক বিচার করে রচনাকাল পেয়েছেন, ১৫২৪-২৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং কাশীরাম দাস রচিত মহাভারত (চারপর্ব) মোটামুটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর আগে রচিত হয়ে থাকবে। কিন্তু নানা সময়ের বেশ কিছু পুঁথির পরিচয় ইত্যাদি বিভিন্নরকমের সংশয়ে কাশীদাসী মহাভারতের রচনাকাল সংশয়াচ্ছন্ন। তা সত্ত্বেও ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, ''যাহা হউক দ্বিমতের অবকাশ রাখিয়া একথা বলা চলিতে পারে যে, কাশীরাম দাস (দেব) ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার মহাভারতের চারিপর্ব ও বোধহয় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, অন্ততঃ ১৬৪২ খ্রীঃ অব্দের পর্বে (এই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ গদাধর 'জগৎমঙ্গল' রচিত হয়) রচিত হইয়া থাকিবে" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)।

৯.১০ ঃ কাশীরাম দাসের কবিত্বের পরিচয়

কাশীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদকাব্য 'ভারত পাঁচালী'র সূচনায় বেদব্যাসের বন্দনা করে তাঁর রচনা কাজে মনোযোগী হন —

'শ্লোকছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ।।'

অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত ব্যাস মহাভারত যাতে সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় এবং তার রসগ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে যে কাশীরাম সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ নিজের বক্তব্যে —

'সর্বশাস্ত্র মধ্যে যার প্রধান গণন।
দেবগণ মধ্যে যথা দেব নারায়ণ।।'
'নদনদীগণ যেন প্রবেশে সাগর।
সকল পুরাণ কথা ভারত ভিতর।।
অনেক কঠোর তবে ব্যাস মহামুনি।
রচিত বিচিত্র গ্রন্থ ভারত কাহিনি।।
শ্লোকচ্ছন্দে সংস্কৃত বিরচিলা ব্যাসে।
গীতিচ্ছন্দে কহি তাহা শুন অনায়াসে।।'

কাশীরামকৃত এই স্বীকারোক্তির পরে তাই কিছুতেই বলা যাবে না যে — কাশীরাম সংস্কৃত জানতেন না, কথক ঠাকুরদের কাছ থেকে মহাভারত শুনে কাব্য রচনা করেছেন। আসল ঘটনা হল সংস্কৃত ভাষায় যথারীতি পাণ্ডিত্য ছিল কাশীরামের। উচ্চস্তরের পাণ্ডিত্য না থাকলে কোনভাবেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত ব্যাস মহাভারতের মত ঐরকম একটি কঠিন বিষয়কে কাহিনী ও ভাবানুসারী সঙ্গতিতে ভাবানুবাদের মর্যাদা দান করা সম্ভব হোত না। মেদিনীপুরের আওয়াসগড়ের জমিদারবাড়ীতে আশ্রয়কালে পণ্ডিত ও কথকঠাকুরদের কাছ থেকে মহাভারতের গল্প শুনে কাশীরামের মহাভারত অনুবাদের যে জনশ্রুতি তা যথার্থ নয়। একটি বর্ণনায় মেলে —

'শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার।।'

এখানে 'শ্রুতমাত্র'-এর অর্থ শুনে শুনে নয়; এর প্রকৃত অর্থ হল ''আমি এমন কবিত্বশক্তি সম্পন্ন যে, যাহা শুনি তাহা অনায়াসে পয়ারাদি ছন্দে প্রকাশ করিতে পারি" (মণীন্দ্রমোহন বসু — বাংলা সাহিত্য, ২য়)।

'ভারত পাঁচালী' পাঠ করলেই ধরা পড়ে, কাশীদাসী মহাভারতের চারপর্ব জুড়ে ভাষা ও বাক্য গঠনে সংস্কৃতানুগামীতা, তৎসম শব্দের গাম্ভীর্য ও অলঙ্কারধর্মের ক্লাসিকতায় এক পণ্ডিত কবির কবি প্রতিভাই সুচিহ্নিত হয়। কৃত্তিবাসের মতো কাশীরামও মূলের যথাযথ অনুবাদ করেননি, ভাবানুবাদেই মনোযোগী হয়েছেন। তবে কাব্যের কোন কোন জায়গায় আক্ষরিক অনুবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর্য মহাভারত —

'অর্থানামর্জনে দুঃখং বর্ধনে রক্ষণে তথা।

তেষাং হি বৈরিণো জ্ঞাতি বহ্নি তস্করপার্থিবাঃ।।'

কাশীরাম এর অনুবাদ করেছেন —

'উপার্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ ক্ষয়েতে দ্বিগুণে।।
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরি রাজা-অগ্নি-চোর বন্ধুজন।।'

'ভারত পাঁচালী'-র চারপর্ব জুড়ে এই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। এই বিষয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত হল, ''কবি মূল সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনীকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন অবশ্য প্রথম চারিপর্ব, যাহা তাঁহার রচনা বলিয়া ইদানিং গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী অন্যান্য পর্বে ক্রমেই সেই ক্লাসিক সংযম, ভাবগম্ভীর রচনারীতি ও মূলের নিপুণ অনুসরণ হ্রাস পাইয়াছে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)।

কাশীরাম কৃত ব্যাস মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেও বলা যায়, কাশীরাম পণ্ডিত শ্রেণীর জন্য কাব্য পরিকল্পনা করেননি। সাধারণ মানুষের রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করার জন্য তত্ত্বদর্শন ও নীতিকথা জাতীয় বিষয়গুলিকে পরিহার করে প্রয়োজনীয় অংশের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। ''কবি যদিও সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, কোনও কোনও স্থলে মৌলিক গল্প গ্রথিত করিয়াছেন (যেমন শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনি), তবু মূল মহাভারতীয় কাহিনির রস ইহাতে প্রায় কোথাও খর্ব হয় নাই। কৃত্তিবাসের রচনায় যেমন একটা সরল পাঁচালীর লক্ষণ আছে, কাশীরামের রচনা সেইরূপ পাঁচালীজাতীয় হইলেও, তাহার ভাষাভঙ্গিমায় ক্লাসিক তৎসম শব্দাঢ্য গ্রন্থনৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয়'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)। অর্জুনের রূপবর্ণনায় কবি কাশীরামের কবিত্ব —

'অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিযাছে শোভা।।
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল।।'

কিংবা দুর্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণার রূপ বর্ণনা —

'অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুন্তল কমল-প্রিয়বন্ধু।।
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর-রঙ্গিমা।
ভ্রূভঙ্গ অঙ্গন চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা।।'

কৃত্তিবাসের পাঁচালীর সারল্য হয়তো কাশীরামের এই বর্ণনায় মেলে না, হয়তো তৎসম শব্দসমৃদ্ধ ভাষার অপেক্ষাকৃত কাঠিন্য ও অল্পবিস্তর কৃত্রিমতায় বাঙালি হৃদয় সেভাবে জেগে ওঠেনি, তবু ও কথা জোর করে বলা যায়, বাঙালি হৃদয়ে ও সমাজে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম উভয় কবির প্রভাব প্রায় সমতুল। কাশীরামের এই তৎসম শব্দ বাহুল্য ও ধ্বনিঝঙ্কারের জন্য যুগধর্মই অনেকটা দায়ী। অর্থাৎ কাশীরামের ভাষা কৃত্তিবাসের মতো সরল না হলেও বর্ণনা কুশলতায় কাব্যের গতি পুরোপুরি রক্ষিত। বলা যায়, কাশীদাসী মহাভারতের 'ভারত পাঁচালী'-তে পাঁচালির গ্রাম্যসুরের মধ্যে এসেছে ধ্রুপদী-গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য। তা সত্ত্বেও শব্দ বিন্যাসের সহজ সরল স্বাভাবিকতার কারণে পাঠকের রসগ্রহণে কোন বাধার সৃষ্টি ঘটায় না। কাশীরামের বৈষ্ণব ভক্তির প্রগাঢ়তা ভাষাকে রসসাবলীল করে তুলতে সাহায্য করেছে। যেমন —

'কারণ করণ কর্তাদের দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।।'

কাশীরাম পণ্ডিতদের জন্য মহাভারতের অনুবাদে হাত দেননি। ভাবানুবাদের পথে যে স্বাধীন কবিত্ব শক্তির বিকাশ কবি ঘটিয়েছেন, তাতে প্রয়োজনীয় অংশগুলিও স্থান পেয়েছে। দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার যে কলহ সভাপর্বে বর্ণিত, তা সপ্তদশ শতাব্দীর দুই সতীনের কলহেরই ছবি —

'কৃষ্ণা বলে, নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি।।
কি আহার কি বিচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস তোর না জানি কারণ।।'

এর উত্তরে হিড়িম্বার উত্তর ঃ

'অকারণে পাঞ্চালি করিস অহঙ্কার।

মন্তব্য

পরে নিন্দা নাহি দেখ ছিদ্র আপনার।।'

রসের বিচারে বলতে হয়, কাশীদাসী মহাভারতে বিচিত্র রসের সমন্বয় ঘটেছে। বীররসের পাশাপাশি হাস্যরসের বর্ণনাতেও কাশীরাম অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। যুদ্ধের ব্যাপারে ভীমের যে পৌরুষত্ব বর্ণনা, বীররসের দৃষ্টান্ত হিসেবে তা যথেষ্ট উৎকৃষ্ট —

'মুখ তুলি বৃকোদর যেই দিকে চায়
পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়।।
সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্বত মন্দর।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর।।'

অন্যদিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈন্যদলের পলায়নের বর্ণনায় কারুণ্যের আধারে কৌতুক রসের অবাধ উৎসার ঘটেছে —

'উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল।
পথাপথ নাহি জ্ঞান যেদিকে পাইল।।
আড়ে ওড়ে ঝাড়ে ঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া।
জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া।।'

''শিল্পাদর্শের বিচারে কাশীরাম দাস মধ্যযুগীয় অনুবাদ সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি বলিয়া উচিত মর্যাদা পাইবেন।.... তাঁহার রচনারীতিও বিশেষ প্রশংসনীয়" (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব)। রচনারীতির ক্ষেত্রে কাশীরাম পয়ার ছন্দেরই অধিক ব্যবহার ঘটিয়েছেন। অবশ্য কিছু কিছু ত্রিপদীর ব্যবহারও কবির রচনাকৌশলেরই পরিচয় বহন করেছে। কবি প্রাচীন অলঙ্কার ব্যবহারের প্রতিই অধিক মনোযোগী হয়েছেন। তবে অন্ত্যানুপ্রাসে কবির নৈপুণ্য প্রতিষ্ঠিত। যেমন —

'মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র মণ্ডলে।
দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে।।'

চরিত্রসৃষ্টির ব্যাপারে কাশীরাম দাস সন্দেহাতীভাবে কৃত্তিবাসকে অতিক্রম করে গেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ''মহাভারতে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, কুন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি নারী আপন আপন স্বতন্ত্র চরিত্র-মহিমায় সমুজ্জ্বল। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও রাবণ জীবন্ত চরিত্র হইলেও ইঁহারা ব্যক্তিত্বদ্যোতক গুণ অপেক্ষা আদর্শনিষ্ঠার বিভিন্ন বিকাশের দ্বারা অধিকতর চিহ্নিত" (বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, প্রথম খণ্ড ঃ আদি ও মধ্যযুগ)। সে যাই হোক, বাংলা 'রামায়ণ' সাহিত্যে কৃত্তিবাস যেমন, তেমন 'মহাভারত' সাহিত্যে কাশীদাস কেবল এক শ্রেষ্ঠ কবি নন, সামগ্রিক একটি ঐতিহ্যের প্রতিভু। কিঞ্চিতধিক তিন পর্ব মাত্র কাব্য রচনা করেও অষ্টাদশ পর্ব 'মহাভারত' রচনার অমর গৌরবের তিনি অধিকারী হয়েছেন। পরবর্তীক্ষেত্রে আরো অনেক কবি মহাভারতের অনুবাদে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু কাশীদাসী মহাভারতের বিপুল জনপ্রিয়তার কাছে সেগুলি শুধুই নামমাত্র, তার বেশী নয়।

৯.১১ ঃ অষ্টাদশ শতকের মহাভারত-অনুবাদগোষ্ঠী ও শঙ্কর কবিচন্দ্র

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাভারতের অজস্র অনুবাদ হয়েছিল। কিন্তু সবগুলিই প্রায় অসম্পূর্ণ এবং গুণমানেও অপকৃষ্ট। তাই এই শাখার কবিদের শুধু নামোল্লেখই করা চলে। যেমন —

(ক) **গঙ্গাধর/গঙ্গাদাস সেন ঃ** মহাভারতের আদি ও অশ্বমেধ পর্বের রচয়িতা। (খ) **দ্বিজ গোবর্ধন ঃ** গদা পর্বের রচয়িতা। (গ) **দ্বৈপায়ন দাস ঃ** অশ্বমেধ পর্বের রচয়িতা। (ঘ) **নন্দরাম ঃ** দ্রোণ পর্বাদি রচনা করেন। (ঙ) **কৃষ্ণানন্দ বসু ঃ** শান্তি পর্বের রচয়িতা। (চ) **দ্বিজ কৃষ্ণরাম ঃ** অশ্বমেধ পর্বের রচয়িতা। (ঝ) **রাজেন্দ্র দাস ঃ** আদি পর্ব রচয়িতা। (ঞ) **রাজারাম দত্ত ঃ** দণ্ডী পর্ব রচয়িতা। (ট) **শঙ্কর কবিচন্দ্র ঃ** সমগ্র মহাভারত সংক্ষেপে অনুবাদ করেন।

এই শেষোক্ত জনই একমাত্র স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারেন। মল্লরাজ গোপাল সিংহের আদেশে পানুয়া গ্রামনিবাসী এই কবি সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেন (১৭৩৮-৪০ খ্রীষ্টাব্দে)। কবিচন্দ্রের কাব্যের বহু স্থানে পৃষ্ঠপোষক মহারাজার প্রশস্তি রচনা চোখে পড়ে ঃ

'শ্রীযুত গোপাল সিংহ প্রবল প্রতাপ।
যার কীর্তি দেখিলে ঘুচয়ে মনস্তাপ।

তারপর মহারাজ দিয়া ভূমিদান। মন্তব্য
আদেশিলা বর্ণ মহাভারত পুরাণ।।"

মৌলিকত্ব ঃ- (অ) মহারাজ গোপালচন্দ্রের আদেশে বৈয়াসকী মহাভারতের সারানুবাদরূপে তিনি সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন। বস্তুত সপ্তদশ শতকে কাশীরাম দাস ছাড়া আর কেউই তা করতে সমর্থ হননি। (আ) কবিচন্দ্র সংক্ষেপে মূল সংস্কৃত মহাভারতকে প্রায় অবিকৃতভাবেই প্রাদেশিক ভাষায় পরিবর্তিত করেছেন। অবশ্য অন্যান্য কবিদের মতো মাঝে মাঝে তিনি নতুন আখ্যান গ্রহণ ও নীতি-উপদেশাদি নীরস ঘটনা-বর্জনের চিরাচরিত আদর্শটিকে উপেক্ষা করেননি। এই গ্রন্থটিকে সহজেই মূলের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। (ই) কবিচন্দ্র লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কল্পিত বা লোক-প্রচলিত আখ্যানকে তাঁর কাব্যে যুক্ত করেছেন। এইগুলি 'পালা' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে এই জনপ্রিয় পালাগুলি কাশীরামের কাব্যের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে গেছে। (ঈ) কবিচন্দ্র মুখ্যতঃ পাণ্ডব-কৌরব কাহিনীটিকে তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেছেন। সেইজন্য মূল ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন বহু উপাখ্যান তাঁকে বর্জন করতে হয়েছে। কাশীরামের 'ভারত পাঁচালী'-র কথা স্মরণ করে তাঁর 'ভারত সাবিত্রী' অংশে তাই তিনি বলেছেন ঃ

'পূর্বে ভারত ভাঙ্গ্যাছিল অনেক লোকে।
গাইতে নারিল কেহ বাহুল্যের পাকে।।
সংক্ষেপে আঠারো পর্ব করি রাত্রিদিনে।
নৃপ আজ্ঞায় দিলাং বসুদেব গায়নে।।'

এইভাবে কবি খুব সংক্ষেপে মূলানুগ কাব্য রচনা করেছিলেন। (উ) গান করার জন্য অতিরিক্ত সরল করা হলেও কাহিনীর গ্রহণ-বর্জন ও সংস্থাপনে তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। (ঊ) তাঁর মহাভারতের অধ্যায় সংখ্যা কুড়ি। এগুলি হল যথাক্রমে — (১) আদি পর্ব, (২) সভা পর্ব, (৩) বন পর্ব, (৪) বিরাট পর্ব, (৫) উদযোগ পর্ব, (৬) ভীষ্ম পর্ব, (৭) দ্রোণ পর্ব, (৮) শল্য পর্ব, (৯) সৌপ্তিক পর্ব, (১০) দ্রোণী পর্ব, (১১) ঐষিক পর্ব, (১২) শান্তি পর্ব, (১৩) ভীষ্মযোগ, (১৪) অনুশাসন পর্ব, (১৫) অশ্বমেধ পর্ব, (১৬) আশ্রমবাসিক পর্ব, (১৭) মৌষল পর্ব, (১৮) মহাপ্রস্থান পর্ব, (১৯) স্বর্গারোহণ পর্ব, (২০) ভারত সাবিত্রী।

৯.১২ ঃ মহাভারতের অন্যান্য অনুবাদকগণ

১) 'রামচন্দ্র খান' ঃ- সম্ভবতঃ ১৫৩০-৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জনৈক রামচন্দ্র খান জৈমিনির মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব' বাংলায় অনুবাদ করেন। এই কবির ভণিতাযুক্ত যে দু'খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, তাতে আত্মপরিচয়ে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। একটিতে কবি নিজেকে জাতিতে কায়স্থ এবং কাশীনাথ-সুত বলে পরিচয় দিয়েছেন, অপরটিতে কবি ব্রাহ্মণসন্তান এবং পিতার নাম মধুসূদন। এই একটি সমস্যা, আর একটি সমস্যা — এই সময়েই নিত্যানন্দ প্রভুর অপমানকারী এক রামচন্দ্র খান এবং চৈতন্যমহাপ্রভুর সহায়ক অপর এক রামচন্দ্র খানের পরিচয় পাওয়া যায় না। রামচন্দ্র খানের মহাভারতের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।

২) অনিরুদ্ধ রাম সরস্বতী ঃ- কোচবিহার-রাজ বিশ্বসিংহ বা বিশু কোচের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথমে কবি পীতাম্বর ১৫৪৫ খ্রীঃ 'নলদময়ন্তী' অনুবাদ করে মহাভারত রচনার সূত্রপাত করেন এবং রাজার পুত্র শুক্লধ্বজ বা চিলারায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রখ্যাত পণ্ডিত অনিরুদ্ধ রামসরস্বতী মহাভারতের বনপর্ব, উদ্যোগপর্ব এবং ভীষ্মপর্ব অনুবাদ এবং তৎ-পুত্র দ্রোণপর্ব পর্যন্ত অনুবাদ করেছিলেন। এই রাজবংশের প্রবর্তনায় ঊনিশ শতক নাগাদ সমগ্র মহাভারতই বহু কবির সহায়তায় সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল।

৩) দ্বিজ রঘুনাথ ঃ- উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিজ রঘুনাথ সম্ভবতঃ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই জৈমিনির ভারতের 'অশ্বমেধ পর্বে'র অনুবাদ করেন। কাশীরাম দাসের রচনার সঙ্গে এঁর রচনার সাদৃশ্য এত বেশি যে, মনে হয় একের রচনা অপরের গ্রন্থেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

৪) নিত্যানন্দ ঘোষ ঃ- পাকুড়-রাজ পৃথ্বীরাজ তাঁর 'গৌরীমঙ্গল কাব্যে' উল্লেখ করেছেন যে কাশীরাম দাসের পূর্বেই নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারত রচনা করেন। তবে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন কবি নিত্যানন্দ আরও পরে সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। নিত্যানন্দকৃত মহাভারতের সাতটি মাত্র পর্বের সন্ধান পাওয়াতে অনুমিত হয় তিনি হয়ত সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেন নি।

মন্তব্য

৫) **ষষ্ঠীবর সেন ঃ-** ঢাকা জেলার অধিবাসী ষষ্ঠীবর সেন এবং তৎপুত্র গঙ্গাদাস সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন বলেই উল্লেখ করেছেন। এঁদের কে কতটা রচনা করেছিলেন অথবা কোন একজন বা দুজনই সমগ্র মহাভারত রচনা করেছিলেন এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না।

৯.১৩ ঃ অনুশীলনী

১। বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ মহাভারত অনুবাদকের অনুবাদ কর্মের প্রকৃতি ও কবি প্রতিভার পরিচয় দান।

২। বাংলা মহাভারত অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও তাঁর কাব্যের পরিচয় দিন।

৩। শ্রীকর নন্দী ও সঞ্জয়ের মহাভারত অনুবাদের প্রকৃতি ও কাব্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। কাশীরাম দাসের ব্যক্তি পরিচয় ও তাঁর 'ভারত পাঁচালী'-র রচনাকাল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। কবি কাশীরাম দাসের কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৬। অষ্টাদশ শতাব্দী এবং তার পরবর্তী কালের মহাভারত অনুবাদকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৯.১৪ ঃ গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — ড. সুকুমার সেন।
২। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা — শ্রীভূদেব চৌধুরী।
৫। বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা — ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

একক ১০ঃ ভাগবত অনুবাদ

মন্তব্য

<u>বিন্যাসক্রম</u>

১০.১ ঃ উদ্দেশ্য।

১০.২ ঃ পঞ্চাদশ শতকের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা।

১০.৩ ঃ ভাগবত অনুবাদ।

১০.৪ ঃ মালাধর বসুর জীবনবৃত্তান্ত।

১০.৫ ঃ কাব্য উৎস, ঋণ ও পরিচয়।

১০.৬ ঃ কাব্যের নামকরণ।

১০.৭ ঃ রচনাকাল ও পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বর প্রসঙ্গ।

১০.৮ ঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গুরুত্ব।

১০.৯ ঃ কবির কবিত্ব।

১০.১০ ঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে ভক্তি ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ।

১০.১১ ঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে বাংলা ও বাঙালি মানসিকতা।

১০.১২ ঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে বর্ণিত সমাজচিত্র।

১০.১৩ ঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের কাব্যমূল্য।

১০.১৪ ঃ ভাগবতের অন্যান্য অনুবাদ।

১০.১৫ ঃ বাংলায় ভাগবত অনুবাদ সীমিত হওয়ার কারণ।

১০.১৬ ঃ অনুশীলনী।

১০.১৭ ঃ গ্রন্থপঞ্জি।

মন্তব্য

১০.১ ঃ উদ্দেশ্য

হিন্দু ধর্মের চরম বিপর্যয়ের দিনে দেশবাসীদের মধ্যে একটি জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার জন্য কোন কোন শক্তিশালী কল্পনার অধিকারী কবি বা ভক্তর নিজেদের পুরাণ, ইতিহাসের গল্পগুলি সাধারণ মানুষের জন্য পরিবেশন করতে এগিয়ে এলেন। গল্পের প্রতি আগ্রহ আবৃদ্ধ-কিশোর সকলেরই আছে। পুরাণের কৃষ্ণকে একজন জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়ে ভাগবত থেকে তুলে আনলেন মালাধর বসু রৌরব নরকে পতিত হওয়ার ভয় না পেয়ে। আমরা এই এককে তৎকালীন সমাজ, তৎকালীন ইতিহাস এবং সাহিত্য ধর্ম, সংস্কৃতির পরিচয় পাবো। তাছাড়া এই একেকটি পাঠ করলে কবির জীবন, তার ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারবে। চৈতন্য পূর্ববর্তীকালে সুপ্রাচীন বৈষ্ণবধর্মের কি অবস্থা ছিল এবং ভক্তিবাদের কোন স্তরটি সে সময় প্রচলিত ছিল এবং কবিতার কাব্যে কেমন করে তা ফুটিয়ে তুলেছেন, এবং কবির জীবন বৃত্তান্ত, মৌলিকতা, কাব্যেররচনাকাল, পৃষ্ঠপোষাক, কাব্যের গুরুত্ব, কাব্যের সমাজচিত্র, কাব্যমূল্য, বাঙালি মানসিকতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এই এককে পাওয়া যাবে।

১০.২ পঞ্চদশ শতকের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ- ত্রয়োদশ শতকের তুর্কি আক্রমণের পর যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল পঞ্চদশ শতকে তা প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছে। ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহি বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। দুই পর্বে বিভক্ত এই বংশের শাসনকাল তৎকালীন বাংলার ইতিহাসে বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল বলা চলে। এই সময়ে মোটামুটিভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার ফিরে এসেছিল। সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৮৯ পর্যন্ত রাজস্ব করেন। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকের রাজনৈতিক ইতিহাস তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র, সুলতানদের অপদার্থতার বিবরণ মাত্র।

ইলিয়াসশাহি সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠা হলে, ভিতরে ভিতরে শক্তিশালী ও ক্ষমতালিপ্সু হিন্দু — যাঁরা রাজা ছিলেন, তাঁরা সমবেত হতে লাগলেন এবং তাঁদের পুরোনো দিনকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন অর্থাৎ সিংহাসন দখলের চেষ্টা করলেন এবং সফলও হলেন।

১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াসশাহি বংশের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের সিংহাসনে বসলেন রাজা গণেশ কিন্তু দেশের ভিতরের এবং বাইরের মুসলমানদের চাপে তাঁকে সিংহাসন ছাড়তে হল। তিনি তাঁর পুত্র যদুকে সিংহাসনে বসালেন এবং বিপদ এড়ানোর জন্য বা সিংহাসনের অধিকার স্থায়ী করার জন্য পুত্রকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করালেন। নাম হল জালালুদ্দিন (যদু)। ১৪৩১-এ রাজা গণেশের মৃত্যু হল।

গণেশ ও তাঁর পুত্র যদু জালালুদ্দিনের শাসনকালে দেশে শৃঙ্খলা ও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়ে গৌড়-দরবারে হিন্দু পণ্ডিত মনীষীর প্রতিপত্তি বেড়েছিল। সে প্রতিপত্তি ইলিয়াসশাহি বংশের দ্বিতীয় পর্বেও বজায় ছিল বলে মনে করা হয়।

জালালুদ্দিনের পুত্র সামসুদ্দিন অপদার্থ হলেও এগারো বছর রাজত্ব করেছিলেন। ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহের এক বংশধর সিংহাসনে বসেন। ইলিয়াসশাহি বংশের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। নতুন সুলতান নাসিরুদ্দিন এবং তাঁর পুত্র রুকনুদ্দিন বরবক শাহ এবং তাঁর পুত্র শামসুদ্দিন ১৪৮১ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এঁরা সবাই সুশাসক ছিলেন এবং গুণানুরাগী এই সুলতানরা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গুণীজনদের পৃষ্ঠপোষণা দিয়েছেন। কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বৃহস্পতি মিশ্র, ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকি (ফারসি ভাষায় শব্দকোষ 'শরফনামা' রচয়িতা) প্রমুখ ব্যক্তি এঁদের দ্বারাই সম্মানিত হয়েছিলেন।

এরপরে কয়েক বছর চলে অরাজকতা। তারপর জন্মগ্রহণ করেন মধ্যযুগের সমাজের পরিত্রাতা শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬)। গুণী, হৃদয়বান সুলতান হুসেনশাহ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মসনদে বসেন। দেশে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপিত হল। এই সময়ে বাংলার আশেপাশের রাজনৈতিক অবস্থাও দেখা দরকার। বাংলায় সংলগ্ন উত্তরবিহার (তীরভুক্ত তিরহুত) দীর্ঘদিন হিন্দু অধিকারে ছিল বলে বাংলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শিথিল হয়নি। তিরহুতও যখন মুসলমান অধিকারে চলে এল তখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মনীষীরা বিগ্রহ আর ধর্মপুঁথি নিয়ে নেপালে আশ্রয় নিলেন। মুসলমান আক্রমণে তদানীন্তন মিথিলার সমাজ বিশেষ করে ব্রাহ্মণ-সমাজ কীভাবে ভেঙে পড়েছিল ---- তার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন পাওয়া যায় বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' গ্রন্থে — খলে সজ্জন পরিভাবা কোই নহি হোই বিচারক / জাতি অজাতি বিবাহ, অধম উত্তম কা পারক / অখ্খর-রস বুঝ্ঝ নিহার জহি। / কই কলভমি ভিখ্খারি ভঁউ।। — অর্থাৎ খল সজ্জনকে পরাভূত করল। বিতারক কেউ থাকল না। জাতি অজাতির মধ্যে বিবাহ হল। অধম উত্তমের

ওপর শ্রেষ্ঠত্বলাভ করল। বিদ্যারস বুঝবার লোক দেখা গেল না। কুলীন ব্যক্তি ভিক্ষুকে পরিণত হল। মন্তব্য

তিরহুত মুসলমান শাসনে আসবার পর বাংলার সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। ফিরোজ শাহ তুঘলক যখন বাংলা আক্রমণ করেন তখন তিরহুতের রাজা ভোগেশ্বর (কামেশ্বরের পুত্র) তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বলে কোনো একজন দিল্লির সুলতানের কাছে তারা 'রায়' উপাধি লাভ করে।

পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে মিথিলা জৌনপুরের তুর্কি সুলতানদের অধীন থাকলেও পরে গৌড় সুলতানের অধিকারে আসে। গৌড় ও তিরহুতের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটে। এর ফল হয়েছিল সুদূরবিস্তৃত — যা এই সময়ের সামাজিক অবস্থার মধ্যে আমরা দেখতে পাব।

চৈতন্যদেবের জন্মসময়ে রাজ্যে খোজাদের বাড়বাড়ন্ত হয়। খোজা বারবক ফতে শাহকে হত্যা করে 'সুলতান শাহ্জদা' নাম নিয়ে এক ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি জাতিতে ছিলেন হাবশি। তার থেকে বাংলায় হাবশি শাসন শুরু হয়। কারো কারো মতে তিনি বাঙালি ছিলেন। কারো মতে ছয় থেকে আট মাস, আবার কারো মতে আড়াই মাস রাজত্ব করার পর তাঁর প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল তাঁকে হত্যা করে রাজ্য দখল করে। পরবর্তী রাজা মৈনুদ্দিন ফিরোজ শাহ ১৪৮৭-৯০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এরপর যে সুলতানদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন — নাসিরুদ্দিন মাহ্মুদ শাহ (দ্বিতীয়) ও শামসুদ্দিন মুজফ্ফর শাহ। ১৪৯৩-এ এই বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতার দিনের অবসান হয়। বাংলায় রুকনুদ্দিন বারবক শাহের পর প্রথম একজন সুশাসক নরপতির নাম পাওয়া গেল — যাঁর নাম আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। ১৪৯৩-এর নভেম্বর থেকে ১৪৯৫-এর জুলাইয়ের মধ্যে তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক চিত্রটি ছিল এইরকম।

সামাজিক অবস্থা ঃ- দেশের রাজসিংহাসন যখন টলায়মান তখন প্রজাদের শান্তি সুখ বিঘ্নিত হবেই। নানাভাবে আগ্রাসী মুসলমানরা ধীরে ধীরে হিন্দুর সমাজে প্রবেশ করে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বাংলার সর্বত্র — শহরে ও গ্রামে সুফিরা দরগা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁরা আধ্যাত্মিক দিকে যেমন উন্নত ছিলেন জ্ঞানেও ছিলেন সুপণ্ডিত। এঁদের অজস্র শিষ্য থাকতে এবং অমুসলমানদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাকে পুণ্যকর্ম বলে তাঁরা বিবেচনা করতেন। হিন্দুধর্মের মধ্যে তান্ত্রিকদেরও খুব প্রভাব ছিল। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত এইসব তান্ত্রিক সাধু ও গুরুদেব বহুরকমের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। পীর দরবেশে ফকিরদের মতো এসব তান্ত্রিকেরাও সমাজে মান্যতা পেত।

সাধারণ মানুষ, নিম্নবর্ণের হিন্দু ভয়ে-ভক্তিতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁরা আরবি ভাষা জানতেন না। কেউ কেউ অল্প অল্প ফার্সি জানতেন। মুসলমান ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁদের তেমন কোন জ্ঞান ছিল না। ঐতিহাসিকদের মতে বাঙালি মুসলমানেরা না বুঝতেন আরবি, না বুঝতেন নিজের ধর্ম — বুঝতে পারতেন কেবল গল্প আর আখ্যান। তাঁরা তাই নিয়েই মত্ত থাকতেন। সেই সময়ে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে যা লেখা হয়েছিল —

'হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে।।'

এই চিত্রেরই যেন প্রতিরূপ পাই বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতেও।

চৈতন্যপূর্ব বাঙালি সমাজের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন —

'ধর্ম্ম কর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।'

— অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান উভয় স্তরের লোকের মধ্যেই ধর্মের বাহ্যোপকরণগুলিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কারো মধ্যে অন্তর্নিহিত ভক্তিরস প্রবেশ করতেন না। তবে হরিদাসের ঘটনায় দেখি — তাঁর 'হিন্দুয়ানি' (মৃদঙ্গ মন্দিরা সহযোগে কীর্তন) করা ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

চৈতন্যদেবের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই পাঠান এবং অন্য বিদেশিদের শাসনের ফলে হিন্দুধর্মকর্ম বিশেষভাবে বাধা পেয়েছিল। জনগণের অন্তর্জগত ও বহির্জগতের এই আলোড়নের কথা বৃন্দাবনদাস বেশ ভালোভাবেই তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাই এটিকে পঞ্চদশ যোড়শ শতকের ঐতিহাসিক দলিলেল সম্মান দিয়ে থাকেন ঐতিহাসিকেরা।

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণের মানুষ স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম করতেন। স্মৃতিশাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা রচনা ও তার প্রচার করতেন। বাংলাদেশে অবশ্য এসব নিয়ম খুব কঠোরভাবে মানা হত না। সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে নবদ্বীপের চিত্রটি বৃন্দাবন দাস যথাযথভাবে এঁকেছেন। পঞ্চদশ শতকের

মন্তব্য

সামাজিক অবস্থায় সবাই সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতেন। অন্নবস্ত্রের দুঃখ সম্ভবত কারো ছিল না। পুত্র-কন্যার বিয়ে বা অন্য উৎসবে ধনী ব্যক্তিরা যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করতেন। অধ্যাপকেরা টোল খুলে বসতেন। কারো কারো খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ত। তাদের মধ্যে তর্কযুদ্ধ হত এবং জয়পত্র দেবার প্রচলনও ছিল। সাধারণ লোকও জ্ঞানলাভ করার সুযোগ পেত। এজন্য বালকেরাও 'ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে'। কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সংসারের 'ব্যবহার রস' বা বিদ্যারসসর্বস্ব মনোভাবকে তিনি 'ব্যর্থ' বলেছেন। সাধারণ মানুষ ধর্মকর্ম বলতে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' আর 'বিষহরির' পূজাকেই বোঝাতেন।

সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্য ও রীতি-নীতি সম্পর্কে যা জানা যায় তা হল — সাধারণ মানুষ কার্পাসবস্ত্র বা পট্টবস্ত্র পরতেন — তা তাঁতিদের ঘরেই তৈরি হত। 'দিব্য-সূক্ষ্ম-পীত' বস্ত্রের উল্লেখে বোঝা যায়। কাপড় রাঙানোর কৌশলও তখন জানা ছিল।

ধনীলোকেরা দোলা বা ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতেন। এমনকি বিখ্যাত পণ্ডিতেরাও দোলায় চড়ে যেতেন। বিবাহের সময় তো দোলা ব্যবহার হতই। বিবাহের রীতিনীতিও বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়মেই হত। ব্রাহ্মণেরা তিলক ধারণ করতেন। স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী ব্রাহ্মণেরা পঞ্চোপাসক হতেন — বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য।

প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রমতে বিবাহ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি বিধি পালিত হত। বিবাহবন্ধন সুদৃঢ় বলে বিবেচিত হত। একমাত্র অসতীত্ব ছাড়া কোন কারণে পতি স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পারতেন না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা ভগিনীর আগে কনিষ্ঠভ্রাতা বা ভগিনীর বিবাহ ছিল নিন্দনীয় এবং গুরুতর অপরাধ।

পাপীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত 'ক্ষার, উত্তাপ, প্রচণ্ড আঘাত ও প্রক্ষালনের ফলে যেমন মলিন বস্ত্র পরিষ্কার হয়, তেমনভাবেই তপশ্চর্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা পাপী পাপমুক্ত হয়। পাপকারীর বয়স, বর্ণ, সে পুরুষ বা স্ত্রী ইত্যাদি বিবেচনায় প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য হয়।'

সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথাই মান্য করা হত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র — এই চারবর্ণের ভিত্তিতেই হিন্দু সমাজ গঠিত ছিল। এই চারবর্ণ ছাড়াও বাংলাদেশে বহু সঙ্কর বর্ণের বাস ছিল।

তন্ত্রশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের অধিকার স্বীকৃত ছিল। বাংলাদেশে কুমারী পূজা এখনও পর্যন্ত প্রচলিত আছে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুকম্পা লক্ষ করা যায় বিচার পদ্ধতিতেও। একই অপরাধে পুরুষ অপেক্ষা নারীর দণ্ড লঘুতর হত।

ছাত্ররা শিক্ষকদের যার যেমন অর্থনৈতিক অবস্থা — তেমন গুরুদক্ষিণা দিতেন —

'সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, বিদ্যাসন।
সুরঙ্গ কম্বল বহু প্রকার বসন।।'

রাজা কর্তৃক গুণীজনকে সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি ছিল লক্ষণীয়। উপাধি দান (মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' এভং বৃহস্পতি মিশ্রকে 'পণ্ডিত সার্বভৌম'), মূল্যবান দ্রব্যাদি দান (কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়, হার ইত্যাদি)। বৃহস্পতি মিশ্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চিত্রটি এখানে প্রাসঙ্গিক — উজ্জ্বল মণিময় হার, দ্যুতিমান দুটি কুণ্ডল, রত্নখচিত দশ আঙুলের দশটি অঙ্গুরীয় পরিয়ে, হাতির পিঠে চাপিয়ে, স্বর্ণকলসের জলে অভিষেক করিয়ে ছত্র ও অশ্বের সঙ্গে 'রায়মুকুট' উপাধি দান করেছিলেন। এই পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম রুকনুদ্দিন বরবক শাহ। তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে সমভাবেই দেখতেন বলে জানা যায়। কিন্তু হিন্দু মন্দির ভেঙে মস্‌জিদ তৈরির নানা ঘটনা তার পুত্র উচ্চশিক্ষিত ধর্মপ্রাণ শাসনদক্ষ নৃপতি য়ুসুফ শাহের সময়ের ঘটনা। পাণ্ডুয়ার মিনার ও মসজিদ তৈরী হয়েছিল সূর্য ও নারায়ণের মন্দির ভেঙে। তার নিদর্শন আজও আছে। হুসেন শাহ ও মন্দির ভাঙতেন —

'যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেন দেউল বিশেষে।।'

— কিন্তু তা হিন্দুদের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌছায়নি।

মধ্যযুগের হিন্দু সমাজ অশিক্ষা, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। ভূত প্রেতে বিশ্বাস, চৌর্যবৃত্তি এসব সব সমাজের মত বাংলার সমাজেও ছিল। সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে যেতো মা-বাবার আদরের সোনার ছেলেরা। পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে সুখে দুঃখে সহমর্মিতা ছিল।

পঞ্চদশ শতকের অনড়, অটল, সমাজকে রাজভীতি, ধর্মান্তরিত হওয়ার ভয় থেকে, সামাজিক নানা অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতা থেকে উদ্ধার করতে আবির্ভূত হলেন ষোড়শ শতকের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব।

মন্তব্য

১০.৩ ভাগবত অনুবাদ

তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলায় আর্য ও আর্যোত্তর সংস্কৃতির সমন্বয় আকাঙ্খার কারণে ঐশ্বর্যভাবের মূর্ত প্রতীক শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী লীলারস আস্বাদনের ফলস্বরূপ মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। কাব্যের কোন কোন পুঁথিতে যা 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত। কাব্যটির অনুবাদ কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি নিজেই জানিয়েছেন —

'ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।'

'ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে।।' ইত্যাদি।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটি তবু ভাগবতের অনুবাদ বা অনুসরণ হিসেবে বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। বৈষ্ণব সমাজের বাইরে, কাব্যটির যে খুব জনপ্রিয়তা ছিল তা মনে হয় না। কারণ রামায়ণ মহাভারতের যেমন অসংখ্য পুঁথি পাওয়া গেছে, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র পুঁথির সেরূপ প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয় না। তা সত্ত্বেও ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ''একসময়ে এই গ্রন্থ সাধারণ বৈষ্ণব সমাজে উপনিষদ বলে গৃহীত হয়েছিল। এরই মারফতে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণকথা, শুধু বৈষ্ণবসমাজে নয়, সমগ্র বাঙালি সমাজে প্রচারিত হয়েছিল'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)।

১০.৪ ঃ মালাধর বসুর জীবনবৃত্তান্ত

চৈতন্য-পূর্ববর্তী একজন বড় বৈষ্ণব ভক্ত পণ্ডিত ছিলেন মালাধর বসু। বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত মেমারি স্টেশনের কাছে অবস্থিত কুলীনগ্রামে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে আনুমানিক ১৪২০-২২ খ্রীষ্টাব্দে এই ভক্ত পণ্ডিতের জন্ম। নিজের আত্মপরিচয় অংশে তিনি লিখেছেন —

'বাপ ভগিরথ মোর মা ইন্দুমতি।
জার পুর্ণ্যে হৈল মোর নারাঅনে মতি।।'

অন্য একটি পুঁথিতে (নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত) আরও কয়েকটি পঙক্তি পাওয়া যায় যার মধ্যে কবির ব্যক্তি-পরিচয় আরও একটু বিস্তৃতভাবে জানা যায় —

'গুণ নাহি, অধম মুঞি, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম — 'গুণরাজ খান'।।
সত্যরাজ খান হয় হৃদয়-নন্দন।
তারে আশীর্বাদ কর যত সাধুজন।।.....
কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস।।
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে 'হরি' বল সর্ব্বজন।।'

— এখানে আমরা কবির জীবনের কিয়দংশের সঙ্গে কাব্যরচনার প্রেক্ষাপটটিকেও ধরতে পারলাম।

এই গৌড়েশ্বর যে রুকনুদ্দিন বারবকশাহ সে আলোচনা আমরা এই এককেই পরে করেছি। তাঁর দেওয়া উপাধিটিই (গুণরাজ খাঁ) কবি বেশিবার ব্যবহার করেছেন। কোনো কোনো সমালোচকের মতে উপাধিটি হল — 'গুণরাজ খান'।

আমরা অবশ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে এবং কবির ভণিতায় প্রায় সর্বত্র 'গুণরাজ খান' — নামটিই পাচ্ছি। কাব্যের ভণিতায় কবি নিজের প্রকৃত নাম 'মালাধর বসু' খুব কমই ব্যবহার করেছেন।

'জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে।
গোবিন্দ বিজয় গুণরাজখানে ভণে।'

অথবা,

'কৃষ্ণ ছাড়ি অন্য কারো না পড়য়ে মনে।

মন্তব্য

গুণরাজ খানে বোলে শ্রীহরিচরণে।।'

অথবা,

'কন্যাপুরে সাজিয়া চলিলা দৈত্যরাজ।
হরির চরণে ভণে খাঁন গুণরাজ।।'

— এরকম অজস্র ভণিতায় গুণরাজের নাম পাওয়া যায়। মালাধর বসুর নাম পাওয়া যায় খুব কম জায়গায় —

'নারায়ণ পাদপদ্ম চিন্ত সর্ব্বক্ষণ।
মালাধার বসু বলে নিস্তার কারণ।।'

— এতে মনে করা হয় তাঁর 'গুণরাজ খান' নামটিই বেশি প্রচারিত ছিল। কেননা, চৈতন্যদেব ও তাঁকে 'গুণরাজ খান' নামেই অভিহিত করেছেন —

'গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।।.....'

চৈতন্যদেবের পূর্বেই এই গ্রামটি ছিল বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র। হরিদাসও এই গ্রামে এসে বসবাস করেছিলেন। সেখানে বর্তমানে মন্দির নির্মিত হয়েছে। এই গ্রামকে মর্যাদা দিয়ে কৃষ্ণদাস লিখেছেন —

'প্রভু কহে, কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর।।
কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চড়ায় ডোম সে হ কৃষ্ণ গায়।।'

— কবির জন্মস্থানের সাংস্কৃতিক পরিচয় আমরা পেলাম। কবির বংশকে ও চৈতন্যদেব সম্মানিত করেছেন। কবির পুত্র সত্যরাজকে বলেছেন — রথযাত্রায় যে দড়িতে রথের টান হয় সেই 'পট্টডোরি' যেন এই বসু বংশ থেকেই যায় — 'আসিবে যাত্রার পট্টডোরি লঞা'। কবি ''নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর 'প্রাণনাথ' '' একথা লিখবার জন্য এই বংশের কাছে চৈতন্যদেব 'বিকাইনু হাত' বলেছেন। অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ছিল কবির পরিবার।

সমস্ত গ্রাম ছড়ানো তাঁদের পরিবারের নানা ধ্বংসাবশেষ। সত্যরাজ নির্মিত মন্দিরগুলি আজও বর্তমান। কবি জাতিতে কায়স্থ বংশের হয়ে ও বল্লাল সেনের বেঁধে দেওয়া নিয়মকে অস্বীকার করে দত্ত বংশীয় কন্যার সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহ দেন। সংস্কৃত ভাষা থেকে তিনি বাংলায় ভাগবত অনুবাদ করবার জন্য যে মানসিক দৃঢ়তা, সাহস দেখিয়েছিলেন এক্ষেত্রেও তারই পরিচয় পাওয়া যায়। কবিপুত্র সত্যরাজ খাঁ ও রামানন্দ বসু — দুজনেই চৈতন্যদেবের দুই বিশিষ্ট পার্ষদ। তাঁরা প্রতি বছর চাতুর্মাস্যার সময় নীলাচলে যেতেন। এই দুই ব্যক্তি ভ্রাতা না পিতাপুত্র তা নিয়ে মতানৈক্য আছে।

কর্মসূত্রে মালাধর গৌড়ে থাকতেন। সুলতানের দরবারে কোন্ পদে তিনি ছিলেন তা অবশ্য নিশ্চিত করে জানা যায় না তবে 'ছত্রী' শব্দটি উচ্চপদাধিকারীরই হতে পারে। 'গুণরাজছত্রী' — শব্দটিও পাওয়া যায়। 'খাঁ' উপাধিও গৌরবের। গ্রামে তাঁর প্রতিপত্তি দেখে মনে হয় তিনি কোনো উচ্চপদেই বৃত ছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। চৈতন্যদেবও তাঁর গ্রামে এসেছিলেন তবে তিনি তখন প্রয়াত হয়েছেন। জয়ানন্দের বিবরণে জানা যায় চৈতন্যদেব তিনদিন কুলীনগ্রামে ছিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ব্যতীত অন্যকিছু লিখেছিলেন বলে জানা যায় না তবে গুণরাজ খাঁ ভণিতায় 'রামচরিত্র' 'অষ্টলোকপাল কথা' ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাঁরা ভিন্ন ব্যক্তি হতে পারেন।

১০.৫ ঃ কাব্য উৎস, ঋণ ও পরিচয়

সংস্কৃতে রচিত অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে ভাগবত অন্যতম। পুরাণ ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু এগুলির মধ্যে ইতিহাস, সমাজ, দর্শন ও কাব্যরস মিশ্রিত হয়ে আছে। আর এই ছত্রিশখানি পুরাণের মধ্যে ভাগবত সর্বাধিক জনপ্রিয়। কারণস্বরূপ বলা যায়, প্রাচীনকালের এবং মধ্যযুগের বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে ভাগবত ধর্মগ্রন্থ বলেই সুপরিচিত। এই ভাগবত পুরাণের ১২টি স্কন্ধ (পরিচ্ছেদ), ৩৩২ অধ্যায় এবং ১৮,০০০ শ্লোক। স্কন্ধগুলির মূল বিষয়ই হল শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য। বিশেষ করে ''ভাগবতের শেষ তিন স্কন্ধ (১০ম-১২শ) কৃষ্ণলীলায় সমৃদ্ধ বলে বৈষ্ণব সমাজ ও সাহিত্যে এর প্রচারই সর্বাধিক'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। এর মধ্যে আবার মালাধর বসু ভাগবতের

দশ্য ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনিসূত্র অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটির পরিকল্পনা করেছিলেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। মালাধর সমগ্র দশম স্কন্ধটাই গ্রহণ করেছিলেন। একাদশ স্কন্ধে কাহিনি যৎসামান্য হওয়ায় বেশ কিছু তত্ত্বাংশ বর্ণিত হয়েছে। যেমন ---- কৃষ্ণ-উদ্ধবের কথোপকথনের সাহায্যে মুক্তি, ধ্যানযোগ, শ্রীহরিবিভূতি, যতিধর্ম, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিযোগ প্রভৃতি। এছাড়া মালাধর ভাগবত-বহির্ভূত বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনি অনুসরণে বৃন্দাবনলীলা, নৌকালীলা ও দানলীলা কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমলীলাও কাব্যটির অন্তর্ভুক্ত। এথেকে মনে হয় কবি সম্ভবতঃ পাঁচালী শ্রেণীর কাব্য রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন —

'ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিক কহিয়ে সার বুঝ মহামুখে।।'

সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন, ''শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঁচালী জাতীয় রচনা হলেও মূল সংস্কৃতের সঙ্গেও এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তবে আক্ষরিক অনুবাদ কোনো কোনো সময়ে একেবারেই বর্জিত হয়েছে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)।

মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা এই তিন লীলার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবনলীলায় রাস, নৌকালীলা ও দানলীলা প্রভৃতির যে বর্ণনা মেলে তা ভাগবতবহির্ভূত, কারো কারো মতে তা 'রক্ষিপ্ত। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুরাতন পুঁথিতে এই লীলাগুলির উল্লেখ নেই, রাধারও প্রয়া সাক্ষাৎ মেলে না। তবে পরবর্তীকালের পুঁথিতে রাধার সখী ললিতা বিশাখা প্রমুখের উল্লেখ মেলে। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটির বৃন্দাবনলীলায় অল্প স্বল্প আদিরসের পরিচয় থাকলেও, কাব্যটি প্রকৃতপক্ষে বীররসযুক্ত আখ্যানকাব্য। কেননা বর্ণিত তিন লীলাতেই কৃষ্ণের শৌর্যপূর্ণ বীরত্বের ছবিই প্রস্ফুটিত। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কারণে মনে করেন ''নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই বাক্যটিকে চৈতন্যদেব যতই শ্রদ্ধা করুন না কেন, রাসবর্ণনা বাদ দিলে এ কাব্যে আদিরসের চেয়ে বীররসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। তাই বলা যায়, পরবর্তীকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বাক্যটির উল্লেখ করে বৈষ্ণব সমাজে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এই উল্লেখ না থাকলে, মাধুর্যভাবের সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে ভাগবতের বিরাট পুরুষ ঐশ্চর্যমণ্ডিত কৃষ্ণের লীলা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে রীতিমত সংশয় থেকে যেত।

ভাগবত পুরাণ গ্রন্থ হওয়ায়, এতে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ছাড়াও তত্ত্ব-দর্শন-ইতিহাস-কিংবদন্তী প্রভৃতি বিষয়গুলি কাব্যের পক্ষে অনুপযুক্ত। তাই মালাধর শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে কাব্যের রূপ দিতে গিয়ে কাহিনিকাব্যের অনুরূপ আদি-মধ্য-অন্তর্যুক্ত একটি নিটোল কাহিনি নির্মাণ করেছেন। কাহিনি সূত্রটি এইরূপ — ''কৃষ্ণলীলায় আদিকাহিনি কৃষ্ণের জন্ম থেকে মথুরা যাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যকাহিনি মথুরায় কংসবধ থেকে দ্বারকাযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত বিন্যস্ত। অন্ত্যকাহিনিতে দ্বারকাপুরীতে কৃষ্ণের সবান্ধবে যাত্রা, দ্বারকা ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগ পর্যন্ত বিস্তৃত।'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। ভাগবত কাহিনির যথাযথ পরিচয় নিলে দেখা যাবে, নিষ্ঠাবান অনুবাদক হিসেবে ঐ যুগে মালাধর অগ্রগণ্য। কাহিনি অনুসরণ করলে দেখা যাবে, ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রায় পুরোটাই এবং একাদশ স্কন্ধের কৃষ্ণ-উদ্ধারের অধ্যাত্মযোগ বিষয়ক আলোচনা, যদু বংশ ধ্বংস এবং কৃষ্ণের তনুত্যাগের কাহিনির ব্যাপারে কবি ভাগবতের অনুসারী। তাছাড়া ভাগবতের দশম স্কন্ধের মোট আটটি অধ্যায়ে গোপী প্রসঙ্গ এবং তার মধ্যবর্তী পাঁচটিতে বিস্তারিতভাবে রাসলীলা বর্ণিত। এ ব্যাপারে মালাধরের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ স্বচ্ছ। কেননা এই গোপী প্রসঙ্গ এবং রাসলীলা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে যথেষ্টই সংক্ষিপ্ত। মালাধর মূল ভাগবতের মনোযোগী পাঠক ছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে ভাগবতের কাহিনিকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও কোন কোন বিষয়ে কবির স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। যেমন — রাসমণ্ডলে কৃষ্ণ-বর্জিত কোন এক গোপীকে মালাধর রাধার পরিচয়ে উপস্থাপিত করতেই পারতেন। কিন্তু কবি সে পথে যাননি। তাই সিদ্ধান্ত করা যায়, '' .... মালাধর ভাগবতের আগাগোড়া আক্ষরিক অনুবাদ না করলেও মূল কাহিনির কোনও ব্যত্যয় ঘটাননি। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজ ও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য প্রবাবে রাধাপ্রেম সর্বসাধ্যসার বলে গৃহীত হলে মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তা লিপিকার ও গায়কদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল বলে মনে হয়'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড)। তবে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র কাহিনি প্রসঙ্গে একটি কথা বলতেই হয় যে কৃষ্ণের মধুরলীলার প্রসঙ্গ গ্রহণ করে কবি সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

কবি পরিচয় ঃ- 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের শুরুতে ও শেষে সামান্য কিছু বিবরণ ছাড়া, মালাধর বসু বিশদ আত্মপরিচয় দেননি। অন্যদিকে কাব্যটি সম্পর্কে চৈতন্যদেবের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও ভালোবাসা কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং মালাধরের গ্রামটিকে মহাপ্রভু প্রায়

মন্তব্য

তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছেন —

'প্রভু কহে কুলীন গ্রামের সে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজনে বহু দূর।।'

চৈতন্যদেবের এই বক্তব্যসূত্র এবং তথ্যসূত্রের উপর নির্ভর করে বলা যায়, বর্ধমান জেলার মেমারি রেলস্টেশনের নিকটবর্তী কায়স্থ প্রধান কুলীন গ্রামে মালাধর বসু জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি কায়স্থ প্রধান যেমন, একইভাবে বৈষ্ণব প্রধানও বটে এবং বৈষ্ণব সমাজের মধ্যমণি। মালাধর অবস্থাবান অভিজাত কায়স্থবংশীয় — 'কায়স্থ কুলেতে জনম কুলীন গ্রামে বাস।' পিতা ভগীরথ, মা ইন্দুমতি। কবির ''জন্মকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা না গেলেও মনে হয় তিনি চৈতন্যদেবের সময়েও বর্তমান ছিলেন। হয়তো তখন তিনি সুবৃদ্ধ। তাই কেউ কেউ মনে করে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁর জন্ম হয়েছিল'' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তঃ প্রথমখণ্ড)। কবি নিজের পুত্র-পরিচয় সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, 'সত্যরাজ খান হয় হৃদয়নন্দন'। শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ এবং অনুরাগী পার্ষদ রামানন্দ বসু সত্যরাজের পুত্র এবং মালধরের পৌত্র হলেও, কোনো মতে সত্যরাজ রামানন্দ একই ব্যক্তি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র বর্ণনাতেই দুজনকে একই ব্যক্তি বলে মনে হয় —

১) কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ।
২) ভাগ্যবান সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
৩) 'কুলীন গ্রামবাসী রামানন্দ সত্যরাজ খান।
তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান।।' ইত্যাদি।

এইজাতীয় বিভিন্ন উল্লেখ সত্ত্বেও বলা যায়, মালাধরের পুত্র ও পৌত্র যথাক্রমে সত্যরাজ ও রামানন্দ। কবির আবির্ভাবকাল সম্পর্কে অন্য একটি তথ্যসূত্রের উল্লেখ করে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সম্ভাব্য সময় নির্দ্ধারণ করে বলেন, ''১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে কবির পুত্র সত্যরাজ খান বৃষ প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন মালাধর নিশ্চয় অতিবৃদ্ধ। যদিও ধরা যায়, এই সময়ে তাঁর বয়স অন্তত ষাট বৎসর হয়েছিল, তা হলে মনে হয়, তিনি ১৪২০-২২ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। তবে এ সবই অনুমানমূলক।''

ঋণ ঃ- সে যুগের অনুসারী সাহিত্যগুলি যথার্থ অনুবাদকাব্য নয় বলেই কবিরা ইচ্ছামতো কাহিনিগুলি পরিবর্তন করেছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল 'লোকনিস্তারিতে' গ্রন্থ রচনা। সুতরাং তাঁরা যে গ্রন্থটি থেকে মূল কাহিনি নিতেন তা থেকে সবটা নিতেন না — পাশাপাশি প্রচলিত জনপ্রিয় অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও কাহিনি গ্রহণ করতেন এবং পাঠক অনুযায়ী, তৎকালের রুচি-চাহিদা অনুযায়ী তার বদল ঘটাতেন। প্রয়োজনে নিজের মনোমত সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত করতেন।

কৃষ্ণমঙ্গল কাহিনি কাব্যগুলি মূলত ভাগবতকেন্দ্রিক। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর কাহিনি ও শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম ও ১১ম স্কন্ধের অনুবাদ এও আমরা জানি। মূল ভাগবতের যে যে কাহিনি তিনি বর্জন করেছেন বা পরিবর্তন ঘটিয়েছেন — তা আমরা প্রসঙ্গত আলোচনা করেছি।

এখানে উল্লেখ করবো ভাগবত ছাড়াও তিনি আর কোন্ কোন্ গ্রন্থ থেকে তার কাব্যের উপাদান গ্রহণ করেছেন সেগুলির কথা।

মহাভারত থেকে মালাধর সুভদ্রাহরণের কাহিনি নিয়েছেন। ইন্দ্রের গৃহে পাণ্ডুর দর্শন, জরাসন্ধের জন্মকাহিনি, শিশুপালের জন্মকাহিনি প্রভৃতি ঘটনাও মহাভারতের সভাপর্ব থেকে গৃহীত হয়েছে। এই সভাপর্বের ষোড়শ অধ্যায়ে জরাসন্ধের জন্ম সম্পর্কে যা পাওয়া যায় — মালাধরের সঙ্গে তা সম্পূর্ণ না মিললেও অনেকটা অংশেরই মিল আছে। মহাভারতে যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিলেন কিন্তু মালাধর লিখেছেন — 'ভীম বলে জরাসন্ধ নাম কেনে তারে।' আর একটি গরমিল হল — মহাভারতে আছে চণ্ডীকৌশিক জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথকে সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রলাভের জন্য বরদান করেছিলেন কিন্তু মালাধর সেখানে লিখেছেন — দুর্বাসা মুনি এই বর দিয়েছিলেন।

বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হয়েছিলেন তখন শৃগালীর পথ দেখানোর কথা ভাগবতে নেই। তিনি ঐ কাহিনিটি 'ভবিষ্যপুরাণ'-এর 'বশিষ্ট-দিলীপ-সংবাদ'-এর জন্মাষ্টমী ব্রতকথায় আছে। লোক প্রচলিত কৃষ্ণকথা-ব্রতকথা থেকেও মালাধর কাহিনিটি নিতে পারেন। জন্মাষ্টমীর ব্রতকথাও দীর্ঘদিন থেকেই লোকসমাজে প্রচলিত ছিল।

গীতার দ্বারা যে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন তার বড় প্রমাণ উদ্ধবকে বিশ্বরূপ দর্শনের ঘটনার অবতারণা করা। ভাগবতে 'শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ'-এ নানা তত্ত্বকথা আছে কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শনের কথা নেই। তবে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের অন্তর্গথ ষোড়শ অধ্যায়ে 'ভগবান কর্তৃক মহাবিভূতি কথন'

নামে একটি পরিছেদ আছে কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শন-এর প্রসঙ্গ নেই। এই অংশটি মালাধর গীতার একাদশ অধ্যায় থেকেই গ্রহণ করেছেন। গীতার অর্জুনের মতোই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে প্রথমে ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়েছেন পরে সৌম্যমূর্তি দেখিয়েছেন। গীতায় আছে —

'ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ বীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা।।'

(৫০ শ্লোক, একাদশ অধ্যায়)

— অর্থাৎ ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলে পুনর্বার সেইভাবেই নিজ দেবরূপ দেখালেন এবং সৌম্যমূর্তি হয়ে (দ্বিভুজরূপ) সেই ভীত অর্জুনকে পুনরায় আশ্বস্ত করলেন। মালাধর লিখলেন —

'প্রসাদ করহ এরূপ সংহারি।
সাম্যরূপ দেখায় গোসাঞি কিরিট কুণ্ডলধারি।।
তবে বিশ্বরূপ ছাড়ি দেব নারায়ণ।
উদ্ধবেরে সাম্যমূর্তি দেখায় তখন।।'

গীতায় বিশ্বরূপ দেখানোর পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যা বলেছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর বক্তব্যের সঙ্গেও তার মিল আছে।

পারিজাত হরণের কাহিনি ভাগবতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে আছে। মালাধর এই প্রসঙ্গটি সম্ভবত সংগ্রহ করেছেন হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ থেকে। এই দুই পুরাণেই পারিজাত হরণের কাহিনিটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। বিশেষকরে হরিবংশ পারিজাত হরণ কাহিনিটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। এই গ্রন্থের বিষ্ণুপর্বে নয়টি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কাহিনিটি। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ কৃষ্ণ ইন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। হরিবংশে পারিজাতহরণ প্রসঙ্গে নারদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্যে কারণ কৃষ্ণ নারদের কাছেই পারিজাত হরণের প্রতিজ্ঞা করেছে। নারদকে দূত হিসেবে ইন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছে, নারদের মুখে ইন্দ্রের অভিপ্রায় শুনে কৃষ্ণ যুদ্ধার্থে গমন করেছে। মালাধর এইভাবেই হরিবংশের ঘটনাটিকে অনুসরণ করেছেন। বিষ্ণুপুরাণেও কাহিনিটি বিস্তৃতভাবেই আছে কিন্তু এই বিষয়ে হরিবংশের কাছেই মালাধর সম্ভবত বেশি ঋণী।

হরিবংশর বিষ্ণুপর্ব থেকেই তিনি সম্ভবত বজ্রনাভ কাহিনিটিও নিয়েছেন। কেননা ভাগবতে কৃষ্ণের দ্বারকালীলায় বজ্রনাভ উপাখ্যান নেই। এই কাহিনিটি অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিল — আকর্ষকও।

ভারখণ্ড-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের কাহিনি মূল ভাগবতে নেই। এমনকি হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণেও নেই। এই কাহিনি দুটি কোনো পুরাণে নেই কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই লোকমুখে প্রচলিত ছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ অবশ্য পাওয়া যায়।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর দানলীলা ও নৌকাখণ্ডের বিবরণের সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ঘটনার মিল আছে। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর ভারখণ্ডও বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। এই অংশগুলি পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। কেননা সব পুথিতে এই লীলাগুলি পাওয়া যায় না।

নৌকাখণ্ডের প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' গ্রন্থের একটি কবিতায় —

'অরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি।
তুহুঁ এখনই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি'

অর্থাৎ — ওরে রে, কৃষ্ণ, নৌকো বইছ, ডগমগ ছাড়, দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই পার করে দিয়ে যা চাও, তাই নাও।

বিদ্যাপতির কবিতাতেও নৌকা বিলাস-এর ছাপ পাওয়া যায়। বিশেষভাবে বলা যায় না তিনি নিজে কোন্ গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন অথবা অন্যরাই বা কোন্ উৎস থেকে নিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ প্রক্ষেপ ঘটিয়েছেন। আদিরস প্রধান এসব লোক কাহিনি তখন প্রচলিত ছিল। তাই আমাদের এমন সিদ্ধান্তই নিতে হবে যে — মালাধর এসব কাহিনি, প্রাকৃত সাহিত্যে ও প্রাচীন সংস্কৃত কিছু প্রকীর্ণ কবিতায়, বিদ্যাপতির পদে পেয়েছেন — সেখান থেকেই হয়তো গ্রহণও করেছেন।

লোক প্রচলিত চণ্ডীব্রতের কথা কবি উল্লেখ করেছেন নানা জায়গায় এটার জন্য হয়তো তাঁকে অন্য কোনো গ্রন্থের কাছে ঋণ স্বীকার করতে হবে না কিন্তু উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে 'কায়সাধনা'র কথা বলছেন সেখানকার উপাদান তিনি কোনো তন্ত্রশাস্ত্র থেকে গ্রহণ করতে পারেন। সেই তন্ত্রশাস্ত্রগুলি হল — যোগবাশিষ্ঠ, ঘেরণ্ড সংহিতা, স্বন্ধপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ।

মন্তব্য

সঠিকভাবে বলতে পারা আজ আর যাবে না যে তিনি বিশেষ কোন্ গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। এটাও তিনি বাঙালি জনজীবনে প্রচলিত শাক্তধর্ম ও শক্তিপূজার প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে বাঙালির বিশেষ ধর্মচেতনাকেই সম্মান জানিয়েছেন।

ভাগবতের অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি অন্য পুরাণগুলি থেকে নানা আকর্ষণীয় উপাদান সংগ্রহ করেছেন সমকালীন পাঠকদের ভালো লাগবে বলে সর্বোপরি 'লোক নিস্তারিতে'-ই।

১০.৬ ঃ কাব্যের নামকরণ

শ্রীকৃষ্ণবিজয়-এর পুথি রামায়ণ মহাভারতের মতো বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায়নি। তাতে মনে হয় শ্রীচৈতন্যের এত প্রশংসাধন্য হলেও কাব্যটি বৈষ্ণবদের বাইরে সাধারণ মানুষের কাছে তেমন প্রচার পায়নি।

এই গ্রন্থটির আরও দুইটি নাম ছিল — 'গোবিন্দবিজয়' ও 'গোবিন্দমঙ্গল' (কোনো কোনো পুথিতে) যিনি কৃষ্ণ তিনি গোবিন্দ, সুতরাং 'গোবিন্দবিজয়' নাম হতেই পারে আর যুগপ্রবণতার কারণে 'মঙ্গল' শব্দটিও যুক্ত হয়ে 'গোবিন্দমঙ্গল' নামও হতে পারে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় শ্রীচৈতন্য ভাগবত-এর নামও কারো কারো মতে 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল। যে কোনো দেবদেবীর মাহাত্ম্যমূলক আখ্যানকাব্যকেই মঙ্গলকাব্য বলা হত। তবে কাব্যের তিনটি নামের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামটিই বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। মধ্যযুগে 'বিজয়' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হত। বিজয় অর্থে জয়, যাত্রা, উৎসব, আগমন, মৃত্যু — বোঝানো হয়। এখানে আমরা ভণিতায় দুরকমের নামই পেয়ে থাকি —

১। 'জয়জয় সব্দ হৈল সকল ভুবনে।
গোবিন্দ বিজয় গুণরাজ খানে ভণে।।'

২। 'একমনে সুন নর শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
গুণরাজ খান বলে জমের নাহি ভয়।।'

— গ্রন্থে 'গোবিন্দবিজয়' নামটিই অনেকবার উল্লেখ থাকলেও 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামেই রচনাটি বেশি পরিচিত হতে দেখা যায়। লক্ষ করতে হবে — চৈতন্যদেবও কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামটিরই উল্লেখ করেছেন। কবি 'বিজয়' শব্দটির দ্বারা কীর্তিগাথা, জয়যাত্রা, বিজয়-গৌরব — এসবই বোঝাতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণের গৌরব কাহিনি বা শোভাযাত্রার কথাই বর্ণিত হয়েছে। তাই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামকরণটিকে সার্থক বলা যায়।

১০.৭ ঃ রচনাকাল ও পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বর প্রসঙ্গ

রচনাকাল ঃ- কাব্যটির রচনাকাল বলে যে পঙ্‌ক্তি দুটির প্রচার আছে তা হল —

'তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।'

— অর্থাৎ ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটির রচনা শুরু হয় ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা শেষ হয়। কেউ কেউ এই পঙ্‌ক্তি দুটিকে প্রামাণ্য মনে করেন না। একটি অতি জীর্ণ পুথি থেকে সম্পাদিক গ্রন্থে (রাধিকানাথ দত্ত ও কেদারনাথ দত্ত কর্তৃক ১৮৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত) এই রচনাকালের উল্লেখ আছে কিন্তু সব পুথিতে এই কাল নির্ণায়ক শ্লোকটি নেই। কিন্তু ওই রচনাকাল যে সঠিক তার প্রমাণ পাওয়া যায় অন্য দুটি সূত্র থেকে। একটি হল কুলীনগ্রামে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের দাওয়ায় স্থাপিত একটি বৃষের গলদেশের লিপি থেকে বোঝা যায় পুত্র সত্যরাজ খানের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল বৃষমূর্তিটি ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। মালাধর বসু তার ২০/২৫ বছর পূর্বে গ্রন্থটি লিখে থাকবেন। আর যে গৌড়েশ্বর তাঁকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দিয়েছিলেন সেই রুকনুদ্দিন বারবক শাহের সময়কালের মধ্যে ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পড়ে। বহুশ্রুত গুণগ্রাহী সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহই তাঁকে উপাধি দান করেন এবং মালাধরও ঐ সময়ের মধ্যেই গ্রন্থ রচনা শুরু করেন বলে মনে করা হয়।

পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বর প্রসঙ্গ ঃ- আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে — গ্রন্থটি ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লেখা শুরু হয়ে ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শেষ হয়েছিল। এই শ্লোকটি সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও অনেকেই অন্যান্য প্রমাণের নিরিখে মেনে নিয়েছেন যে রচনাকালের সময় ঠিকই আছে। এখন প্রশ্ন হল তখন কে গৌড়েশ্বর ছিলেন এবং কে তাকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দিয়েছিলেন।

রাধিকানাথ দত্ত প্রকাশিত সংস্করণের শেষ দিকের পদ-সমষ্টির মধ্যে একটি পদে উল্লেখ আছে —

মন্তব্য

'গুণ নাঞি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।'

— কাব্যের শুরু থেকেই কবি এই উপাধিটি ভণিতাতে ব্যবহার করছেন। তাহলে মনে করা যায় উপাধিটি কাব্য রচনার আগে থেকেই পাওয়া। ১৪৭৩-এর আগে বাংলা দেশের শাসনকর্তা ছিলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। কারো কারো মতে এই গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিনের পুত্র শামসুদ্দিন য়ুসুফ শাহ, কেউ আবার বলেন — এই গৌড়েশ্বর আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। ১৪৭৩ থেকে ১৪৮১-এর মধ্যে যারা রাজত্ব করেছিলেন — তাদের মধ্যে হোসেন শাহ পড়েন না কেননা তিনি ১৪০২ শকাব্দের তেরো বছর বাদে অর্থাৎ ১৪১৫ শকাব্দে (১৪৯৩ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহলে আমাদের প্রস্তাবের তালিকায় রইলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ আর তাঁর পুত্র জালালুদ্দিন য়ুসুফ শাহ। এই দুজনের মধ্যে কেউ কবিকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়ে থাকবেন।

বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ) থেকে আমরা জানতে পারি বারবক শাহ অন্তত একুশ বছর রাজত্ব করেছিলেন (১৪১৫-১৪৭৬)। এর মধ্যে ১৪৫৫ থেকে ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নিজের পিতা নাসিরুদ্দিন মাহ্মুদ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে আর ১৪৭৪ থেকে ১৪৭৬ পর্যন্ত সময় নিজের পুত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজস্ব করেছিলেন আর বাকি সময়টুকুতে (১৪৬০-১৪৭৩) তিনি এককভাবেই রাজত্ব করেছিলেন। বাংলাদেশে যুগ্মভাবে এরকম রাজকার্য পরিচালনার ঐতিহ্য আছে।

বারবক শাহ পণ্ডিত ছিলেন এবং গুণীর কদর করতে জানতেন। তাঁর শিলালিপিতে এর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 'অল-ফাজিল' এবং 'অল-কামিল' উপাধিপ্রাপ্ত ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিনি কবি ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন। 'গীতগোবিন্দ টীকা', 'কুমারসম্ভব টীকা', 'অমরকোষ টীকা', 'রঘুবংশ টীকা' রচয়িতা অসাধারণ পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকেও তিনি পৃষ্ঠপোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায় তিনি বারবক শাহের কাছ থেকে 'পণ্ডিত সার্বভৌম' উপাধি পেয়েছিলেন এবং অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে এই পণ্ডিতকে স্বর্ণালংকারে ভূষিত করে গঙ্গাজলে অভিষিক্ত করে ছত্র ও অশ্বের সঙ্গে 'রায়মুকুট' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে — ''শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামক বিখ্যাত বাংলা কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ বলিয়াছেন যে গৌড়েশ্বর তাঁহাকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়াছিলেন। এই গৌড়েশ্বরই বারবক শাহ। কৃত্তিবাসকেও যে গৌড়েশ্বর সম্মানিত করেছিলেন বলে তাঁর আত্মবিবরণীতে পাই তাকেও রুকনুদ্দিন বারবক শাহ বলেই মনে করেছেন সুকুমার সেন।

তাঁর পুত্র য়ুসুফ শাহ উচ্চশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ শাসনদক্ষ ছিলেন। আইন বিষয়েও সুপণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। স্বধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ছিল পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষও ছিল তাঁর। পিতার মতো এতটা উদার ছিলেন বলে জানা যায় না। ১৪৭৬-৮১ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয় যে ১৪৭৩-৭৪-এর পূর্বেই এই 'গুণরাজ খান' উপাধি যে মালাধর বসু পেয়েছিলেন তা রুকনুদ্দিন বারবক শাহ গৌড়েশ্বরেরই দেওয়া উপাধি।

১০.৮ ঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গুরুত্ব

যে বাঙালির 'কানু বিনা গীত নাই' — সে বাঙালির কাছে কৃষ্ণকথামূলক প্রথম এই ভাগবতানুসারী গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছিল। তার কিছু আগে আমরা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাট্যগীত পাঁচালিটি পেয়েছি। তার মধ্যে জয়দেবের প্রভাব আছে। লৌকিক নায়িকা রাধার সঙ্গে পৌরাণিক ধারারও মেলবন্ধন ঘটেছিল। এখানে পুরোপুরিই ভাগবত পুরাণকে অবলম্বন করে গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল বলে লৌকিক চরিত্র বলতে পারি না রাধাকৃষ্ণকে। যাইহোক অনেকগুলি কারণে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর গুরুত্ব মান্যতা পায়।

মধ্যযুগে বাঙালি জীবনকে অধ্যাত্ম চেতনায় রসসিক্ত করেছিল যে দুটি ধারা তার একটি রামকাহিনি। দ্বিতীয়টি কৃষ্ণকথা। দুটিই সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে। কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামপাঁচালি' 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়-এর পূর্বেই রচিত। যদিও শ্রীরামপাঁচালির রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রামাণ্য সাল তারিখ সমন্বিত পুথি। এর রচনাকাল মোটামুটিভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত এটি ভাগবতের অনুবাদ যে ভাগবতকে বৈষ্ণবরা উপনিষদ বলে মনে করে থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে এই শ্রীমদ্ভাগবত জনপ্রিয় ছিল। সংস্কৃতের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আনলেন তাকে মালাধর বসু রৌরব নরকে যাবার ভয়কে জয় করে 'লোক নিস্তারিতে'। তাঁর এই

মন্তব্য

অভিযানের জন্য যে কোনো সাহসী বীরের সম্মান প্রাপ্য।

তৃতীয়ত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম কোনো ভক্তের রচনা। বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস, পদাবলীর চণ্ডীদাস মূলত কবি। জয়দেব তাঁর শিল্পের জন্যই খ্যাতি লাভ করেছেন বলা যায়। কিন্তু মালাধর বসু প্রথমে ভক্ত, পরে কবি। চৈতন্যদেবের পূর্বে মালাধর বসুই ছিলেন একজন বড় ভক্ত ও তাত্ত্বিক। তিনি নিজের কবিত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে লেখেননি। লিখেছেন লোক নিস্তারের তাগিদে পাপীকে পুণ্যের ছোঁয়া দেবার জন্য।

চতুর্থত চৈতন্যদেব 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' পঙ্‌ক্তিটিকে বীজমন্ত্র মনে করেছেন। একটি কথায় তিনি তাঁর বংশের কাছে ঋণস্বীকার করেছেন। এই কথাটির ভাবার্থ অবলম্বন করে পরবর্তী বৈষ্ণব ধারায় ভক্তিভাবনা প্রসারিত হয়েছিল। মালাধরের সৃষ্ট এই পঙ্‌ক্তিটি চৈতন্যদেব প্রশংসিত। এই পঙ্‌ক্তিটি পরবর্তীকালে বৈষ্ণবদের কাছে প্রাণের ধন হয়ে উঠেছিল।

পঞ্চমত এই গ্রন্থটি অনুসারী সাহিত্য হলেও তৎকালের সমাজের কিছু ছবি পাওয়া যায়। দ্বারকা, বৃন্দাবন, মথুরার চিত্র কখন যেন বাংলার চিত্র হয়ে উঠেছে (পরবর্তী এককে ভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে)। তাঁর এই বাঙালিয়ানা কৃত্তিবাসের শ্রীরামপাঁচালিতেও আছে।

ষষ্ঠত সেই সময়ের লৌকিক আচার সংস্কার, ভাষা, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদিও শ্রীকৃষ্ণবিজয়-এ পাওয়া যায়। আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারও লক্ষণীয়। বিশেষ করে যেসব বর্ণনা তাঁর স্বাধীনভাবের রচনা সে সব স্থানে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বেশি পাওয়া যায়।

সপ্তমত তুর্কি আক্রমণের পরে বাঙালি হিন্দু সমাজ যখন সবদিক দিয়েই বিপর্যস্ত তখন একজন মহানায়কের সন্ধান করছিলেন তখনকার শিক্ষিত সচেতন ভাবুক মানুষ। মালাধর কৃষ্ণ চরিত্রকে জাতির সামনে সেই ঐশ্চর্যভাবে ভাবিত মহানায়ক রূপেই অঙ্কিত করলেন যিনি একাই একটি বিপর্যস্ত জাতিকে পথ দেখাতে পারেন। দলে দলে হিন্দুরা ভয়ে ভক্তিতে যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল, তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের পুনর্জাগরণ ঘটালেন মালাধর কৃষ্ণচরিত্রটির দ্বারা।

অষ্টমত যদিও গ্রন্থটিতে বৈধীভক্তির লক্ষণই বেশি দেখা যায় তবুও রাগানুগা ভাবের উল্লেখও মাঝে মাঝে তিনি করেছেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে যেন ইঙ্গিতে সূচিত করলে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবি।

নবমত এটি পয়ার ছন্দে পাঁচালির আকারে লেখা। যদিও মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যের মত এটিও গেয় কাব্য। এখানেও প্রচুর রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে তবুও মনে করা যায় সুর করে সম্ভবত পাঠ করা যেত এই গ্রন্থটি।

সবশেষে বলা যায় কাব্য-কৌশলের দিক থেকে গ্রন্থটি ততটা গুরুত্ব না পেলেও ভক্তিরসের দিক থেকে গ্রন্থটি তখন এবং এখনও ভক্তদের কাছে সমান জনপ্রিয়।

১০.৯ ঃ কবির কবিত্ব

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বৈষ্ণব সমাজের অতিপরিচিতি গ্রন্থ হলেও, বৃহত্তর হিন্দু সমাজে এর পরিচিত ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। কারণস্বরূপ বলা যায়, রামায়ণ মহাভারতের অসংখ্য পুথির মত এই কাব্যের অসংখ্য পুথি না পাওয়া। এই বিষয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত হল, ''বটতলা থেকে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একাধিক মুদ্রণ প্রকাশিত হয়নি। কেদারনাথ দত্ত ভক্তি বিনোদের সংস্করণ (১৭৮৬-৮৭ খ্রীঃ অঃ) ছাড়া শ্রীকৃষ্ণবিজরে আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। এ পর্যন্ত দু'খানি পুরাতন সংস্করণের সন্ধান পাওয়া গেছে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ প্রথম খণ্ড)। তবু ভাগবত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এই জনপ্রিয়তার বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। **প্রথমত** ঃ সমগ্র ভাগবতের শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ ভাগবতের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। **দ্বিতীয়ত** ঃ মধ্যযুগের আদিপর্বে একজন ভক্তের রচিত গ্রন্থ এটি। **তৃতীয়ত** ঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের এই উক্তি ''নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'' যা শ্রীচৈতন্যকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল এবং বিশেষ 'প্রাণনাথ' শব্দে পরবর্তী বৈষ্ণব সমাজ নতুনভাবে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিল।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটির 'বিজয়' শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে নানাজনের নানা মত। কারো মতে বিজয়ের অর্থ মৃত্যু বা মহাপ্রয়াণ। কেননা কাব্যটির পরিণতি শ্রীকৃষ্ণের কলেবর পরিত্যাগের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। কারো কারো মতে 'বিজয়' শব্দের প্রকৃত অর্থ হল দেবতার কীর্তি, বিজয়গৌরব, শোভাযাত্রা। তাই কাব্যটির 'বিজয়' 'শব্দটি' শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিকাহিনি কিংবা গৌরবগাথা অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। কাব্যটিকে কবি মালাধর কোথাও কোথাও 'গোবিন্দমঙ্গল' বলেও উল্লেখ করেছেন। এখানে মঙ্গল শব্দটি স্পষ্টতঃ মঙ্গল বিধায়ক দেবতার স্তুতি অর্থেই প্রযুক্ত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দের

কীর্তিগাথাই 'গোবিন্দমঙ্গল'।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বৈষ্ণবজনোচিত প্রেমভক্তির কারণে শ্রীচৈতন্যদেবের কাছ থেকে যে পরিমাণ প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল, কবিত্ব শক্তির কাছ থেকে ঠিক ততটা নয়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত হল, ''বিশাল ভাগবত পুরাণের কাহিনিকে সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশনের দিকে তাঁর অধিকতর দৃষ্টি ছিল, সচেতনভাবে কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেবার জন্য তিনি কলম ধরেননি।'' আর তাছাড়া কাহিনির অন্তর্গত সংগতির চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের পৌরুষ শক্তির প্রবলতা প্রদর্শনের প্রতিই কবির লক্ষ্য ছিল সর্বাধিক। তাই মূল ভাগবতের কবিত্ব সমৃদ্ধ অংশগুলি মালাধর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্জন করেছেন। অন্যভাবে বললে বলতে হয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় ভাগবতের গাম্ভীর্যপূর্ণ পংক্তিগুলির ধ্বনিঝঙ্কার ও প্রতিফলন আশা করা যায় না। তবে স্নিগ্ধ, কোমল ও পারিবারিক বর্ণনায় কবি কিছু দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। যেমন — ১০ম স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের রাসলীলার শুরুতে উপস্থিত গোপীগণকে স্বামীদের কাছে ফিরে যেতে বলায় তাদের বক্তব্য ভাগবতে এইরকম — '' পতিপুত্রাদি দুঃখদায়ক, তাহাদিগকে লইয়া কী হইবে ? অতএব হে পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে কমললোচন ! অনেকদিন হইতে যে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি তাহা ছেদন করিও না'' (পঞ্চানন তর্করত্ন অনুদিত)। এই অংশে মালাধরের বর্ণনায় কবিত্বশক্তিকে অস্বীকারের উপায় নেই —

'ছাড়িয়াত স্বামী পুত্র তেজি বন্ধুজন।
তোমাকে দেখিতে প্রাণ জাউক এখন।।
ছাড়ে ছাড়ুক স্বামী তারে নাহি বেথা।
তোমারে বিপ্রিয় বোল শুনি মনকথা।।'
'কি লাগি নিঠুর এত বল চক্রপাণি।
তোমাকে ভজিয়া মনে তেজিব পরাণি।।'

এই বর্ণনায় সাধারণ পাঠক দারুণ কিছু কবিত্ব শক্তির প্রমাণ পাবে না হয়তো। কিন্তু সে তুলনায় বৃন্দাবনলীলার বর্ণনা বেশ সরস। আর বিচ্ছিন্নভাবে কাব্যের বেশ কিছু অংশ উপভোগ্য ও সরস। যেমন — বহুকালপরে কৃষ্ণের সঙ্গে যশোদার মিলনে মায়ের অভিমান প্রকাশ এককথায় অনবদ্য —

'কেমতে পাসরিলে তুমি গোকুল নগরী।
কেমতে পাসরিলে সেই গোবর্দ্ধন গিরি।।
কেমতে পাসরিলে তুমি নদি সে জমুনা।
কেমতে পাসরিলে বাপু আসা দুই জনা।।'

কবিত্বপূর্ণ এইরকম বেশকিছু অসাধারণ বর্ণনা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটির মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। যেমন — শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রার পূর্বে গোপীগণের বিলাপ —

'আর না জাইব সখি চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে।।
আর না দেখিব সখী সে চাঁদ-বদন।
আর না করিব সখী সে মুখ-চুম্বন।।'
'অল্প ধনলোভে লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে।।'

কাব্যরসসমৃদ্ধ এইরকম কিছু পঙ্‌ক্তি বাদ দিলে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' যথার্থ অনুবাদমুখী সাহিত্য।

অনুবাদ প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের কাব্যধর্মের সঙ্গে কিন্তু মালাধরের মিল আছে। কৃত্তিবাসের মত মালাধরও লোকসাধারণের উপযোগী করে সংস্কৃত ভাগবতকে পয়ার ছন্দে অনুদিত করেছেন। কবি মূল ভাগবতের তত্ত্বসমৃদ্ধ অংশকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা ও আখ্যান অংশকে সম্প্রসারিত করেন। তাই প্রধান বিষয়ের বাইরেও প্রয়োজনবোধে অন্য বিষয়ের যেমন সংযুক্তিকরণ ঘটিয়েছেন, একইভাবে দরকার মতো মূল অংশেরও কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন কবি। প্রধান বিষয়ের অতিরিক্ত কিছু কাহিনি মালাধরের নিজস্ব স্বাধীন রচনা, কিছু হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ জাতীয় সংস্কৃত পৌরাণিক গ্রন্থ থেকে গৃহীত। তাই বলা যায়, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' সংস্কৃত ভাগবতের দশম ও একাদশ খণ্ডের আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ নয়, মূল রচনার স্বাধীন ভাষান্তর, ভাবানুবাদ। কবি কৃত্তিবাসের মতো মালাধর বসুও বাঙালির রসরুচির দিকে দৃষ্টি রেখে বাঙালির কাব্য করে তুলেছেন।

কাব্যরীতির ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে ভাষার কথা। পরবর্তীক্ষেত্রে ছন্দের বাঁধুনিতে তার একটি মূর্তি গড়ে ওঠে। কাব্যটির এই ভাষা ও ছন্দের প্রসঙ্গে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ অভিমত প্রকাশ

মন্তব্য

করেছেন, ''এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়। ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে ষোলো-সতেরো অক্ষরে বা বারো-তেরো অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়।'' এই বক্তব্য যথার্থ। তবে ছন্দের ব্যাপারে বলতে হয়, মালাধরের সময়ে পয়ারের মাত্রাজনিত নানা ত্রুটি ছিল। কবিকে এ ব্যাপারে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। অন্যদিকে প্রথাসিদ্ধ অলঙ্কারের পাশাপাশি বেশ কিছু অলঙ্কার প্রয়োগে কবি প্রতিবার স্পর্শ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি অলঙ্কারের উল্লেখ করা যায় —

১) 'পুন্নিমার চাঁদ জিনি বদন মণ্ডল।
খঞ্জন জিনিঞা শোভে নয়ন যুগল।।
পিতবস্ত্র পরিধান দেব বনমালি।
নূতন মেঝেতে পড়িছে বিজুলি।।'

২) 'চৌদিকে গোপিনিগণ মদ্ধে নন্দবালা।
পুন্নিমার চাঁদ জেন উদয় সোলকলা।।'

৩) 'লাঙ্গলের ঈস জেন দন্ত সারি সারি।
গিরিসম স্কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি।।'

৪) 'গারড়ের হেন জুদ্ধ সাথে সাথে করি।
বুকে বুকে রাক্ষসি ছন্দ অবতরি।।'

৫) 'কুটিল কুন্তল শোভে মস্তক উপরে।
আকাশ মণ্ডলে জেন রাহু সরোবরে।।'

৬) 'অচেতন হৈয়া দেবি পৃথুবিতে পড়ে।
কদলির গাছ জেন পড়ে অল্প ঝড়ে।।'

উপমা-উৎপ্রেক্ষা সমৃদ্ধ অলঙ্কারে কবির দক্ষতা সেই অর্থে বিশেষ কিছু নেই। তবে কবি একেবারেই নকলনবিশ এবং অক্ষম অনুকারী তা অবশ্য বলা যাবে না। আসলে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ বর্ণনায় মালাধরই বাংলা সাহিত্যের পথপ্রদর্শক কবি। এই বিষয়টিকে কাব্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করে পয়ার ত্রিপদী ছন্দে সাধারণের হৃদয়ানুকুল করে সহজ সরল ভাষায়, স্বতোৎসারিত আবেগে ও গীতিসুরের মূর্ছনায় তাঁর কাব্যটিকে অপূর্ব সুন্দর রসমূর্তি দান করেছেন। তাছাড়া 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভাগবতের অনুবাদ না হয়ে ভাবানুবাদ হওয়ায় কাব্যটি অনেকাংশে মালাধর বসুর মৌলিক রচনার স্পর্শ মণ্ডিত। কবি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে সরলতাকেই রচনা বৈশিষ্ট্য করে তুলেছেন।

১০.১০ ঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে ভক্তি ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ

চৈতন্যপূর্ব যুগে সারা ভারতেই বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রসার ঘটেছিল বলে অনেকেরই অনুমান। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ শূন্যতাবাদকে খণ্ডন করে ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে ব্রহ্মই সব। এই দৃশ্যমান পৃথিবী ব্রহ্মের 'বিবর্ত' বা ভ্রম মাত্র। পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্যের এই মায়া বা বিভ্রমবাদের মতকে খণ্ডন করেন ভক্তিবাদীগণ। তাঁদের মধ্যে রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধবাচার্য এবং আচার্যবল্লভ বা বল্লভাচার্যই প্রধান।

একাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের ভক্তিবাদী রামানুজ নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদকে বর্জন করে 'শ্রীভাষ্য' নামে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'-এর প্রবর্তন করেন। শঙ্কর ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নির্বিশেষ বলেছিলেন কিন্তু রামানুজ বললেন — ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। রামানুজের পরবর্তী আনুমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতকের নিম্বার্ক প্রথম শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর ও শ্রীরাধাকে তাঁর শক্তি বলে প্রচার করলেন — যার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁর মতবাদ 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' নামে খ্যাত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাধবাচার্যের উপাস্য লক্ষ্মীনারায়ণ। মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে তিনি অধিকারভেদ করেছেন। তাঁর মতে দেবতা, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণেরাই কেবল মুক্তি পেতে পারে। সংসারে আসক্ত অসুরভাবের মানুষেরা মুক্তি পায় না। তাঁর মতকে 'দ্বৈতবাদ' বা 'ভেদবাদ' বলা হয়। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বল্লভাচার্য বা আচার্য বল্লভ যে মত প্রচার করলেন, তা হল — বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ। তাঁর মতাবলম্বীদের বলা হয় 'রুদ্রসম্প্রদায়'। ইনি সনক সম্প্রদায়ের নিম্বার্কের মত শ্রীকৃষ্ণকেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পূর্ণব্রহ্ম বলে মনে করতেন।

চৈতন্য-পূর্ববর্তী এই বৈষ্ণবীয় ভক্তি-আন্দোলনের পটভূমিকাতেই রচিত হয়েছে মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটি। সারা ভারতে যাই হোক না কেন বাংলা দেশে তখনও বৈষ্ণব ভক্তিবাদ বা

বৈষ্ণবভক্তিকে কেন্দ্র করে কোনো বিশেষ মতবাদ দানা বেঁধে ওঠেনি তবে ভাগবতের চর্চা হত সব জায়গাতেই। অদ্বৈতাচার্য, মাধবেন্দ্র পুরী, নবদ্বীপের শ্রীবাস নাম-কীর্তন করতেন চৈতন্যপূর্বকালে। তা থেকে অনুমিত হয় সংখ্যায় তাঁরা বেশি ছিলেন না এবং চৈতন্যভাগবতের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় অন্য ধর্মাবলম্বীরা তাঁদের হেয় করতেন। মনের দুঃখে অদ্বৈতাচার্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের জন্য নিষ্ঠাভক্তিসহ হুংকার দিতেন। তাই মালাধরের কাব্যে ভাগবত-বর্ণিত বৈধীভক্তিই লক্ষ করা যায়। গ্রন্থের বিষয় নির্দেশ অংশে কবি বলেছেন —

'গোসাঞীর জন্ম কর্ম্ম কে কহিতে পারে।
লোকহিত কারণে জাতক অবতারে।
আকাসের তারা যদি একে একে গণি।
সমুদ্রের জল জদি ঘটে পরমাণি।
পৃথুবির রেণু জদি করি এ গনন।
তবু ও বলিতে নারি কৃষ্ণের করণ।।'

কৃষ্ণের চরিত্র একমনে শুনলে কলির ঘোর তিমির বিমোচিত হবে এবং 'ভবসিন্ধু তরিবারে এই মাত্র ভেলা' মনে করেন কবি। যমরাজও সবিনয়ে কৃষ্ণকে বলেছেন —

'তোমার স্রীজিত স্রীষ্টি তুমি অধিকারী।
আমার সকতি কীছু করিতে না পারি।।
কর্ম্মসূত্রে আইসে জাত্র জত কর্ম্ম করে।
সাক্ষি রূপে আমা এড়িয়াছ গদাধরে।।'

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ কৃষ্ণলীলা অবসানের পর মর্মাহত অর্জুনকে ব্যসদেব যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেখানেও কৃষ্ণকে 'সর্ব্বভূতসম' এবং 'সর্ব্বধর্ম্মময়' বলা হয়েছে এবং তিনিই যে সংসারের কারণ এবং তিনিই তেজ, বল, পরাক্রম, ভালোমন্দ, 'সভাকার আত্মা তিঁহ', তিনিই 'উতপতি প্রলয়' — এরকম বলা হয়েছে'। এসব বিবরণে আমরা প্রাক্‌চৈতন্য যুগের সাধারণ ভাগবতাশ্রয়ী বিশুদ্ধ ভক্তিবাদটিই লক্ষ করি।

চৈতন্যপরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের সঙ্গে ভাগবতীয় ভক্তিবাদের মূলগত পার্থক্য থাকলেও মালাধর কোথাও কোথাও বৈষ্ণব জনোচিত বিনয় প্রকাশ করেছেন এবং অনুরাগমূলক গৌড়ীয় ভক্তির আত্মনিবেদনটিও প্রকাশ করেছেন।

'দন্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঞী।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।।'

''কৃষ্ণবিপ্রনারী সংবাদ'' অংশে (মূল ভাগবতেও আছে) দেখি — ক্ষুধার্ত গোপবালকেরা যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের কাছে অন্নপ্রার্থনা করলে তারা বালকদের ফিরিয়ে দেন কিন্তু ব্রাহ্মণের স্ত্রীগণ বহুখাদ্য অন্ন ইত্যাদি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং কৃষ্ণের শরণাগতি প্রার্থনা করলেন।

'গৃহন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরো সুতা বা
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎ প্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাংনো
নান্যা ভবেদ্গতিররিন্দম তদ্বিধেহি।।'
(ভাগবত ১০/১৩/৩০)

— অর্থাৎ আমাদের পতি, পুত্র, বন্ধু, ভ্রাতারা আমাদের আর গ্রহণ করবেন না। অন্যদের আর কী কথা। অতএব শত্রুদমন, আপনার চরণে পতিত হলাম। আমাদের অন্য গতি নেই।

এখানে রাধা এবং গোপীদের বিশুদ্ধ নির্মল প্রেমভক্তির স্বরূপটি লক্ষ করা যায় কিন্তু, মালাধর এর মধ্যে ঐশ্বর্যভাব মিশিয়ে ঐশ্বর্যমিশ্রাভক্তির ভাবে অংশটি বর্ণনা করেছেন —

'যুনিঞা সিযুর বানি সকল রমণি।....
আজি হইতে প্রসন্ন হইলা দিনমণি।।
ভারাবতারণে কৃষ্ণ আপনে অবতার।
মাগিঞা পাঠাইল অন্ন শৃষ্টি করতার।।.....'

নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন সাজিয়ে সবাইকে নিয়ে তারা যাত্রা করল।

'কথা জাহ কথা জাহ করিঞা উচ্চরায়।
সাযুড়ি সযুড় নিসধে বাপ মায়।।
সে সব বচন কেহো কানে না যুনিল।
ধরা ধরি এড়াইঞা সত্তরে চলিল।।'

মন্তব্য

— তাদের তখন রাধার মতই অবস্থা। পরিবার পরিজন, লোকলজ্জা পরিহার করে তারা ছুটে এসেছেন। বলেছেন —

'কি করিব স্বাঁমি পুত্র আর বন্ধুজনে।
কি করিব ধনজন সব অকারণে।।
তুমি স্বাঁ মি তুমি প্রভু তুমি বন্ধুজন।
তোমার স্মঁরণে ঘুচে সকল বন্ধন।।
তোমা না ভজিলে প্রভু নহে কারো গতি।
তোমার চরণে কিছু করিয়ে প্রণতি।।'

— এভাবে তারা কৃষ্ণকে 'অভয়সরণ', 'তাপ-সব বিমোচন' 'দেবের দেবতা প্রভু ত্রৈলোক্য ইস্বর' ইত্যাদি ঐশ্বর্যভাবের বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। কৃষ্ণ ও তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। বর দিয়ে বলেছেন — 'না এড়িব স্বাঁমি তোমার পুত্র বন্ধু পতি' এবং 'আমার প্রসাদে গতি হব ভাল স্থানে'।

কৃষ্ণকথার সঙ্গে বংশীধ্বনির অমোঘ যোগের দ্বারা মধুর রস সৃষ্টির একটি আবহ তিনি কোথাও কোথাও রচনা করেছেন। বাঁশির স্বরে ব্যাকুলা গোপীরা কৃষ্ণের কাছে এসে ঘিরে দাঁড়ালে তিনি তাদের গৃহে ফিরে গিয়ে পতি পুত্রদের সেবা করতে বললেন তখন 'বিপ্রিয়' (অপ্রিয়) কথা শুনে গোপীরা হেঁট মুখে কাঁদতে লাগলেন।

'স্তন বাহিয়া আঁখির জল পড়ে ভূমিতলে।
বসন মহিন (মলিন) হৈল নয়ানের জলে।।
কি করিব কি বলিব অনুমান করি।
পদাঙ্গুলি ভূমে লিখি বলে ধীরি ধীরি।।'

— গোপীপ্রেমের আর্তি ও শরণাগতির চিত্রটি বড় সহজ সরলভাবে ব্যক্ত করেছেন কবি।

শুধু গোপীরাই নয় মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যেও বংশীধ্বনি শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ পেল। 'মউর পক্ষ' তুলে নাচতে লাগল। বৃন্দাবনের যত শুষ্ক বৃক্ষ ছিল, 'বংসির নাদে ফুল ফল ধরে তরুগণে।'

কৃষ্ণ মুক্তিদাতা বা মোক্ষলাভের জন্য কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন — এ কথা পরবর্তী চৈতন্যযুগে একেবারে অচল। তাঁদের কাছে — 'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান' কিন্তু মালাধর বারবার বলেছেন —

'হেন কৃষ্ণ চরিত্র নর যুন একমতি।
সংসারের সুখ পাবে মোক্ষ মুকতি।'

— এমনকি পুনর্জন্ম নাশের জন্য তিনি কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানান। কৃষ্ণের কথা শুনলে যে 'অন্তকালে মুক্ত হয়' — এটাই কবির বিশ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঠের ফলশ্রুতির মধ্যেও তিনি

'সূক্ষমমোক্ষ দুই হত্র তাহার সুনিলে।
ইহা বই ধন নাহি এই কলিকালে।।'

— একথা বলেছেন এবং যুগপ্রচলিত ধারণায় বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে বিযোদগারও করেছেন —

'পাসণ্ড নিন্দকজনে কভু না সুনাইহ।
জোড় হাতে বলো মুঞি বচন রাখিহ।'

— পরবর্তীকালের রচনা চৈতন্যভাগবতেও এই প্রবণতা আমরা লক্ষ করি।

মালাধরের শান্তভক্তিরসাশ্রিত কাব্যে দাস্যভাবের ভক্তিও লক্ষ করা যায় — বকাসুর বধের শেষে ভণিতায় কবি বলেছেন — 'যুনিয়া কৃষ্ণের কথা সভাতে তরাস।
গুণরাজ খানে বোলে নারায়ণের দাস।।'

অযাসুর 'কুড়ি জোজন দির্ঘে দেখিতে ভয়ঙ্কর'। তাকে তিনি যখন নিধন করে মুক্তি দিলেন ভক্ত কবি মালাধর বলছেন —

'গোসাঞী পরমে মইল পাপিষ্ঠ অযুরে।
ধর্মাধর্ম ক্ষয় করি সাম্ভাইলা সরিরে।।....
প্রভুর চরিত্র কেবা বিচারিলে পায়।
বৈরভাব ধরি অযুর মুক্তিপদ পায়।।
একচিত্ত মনে জদি ভজি নারায়ণ।
পরম ভকতি লভে কহিল কারণ।।'

— এখানে যদিও কৃষ্ণের স্পর্শে অযাসুর বৈরিতার পথেই মুক্তি পেল কিন্তু কবি নিজে কিন্তু মোক্ষ বা মুক্তি চাননি তিনি চেয়েছেন 'পরমভকতি'।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কৃষ্ণকে বন্দনা করে বলা হয়েছে —

'তোহ্মে সূর্য তোহ্মে চন্দ্র তোহ্মে দিকপাল।
লীলাতনু ধরি এঁভে হইলাহা গোআল।।'

— ঠিক এই সুরেই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কালিয়নাগ দমন করার পর কৃষ্ণকে জল থেকে উঠে আসার সময় বলরাম তাঁকে স্তুতি করে বলেছেন — 'তুমি দেব নিরঞ্জনে সৃষ্টি স্থিতি কারণ।/ তুমি প্রভু সংসারের সার।' দুটি গ্রন্থেই চৈতন্যপূর্বযুগের বৈদিক দেবতাদের ধারণার সঙ্গে অভিন্ন কৃষ্ণ-বিষ্ণু ধারণার মেলবন্ধন ঘটতে দেখা গেল।

এই গ্রন্থে পরিবেশিত ভক্তিবাদের মূলতত্ত্ব যাই থাকুক না কেন, পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব যে কথাটির জন্য মালাধরের বংশের কাছে ঋণস্বীকার করেছেন (এইবাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ) সেই অমর বাণীটি হল — 'বসুদেব সূত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' (চৈতন্য চরিতামৃত-তে আছে — 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ')। এই বাণীটি পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। যদিও রাগানুগা ভক্তির জোয়ারে ভাগবতের ভক্তিবাদ খানিকটা কম জনপ্রিয় হতে পেরেছিল তবু এ কথা বলা যায় যে — মালাধরের গ্রন্থটির সাহায্যে কৃষ্ণলীলা পুরাণগুলির সঙ্গে বাঙালির প্রথম পরিচয় ঘটেছিল। চৈতন্যের জন্মের পূর্ব থেকেই মাধবেন্দ্রপুরী যেমন বাঙালি জনসমাজকে ভাগবতের প্রচারের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন, মালাধরও লিখিতরূপে কৃষ্ণলীলাকে জনপ্রিয় করতে পেরেছিলেন।

তুর্কি আক্রমণের পরে বাঙালি সমাজে ইসলাম ধর্মের আগ্রাসী প্রভাবে হিন্দুধর্মের মধ্যে যখন ভাঙন ধরেছিল তখন এমনই এক উজ্জ্বল চরিত্র (কৃষ্ণ) তুলে ধরে বাঙালি সমাজকে কবি একটা পথের দিশা দেখাতে পেরেছিলেন এবং হিন্দুধর্মীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতে পেরেছিলেন এই কথাগুলি বলে — কৃষ্ণকে ভজনা করলে 'সংসারের সুখ' পাবে এবং মুক্তিও পাওয়া যাবে। কৃষ্ণকথা শুনে মন নির্মল হবে। 'ঘরে বসি পাবে নর সব তির্থের ফল' ইত্যাদি।

কৃষ্ণের মৃত্যু জরা ব্যাধের শরাঘাতের মতো একটি অতি সাধারণ কারণে হলে, তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে —

'বুঝাইল সংসারে গোসাঞি জগত অস্থির।
না করহ মোহবন্ধ জেই হএ ধির।।
সুনহ সকল লোক বুঝহ ভাবিয়া।
হরি বীণু কিছু নহে সব তাঁর মায়া।।'

— এইভাবে নিজের শরীরে জন্ম-মৃত্যু ধারণ করে সকলকে তিনি একথাই বোঝাতে চাইলেন — জন্ম-মৃত্যুর অধীন অনিত্য এ জীবনের যতটুকু সময় আছে, সেটুকুতেই 'ধর্মে দেহ মন'। চৈতন্যপূর্ব যুগে একমাত্র মালাধরই সেই কবি যিনি কৃষ্ণভক্তির দ্বারা বাঙালি জনজীবনকে ভক্তিধর্মে দীক্ষিত করে তার সাংস্কৃতিক জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যের ভাববাদী আন্দোলনের জন্য তিনি যেন প্রেক্ষাপট রচনা করে গিয়েছিলেন।

১০.১১ঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে বাংলা ও ভাঙালি মানসিকতা

চৈতন্য পূর্ববর্তী দুটি গ্রন্থ — কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালি' এবং মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভক্তিরসের আধারেই রচিত হয়েছে। মূল রামায়ণ ও মূল ভাগবত-এর অনুবাদ হলেও গ্রন্থদুটির মধ্যে কবিদের মৌলিকতা ধরা পড়েছে। তখনকার কোনো অনুবাদই শব্দানুবাদ নয় — ভাবানুবাদও ঠিক বলা যায় না। তাই এদের অনুসারী সাহিত্যই বলা উচিত। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের মুসলমান ধর্মের আগ্রাসী ভূমিকার সামনে পুরাণের দুই মহাপুরুষকে (রাম এবং কৃষ্ণ) আবির্ভূত করিয়ে বাঙালি জনজীবনকে কতটা উদীপ্ত করতে চেয়েছিলেন সেই যুগের এই দুই কবি — তা নিয়ে সমালোচকদের মতানৈক্য আছে। কিন্তু দুজনেরই জন্মভূমি যে বাংলা দেশ এবং দুজনই যে বাঙালি, সে মানসিকতা কিন্তু দুটি কাব্যেই প্রকাশ পেয়েছে। পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্চর্যভাবে ভাবিত হলেও যে ভক্তিরসের প্রাধান্য ভাগবতে আছে তা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এও আছে। তবু কবি যখন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করেন, বা তাঁর ঐশ্চর্যমূলক নানা ঘটনার বর্ণনা করেন সেসব ঘটনার প্রেক্ষাপট, পরিবেশ, ছোটখাটো বস্তুনির্দেশের মধ্যে মালাধরের বাঙালি মানসিকতা ধরা পড়েছে।

মন্তব্য

বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ভাত কিন্তু কৃষ্ণের জীবনের প্রেক্ষাপট ভারতের যে অঞ্চলের, অর্থাৎ বৃন্দাবন, দ্বারকা, মথুরা সে অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত নয়। মালাধর নিজের ভৌগোলিক সীমানায় যেন নিয়ে এসেছেন কৃষ্ণের দেশকে। যশোদা ক্রীড়ারত বালক কৃষ্ণ বলরামকে ডেকে বলছেন —

'আইস বাপু বলরাম কানাঞিত লইয়া।
ভাত খায়্যা পুনরপি খেলাহ আসিয়া।'

অঘাসুর বধের পর ক্ষুধার্ত কৃষ্ণ সখাদের বললেন —

'সুন ভাই খুধা বড় পাইল আমারে।
সিকা মুকাইয়া ভাত খাই জমুনার তিরে।'

এবং কৃষ্ণ সমস্ত সখাদের 'ভাত বাঁটিয়াও দিল' — অর্থাৎ সবাইকে (গোপ বালকদের) ভাত ভাগ করে দিলেন। যে কোন খাদ্যের কথা প্রসঙ্গেই 'ভাত'-এর কথা এসেছে। ঋষিদের যজ্ঞে গোপবালকদের কিছু খেতে দেওয়া হল না। তারা বিফল মনোরথ হয়ে বললো — 'না সুনিল বোল কেহো না দিলেক ভাত'। মিষ্ট, অন্ন, পান ছিল অতিথি সৎকারের প্রধান উপকরণ। তাছাড়া দধি, ঘোল, দুগ্ধ, ঘৃত, চিপিটক, পরমান্ন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যেরও উল্লেখ রয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রাত্যহিক জীবনের বর্ণনাতেও পাই বাঙালি জীবনের ছাপ —

'দন্তধাবন কৈল জলসন্নিধানে।
শ্রান তর্পণ কৈল দেবের বিধানে।।'

বৃন্দাবনের বর্ণনা দেখলে মনে হবে কবি যেন বাংলা দেশেই আছেন। বিদর্ভ দেশের রাজকন্যা রুক্মিনীর স্বয়ংবর সভায় সাজানো হয়েছে — 'দ্বারে দ্বারে কথা রূইল গোবাক সুন্দর' — বাংলাদেশের মতোই দ্বারে দ্বারে কলা গাছ, সুপারি গাছ রোপণ করে। মথুরাতেও কৃষ্ণ দেখলেন — 'গোয়া নারিকেল দেখি দুয়ারে'। বৃক্ষের তালিকাতেও বাংলাদেশের গাছপালারই নাম আছে — পাকুড়, তাল, শিমুল, পলাশ, অশ্বত্থ, হেন্তাল, নারকেল, অর্জুন, কামরাঙা, গুয়া ইত্যাদি। ফুলের তালিকাতেও তুলসী, মালতি, জাতি, পদ্ম, কনকচাঁপা, কুমুদ প্রভৃতির নামও লক্ষণীয়।

কোনো কোনো বিবাহ বাসরের (মদ্ররাজকন্যা লক্ষ্মণার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ) রীতিনীতি, সাজসজ্জা, উলুধ্বনি, জয়ধ্বনি, স্ত্রী আচার, গীতবাদ্য, সিন্দুর ব্যবহার, সপ্তপদাগমন ইত্যাদি বাংলাদেশে প্রচলিত বিবাহের অনুরূপ বলে মনে হয় —

'নাছে বাটে হাটে ঘাটে মঙ্গল হুলাহুলি।
চতুর্দিকে জয়ধ্বনি সুনি কুলকুলি।।'

জাত-পাত মানা, জল-অচল ভেদ মানা, শূদ্রকের ঘৃণা করা — বঙ্গীয় সমাজের এসব বিধি নিয়ম ছুঁৎমার্গের কথা মালাধর ভুলে যাননি। তাই জরাসন্ধ কৃষ্ণবিদ্বেষী বলে বিদর্ভরাজা ভীষ্মক যখন কৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ দিতে যাচ্ছেন তখন বলেছেন —

'তুমি ত বংসজ রাজা জগতে ঘোষ এ।
তারে কন্যা দিতে কেন তোমার মন লএ।।'

— অর্থাৎ গোয়ালা কৃষ্ণের সঙ্গে উচ্চবংশজ রাজকন্যার কিভাবে বিবাহ সম্ভব।

এই জাত-পাতের বিচারে মুনি-ঋষিরাও কম যান না। ভৃগুমুনিকে শিব আলিঙ্গন করতে গেলে ভৃগু বলেছেন — 'প্রেত পিসাচ ভুত তোমার সঙ্গে বৈসে। / ব্রাহ্মণ ছুঞিতে আস্য কেমত সাহসে।।'

নিচুজাত থেকে উঁচুজাতে যে ওঠা যায় (বঙ্গীয় সমাজে প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে) সে প্রসঙ্গটিও আছে। মথুরার যে মালী কৃষ্ণকে পুষ্পমাল্য দিয়েছিল সে কৃষ্ণের বরে 'জল-চল' জাতি রূপে পরিগণিত হয়েছিল —

'উত্তম জাতি হৈল মালি কৃষ্ণের বরে।
জল আচরএ জেন সংসার ভিতরে।।'

রজক, মালাকার, মৎস্যজীবী, পশু-শিকারী (আখেটি) প্রভৃতি জাতি দিয়ে সাজানো সে যুগের নগর / গ্রামকে বাংলার গ্রামের বিন্যাসকে মনে করায়। কৃষ্ণ যেহেতু গোয়ালা জাতির প্রতিনিধি তাই গোপপল্লির কথা বেশি আছে। তাদের গোপালন, দুগ্ধদোহন, দুগ্ধজাত-অন্যসামগ্রী তৈরি করা, দধিমন্থন করতে করতে কৃষ্ণলীলার গান গাওয়া, একটি সুখের বাংলার পল্লিচিত্রকে মনে করায়। বঙ্গদেশীয় পদ্ধতিতে বানানো ঘরের 'বিচিত্র চৌখণ্ডি ঘর দেখিতে সুন্দর' — চিত্রটিও উল্লেখযোগ্য।

কিছু কিছু উপমা-র মধ্যেও বাঙালি জীবনের ছায়া পড়েছে। পুতনা যখন সুন্দরী রমণীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করে স্ব রূপে মারা গেল — তখন সবাই দেখতে পেল ছয়ক্রোশ জুড়ে পড়ে থাকা তার দেহ। তার 'উদর গোটা দেখি জেন যুখান পোখরি' আর 'লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি'। এখানে

লাঙ্গলের ফলা এবং 'যুখান পোখরি' বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের কথা স্মরণ করায়। শস্য পেষাই করা হত উদুখলে। অনেক জায়গায় তারও উল্লেখ রয়েছে। কেশীদৈত্যকে বধ করার পর সেই দৈত্য যখন ভূলুণ্ঠিত হল — তখন কবি বললেন — 'ফুটি কাঁকুড়ি জেন হৈল খান খান' — এই ফুটি ও কাঁকড় ফলের উল্লেখ বাংলা দেশের পরিবেশকেই মনে করায়। মন্তব্য

আর একটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে — মূর্ছিতা রুক্মিনীর সঙ্গে তুলনা দিলেন কবি —

'কদলির গাছ যেন পড়ে অল্প ঝড়ে'। কৃত্তিবাস ও সীতার ক্ষেত্রেও এমন উপমা দিয়েছেন —

'জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।' ভরতের ক্ষেত্রেও কৃত্তিবাস বলেছেন —

'ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সে ক্ষণে।
কাটিলে কদলী যেন ভূমিতে লোটায়।।'

যোগমায়া যশোদার গর্ভে ভূমিষ্ঠ হয়ে 'উঙা উঙা করিয়া কান্দ-এ কন্যাখানি' — এ যেন পল্লি বাংলার কোনো আঁতুর ঘরের চিত্র।

বাংলাদেশ ভারতের বাইরে নয়। তাই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ উল্লেখিত চিত্রগুলি হয়তো সর্বভারতীয় কিন্তু বিশেষভাবে দেখতে গেলে এগুলি বাংলার চিত্র বলে মনে করলে ভুল হবে না। কবি যেহেতু বাঙালি বাংলা দেশের জলহাওয়ায় বড় হয়েছেন তাই তাঁর কল্পনায় দ্বারকা মথুরা নিজেরই অজ্ঞাতে বাংলার রূপ হয়ে ফুটে উঠেছে।

১০.১২ঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে বর্ণিত সমাজচিত্র

সর্বভারতীয় মহামানব কৃষ্ণ। এভাবেই ভক্তরা ও কবিরা তাঁকে দেখেছেন। তাঁর জীবনচরিত সাধারণ মানুষকে উপহার দেবার জন্য মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেছেন। সমাজের সংস্কৃত-না-জানা অসংখ্য মানুষ এই মহামানবের জীবনী জানতে পারেন না — এ দুঃখে এবং 'লোক নিস্তারিতে' তিনি নরকে যাবার ভয়কে উপেক্ষা করে বাংলা ভাষায় প্রথম এই অনুসারী কাব্যটি রচনা করেছেন। তৎকালের সমাজের প্রতি তাঁর এই দরদ অনস্বীকার্য। কবির সমাজমনস্কতার একটি বিরল দৃষ্টান্ত তাঁর এই কর্মের মধ্য দিয়েই বোঝা যায়। পুরাণ নির্দিষ্ট কলিকালের মুসলমান অধ্যুষিত বাংলা দেশের বাঙালি জাতির 'ঘোর তিমির জাতে বিমোচনে'র জন্য তিনি কলম ধরেছেন। এমন মানুষের হাতে লেখা কাব্যে সমাজচিত্র যে পাওয়া যাবে — এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কোন্ সমাজ কৃষ্ণের এবং কোন সময়েই বা তাঁর জন্ম ? কৃষ্ণকথামূলক পুরাণগুলি থেকেই কবি তাঁর উপজীব্য বিষয়কে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন পুরাণে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে কবি সে সময়ের কথাই বলেছেন। ভাগবতের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় দশম শতক কৃষ্ণের কালের (সুপ্রাচীন যুগের), নবম দশক শতকের এবং কবির কাল চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকের সমাজচিত্র এখানে পাওয়া যাবার কথা। তাই বিশেষ কোনো সময়ের বা কালের কথা এখানে নেই। কবির নিজের সময়ের কথাও এখানে এসেছে। কৃত্তিবাস 'শ্রীরাম পাঁচালি' লিখতে গিয়ে যেমন আঞ্চলিক ভাব ও রসে সমৃদ্ধ করেছেন, মালাধরও 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর মধ্যে তৎকালীন বাঙালি ঐতিহ্য বাংলা দেশের সমাজচিত্র সর্বভারতীয় কৃষ্ণকথার সঙ্গে মিশিয়ে ছিল। আমরা তারই কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরবো।

মধ্যযুগের বাংলার সমাজচিত্র মঙ্গলকাব্যগুলিতে যতবেশি ও যত পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল, এখানে ততটা পাওয়ার সুযোগ নেই — তাও আমরা কৃষ্ণের গোপসমাজ এবং কবির কায়স্থ সমাজকে কেন্দ্র করে যেন গোটা সমাজেরই বিস্তৃত পরিচয় পাই।

গোটা সমাজ বিভক্ত ছিল বেদবিহিত চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের দ্বারা। চার বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলা হত। বিশেষ করে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কেউ বিরোধ করত না — 'ব্রাহ্মণে বিরোধ নাহি দ্বারকা নগরে'।

কৃষ্ণ গোপ সমাজের সন্তান। গোপ সমাজের চিত্র বেশি বিস্তৃত ও উজ্জ্বল রূপে ফুটে উঠেছে। গো পালন তাদের জীবিকা। অনাবৃষ্টির কারণে তৃণভূমি যখন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তখন নন্দী প্রমুখ গোপপল্লির প্রধানেরা বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রকে আরাধনা করার কথা ভাবলেন।

'গোআল জাতি আমি করি গোপোসন।
ভালমতে তৃণ হৈলে জিএত গোধন।।
বিনি বৃষ্টে ঘাস নহে যুন দামোদর।
বৃষ্টের ইস্বর হয়ে দেব পুরন্দর।।'

কিন্তু তার পিতাকে বোঝালেন যে ইন্দ্র কখনো বৃষ্টি বর্ষণ করেন না। এই পৃথিবী যিনি সৃষ্টি

মন্তব্য

করেছেন তিনিই একমাত্র পারেন বৃষ্টি আনয়ন করতে

'গোসাঞী শৃজিল শৃষ্টি গোসাঞী অসতারে।....
গোযালা জাতি আমি অরণ্যেত ঘর।
সহায় আছেন গোবর্দ্ধন গীরিবর।।'

—শেষপর্যন্ত তারা গোবর্ধনের পুজো করে সমস্যার সমাধান করেছিলেন। এরকম বিপদ-আপদ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে তারা গ্রাম ত্যাগও করতেন। নিজের পুত্র কৃষ্ণের মধ্যে অলৌকিকতার নানা লক্ষণ দেখা গেলে এবং কংসের ক্রোধ এবং হিংসা বেড়ে গেলে নন্দ প্রমুখ গোপপ্রধানরা ভয় পেলেন। তারা যুক্তি করে ঠিক করলেন অন্য কোনো দেশে যাবেন যেখানে তার 'ছাত্তাল কানাঞী'কে কেউ হিংসা করবে না। সবাই ঠিক করলো এবং যাত্রা শুরু করলো —

'ছাড়িঞা গোকুল বৃন্দাবনকে চলিল।
সকল গোআল মেলি এক মেলি হৈল।।
জত গোপ সব সভে একত্র হইঞা।
সকটে চড়িঞা জাত্র সিঙ্গা বাজাইঞা।।'

—এ যাত্রাতে ভিটে মাটি ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা নেই। তাদের পেশাগত কারণে এরকম করেই হয়তো তারা স্থান ত্যাগ করতো। বিশেষ করে নতুন জায়গায় নতুন উদ্যমে তারা যেভাবে বাড়ি ঘর বানাতে লাগলো যাতে মনে হচ্ছে — সুখ স্বস্তি ও শান্তি পাবার ভবিষ্যৎ কল্পনায় তারা মত্ত —

'বান্ধিল গোপের ঘর বিবিধ প্রকারে।
গাছপালা রূপিল সব উত্তম নগরে।।
গুবাক নারিকেল রূপিল মনোহর।
আম্র কাঁঠাল সব দেখিতে সুন্দর।।
নানাবিধ প্রকারে ঘর দেখিতে যুঠান।
বিচিত্র নির্মাণ গিরি দেখিতে যুঠান।।
নন্দখোস পুরি মহারাজের সমান।
তাহার নিকটে কৈল বিচিত্র উদ্যান।।'

—বন কেটে বসত স্থাপন বা কোনো নগর নির্মাণের প্রাথমিক চিত্রটির পরিচয় আমরা পেয়ে যাই।

গোপপত্নীরা দুগ্ধজাত দ্রব্যদি প্রস্তুত করতো। দধি, ঘৃত ইত্যাদি তৈরি করার সময় কৃষ্ণলীলা গান গাইত। অত্যন্ত বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন মালাধর দৃশ্যাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগে —

'আপনে মথত্র দধি করে ছরছর।
গীত বন্ধে গাএ জত কৈল গদাধর।।'

রাজার ধোপার মেজাজ ভারি। পথে দেখা হতেই কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই তার কাছে 'উত্তম বসন' চাইলে রুষ্ট হয়ে রজক দুই ভাইকে দু-চার কথা শুনিয়ে দিল —

'বনে থাক গরু রাখ না বুজহ কথা
কোন কালে নাহি দেখ রাজার বেবস্থা।।
ডোমকোলা হেঁন বাঁসি বাহ কুলি কুলী।
গোআল বালক সঞা কর কুতূহলী।।'

—গোয়ালা বলে রজকও তার বৃত্তি নিয়ে দু'কথা শুনিয়ে দেয় যেহেতু সে রাজার বাড়ির ধোপা।

মালাকাররা ফুল, মালা নানারকম ভোগ-তাম্বুল রাজবাড়িতে যোগান দিতো — বিক্রি করতো। গন্ধ, আতর, কুঙ্কুম, কস্তুরি ইত্যাদিও যোগান দিত এক সম্প্রদায়। কবজি এই সম্প্রদায়েরই নারী। কোন কোন স্ত্রীলোক ফলও বিক্রয় করতো। মৎস্যজীবী পশু শিকারী (আখেটি) প্রভৃতি জাতিরও উল্লেখ আছে এই গ্রন্থে। কৃষি প্রধান পল্লীগ্রামে বিস্তৃতভাবে চাষবাসের কথা না থাকলেও লাঙ্গল, হাল, ফাল, ঈশ, উদুখল প্রভৃতির ব্যবহারের নানা নিদর্শন পাওয়া যায়।

সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির কথা এখানে মঙ্গলকাব্যের মতো বিস্তৃত আকারে না পাওয়া গেলেও নানা প্রসঙ্গে এসব রীতিনীতির কথা আছে। সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল এসব সংস্কার।

বৈদিক নিয়ম মতেই নবজাতকের সংস্কার করা হতো। কৃষ্ণের জন্ম লগ্নে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় মতে গ্রহণক্ষত্রের অবস্থানের কথা মালাধর উল্লেখ করেছেন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী শুভ তিথিতে

রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত অর্ধ-যামিনীতে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তখন অন্যান্যগ্রহের অবস্থানের কথাও বলেছেন। কৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করলেন নন্দঘোষ ব্রাহ্মণদের 'কুড়ি সহস্র ধেনু' দান করে। এই উপলক্ষে রাজাকেও উপঢৌকন দান করার কথা আছে। শকট পূর্ণ করে দুগ্ধ, দধি, ঘোল ইত্যাদি নিয়ে কংসের রাজসভায় যাওয়ার চিত্রও আমরা দেখতে পাই —

'ঘোষনাত দিল নন্দ সকল নগরে।
কর লঞা কালি জাব রাজার দুআরে।।
কোটাল জাইঞা কহিল ঘরে ঘরে।
যুনিঞা সকল গোপ সাজিল সত্তরে।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল সকল পুরিঞা।
নড়িলাত সব গোপ হরষিত হঞা।
কর লঞা মেলানি দিল কংস নৃপবর।'

বিবাহও নানা ধরণের ছিল। সাধারণ মানুষ সুশীলা সদ্‌বংশজাত কন্যাই কামনা করতো — যে কন্যা স্বামী বা পরিজনদের সঙ্গে মধুর বচন বলবে এবং নম্র সভ্য হবে — পুরাণের কালে স্বয়ংবর বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণ ও বলরামের বিবাহ স্বয়ংবর প্রথা মেনেই হয়েছিল। কৃষ্ণ বহুবিবাহ করেছিলেন। তাঁর পরিণীতা পত্নীর সংখ্যা বিংশতি সহস্র। পিতৃকুলকে পরাজিত করে কন্যাকে লাভ করার নাম ক্ষাত্রবিবাহ। সুভদ্রা-অর্জুড়, কৃষ্ণ-রুক্মিনীর বিবাহ এই প্রথা মেনেই হয়েছিল। সাধারণত কন্যাকে হরণ করেই আনা হত। আর পাত্রপাত্রী নিজেরাই প্রণয়ঘটিত কারণে যদি সকলের দৃষ্টির আড়ালে সহবাস করত — তাকে বলা হয় গান্ধর্ব বিবাহ। প্রভাবতী-প্রদ্যুম্ন, ঊষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ এই নিয়মেই হয়েছিল।

সবরকম বিবাহতেই যৌতুক দিতে হত। ভূমি, ধেনু, শয্যা, হস্তী, অশ্ব, রথ দাস-দাসী আরও নানা দ্রব্যদি যৌতুকসূত্রে পাওয়া যেত। স্যমন্তক মনিও কৃষ্ণ যৌতুক স্বরূপই পেয়েছিলেন। লক্ষণার পিতা মদ্ররাজ ছয় সহস্র হস্তী, এক লক্ষ ঘোড়া এবং ছয় সহস্র সশস্ত্র পাইক কৃষ্ণকে যৌতুক দিয়েছিলেন।

কখনো কখনো কিছু কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে কন্যাকে লাভ করার প্রচলন ছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের মতো লক্ষণার স্বয়ংবরেও রাধাচক্র বসানো হয়েছিল। নাগ্নজিতীর পিতা ও সপ্তবৃষকে একসঙ্গে বন্ধন করার শর্ত রেখেছিলেন।

সেকালের বিবাহ আর কবির কালে বাঙালির বিবাহের সাজসজ্জা এবং নিয়ম প্রথার যেন মেলবন্ধন ঘটালেন কবি। বিবাহের সময় কন্যাকে সাজানো হচ্ছে —

'লক্ষ দ্রব্য অঙ্গে ছিল নানা আভরণ।
পাত্রতে নূপুর দিল বাহেতে কঙ্কণ।।
বিচিত্র পাটের সাড়ি পরে গঙ্গাজল।
সিতাএ সিন্দুর দিল ন'য়ানে কাজল।।'

কবিরকালে এসে যেন পৌঁছেছি আমরা। প্রত্যেক দরজায় শুভ কদলিবৃক্ষ পোঁতা হল। তার পাশে জয়ধ্বনি দিয়ে সোনার ঘট স্থাপন করা হল।

'নর্ত্তকি নাচত্র গীত গাএত গায়ন।।
নাছে বাটে হাটে ঘাটে মঙ্গল হুলাহুলি।
চতুর্দ্দিগে জয়র্দ্ধনি সুনি কুলকুলি।।'

তারই মধ্যে কৃষ্ণকে রত্ন সিংহাসনে বসিয়ে গন্ধপুষ্প মালা দিয়ে ভূষিত করা হল। এ যেন আজকের কোন ধনী গৃহের বিবাহ চিত্র। পরবর্তীকালে চৈতন্যের প্রথম বিবাহ 'পঞ্চহরিতকী দিয়া' হলেও দ্বিতীয় বিবাহ কিন্তু রাজরাজড়াদের মতোই হয়েছিল। এত দান দেওয়া হয়েছিল যে দিতে গিয়ে যা পড়েছিল তা দিয়ে পাঁচটি সাধারণ পরিবারের বিয়ে হয়ে যায়।

বিবাহ উপলক্ষে নানা স্ত্রী-আচারের কথাও আছে

'এযাত রাজার রানি সখিজন নঞা।
শ্রীর আচার কৈল মঙ্গল করিঞা।।'

এই স্ত্রী-আচারের মধ্যে অধিবাস, সাতবার প্রদক্ষিণ করা, মঙ্গল হুলাহুলি দেওয়া ইত্যাদি অনুষ্ঠান আজও হয়ে থাকে।

সহমরণের উল্লেখ (বলদেব-রেবতী, কৃষ্ণ রুক্মিনী) থাকলেও এটা যে বাধ্যতামূলক তা মনে হয় না কেননা কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সব স্ত্রী সহমরণে যায়নি। মহাভারতে ও দেখি, মাদ্রী পাণ্ডুর সঙ্গে সহমরণে গেলেও কুন্তী যাননি।

মন্তব্য

কুলটা নারীর প্রসঙ্গ (অজামিল উপাখ্যান) এবং উদ্ধবকে তত্ত্ব উপদেশ দানের প্রসঙ্গে পিঙ্গলা নামে একজন গণিকার কথাও আছে। তৎকালে (পুরাণের কালে) কোনো নারী যদি মন দিয়ে কোনো পুরুষকে চায় তবে সেই পুরুষ তার কামনা সার্থক করতে পারেন। কুব্জির ক্ষেত্রে আমরা কৃষ্ণকে তাই করতে দেখি। ঐশ্চর্যভাবকে প্রাধান্য দিয়ে ভাগবত রচিত হয়েছিল। এখানে কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্যময় ভগবান। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তাই ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করাও তার কাজ। তাঁকে দিয়ে সমাজের সব মানুষের বিচার করা ঠিক হবে না তবুও মধ্যযুগের এক ক্রান্তিকালে সমাজের মধ্যে যে অনাচার, অসংযত যৌনাচার যে সহজেই ঘটত — একথা ভেবে নেওয়া যায়। ভয়ে বা ভক্তিতে অন্যরাও প্রতিবাদ করত না।

মৃত্যু সম্পর্কেও সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল মৃত্যুর সময়ে 'নারায়ণ'-এর নাম স্মরণ করলে কোটি জন্মের পাপ দূর হয়। সেই মৃত আত্মাকে বিষ্ণুদূতেরা বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায় — যমদূত তাকে স্পর্শ করতে পারে না। নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির কুশ শ্রাদ্ধ হয়। কৃষ্ণকে মৃত ভেবে দ্বারকাবাসীরা কুড়িদিন অনাহারে থেকে পিণ্ডদান করেছিলেন। সমুদ্রের তীরে কুশপুত্তলি দাহ করা হয়েছিল। পিণ্ডদান, তর্পণ দান ধ্যান শাস্ত্রের যা বিধান তা মেনে 'সম্পূর্ণ শ্রার্দ্ধ কৈল ত্রিয়োদস দিনে।।' — কেননা এ বিষয়ে কৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে — দ্বাদশ দিনের মধ্যে তিনি না ফিরে এলে তাকে যেন মৃত ভাবা হয়। গুরুজনদের তিনি বলেছিলেন —

'দ্বাদশ দিবস কহিল মোরে অপসর করি।
জাইহ সকল লোক দ্বারকা নগরি।।'

আর রুক্মিনীকে বলেছিলেন —

'দ্বাদশ দিবস থাকি জাইহ নিজ ঘরে।
শ্রাদ্ধ শান্তি করিহ পালিহ কোঙরে।।'

সে যুগের পারিবারিক গঠন ছিল যৌথ পরিবারের। পিতা-মাতা-পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদি শ্বশুর-শাশুড়ি-দাস-দাসী-অন্যান্য আত্মীয় পরিজন নিয়ে ছিল কৃষ্ণের বৃহৎ পরিবার। বিচিত্র আহার্যের কথা বলা আছে, উত্তর-পশ্চিম বা মধ্য পশ্চিম ভারতের দ্বারকা-মথুরা বৃন্দাবন ইত্যাদি স্থানের খাদ্যাভাসের কথা এখানে নেই। দুধ-ভাত, দধি, ঘোল, পরমান্ন, নানারকম মিষ্ট দ্রব্য; চিপিটক, পান ইত্যাদির উল্লেখ আছে। অতিথি বা মান্যব্যক্তি গৃহে এলে পাদ্যার্ঘ দিয়ে 'মিষ্ট অন্ন পান দিঞা' ভোজন করানোই বিধি ছিল।

অলংকারের মধ্যে মেয়েরা ব্যবহার করতেন — কঙ্কণ, কেয়ূর, প্রবাল, মণি, মুক্তা, হার, রত্ন কুণ্ডল ইত্যাদি আর পুরুষেরা পরতো মণি-মাণিক্য আর কানে পরতো মকর কুণ্ডল। সিঁদুর কাজল, কুসম, কস্তুরী, পুষ্পমাল্য, চন্দন ছিল স্ত্রীলোকদের সাধারণ প্রসাধনী। পুরুষরাও কুমকুম, কস্তুরী, চন্দন ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত হতো।

সুলতানি আমলে আর্থিক দুর্গতি ততটা দেখা যায়নি যতটা মুঘল আমলে দেখা গিয়েছিল। তাই সুবর্ণ ঘট, সুবর্ণের দণ্ড যুক্ত বিয়নি (পাখা), সোনার পাত্র, রত্নমণ্ডিত ঘর ইত্যাদির উল্লেখ আছে। স্ফটিকের দেয়াল, মুকুতার ঝারা/ঝারি, নেতের পতাকা ইত্যাদি দিয়ে ঘর-পথ সজ্জিত করা হতো। এখানেও যেন পুরাণের কাল আর কবির কালের মেশামেশি দেখা গেল।

নানারকম অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার তো ছিলই। অদ্ভুত দর্শন করলে ফল খারাপ হবে, এমন ধারণা ছিল সমস্ত সমাজে। প্রাকৃতিক কিছু কিছু বিপর্যয় অশুভ বলে মনে করা হত — ভূমিকম্প, উল্কাপাত, অসময়ে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ ইত্যাদি। রক্তবৃষ্টি, ধূমকেতু দেখা, দাবানল ইত্যাদি অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি রোধ করার ক্ষমতা মানুষের নেই কিন্তু দেবতারাই পারেন এসব থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে — এই বিশ্বাস ছিল। ভাদ্র মাসের চতুর্থীর চাঁদ দেখলে মিথ্যা কলঙ্ক হয় — এই বিশ্বাস জনসমাজে বদ্ধমূল ছিল। কুকুরের কান্না, ঘরে পায়রা, পেঁচা ইত্যাদি এসে পড়লে, 'উল্কা মুখে ধাবমান শিবা', দুর্লক্ষণ। ধন ঐশ্বর্যে মদমত্ত হয়ে এসব না মানলে যে বশ ধ্বংস হয়ে যায় কৃষ্ণ তার নিজের যদুবংশ ধ্বংস করে দিয়ে হয়তো এই শিক্ষাই দিয়েছেন জগৎকে।

বিপরীত পক্ষে স্ত্রীলোকের বাম উরু স্পন্দিত হওয়া, শাখা সিঁদুর উজ্জ্বল থাকা সুলক্ষণ — যা রুক্মিনীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। বাদিয়া-রা পুতুলনাচ আর পটুয়ারা পট দেখিয়ে সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করতো। দেওয়াল চিত্র আঁকা হত ঘর সাজানোর জন্য।

কিছু কিছু অপরাধ সব যুগের সমাজেই যেমন ঘটে থাকে — সে যুগেও ঘটত, পরদার গমন, স্ত্রীবধ, দস্যুবৃত্তি, চুরি ইত্যাদি ছিল। এর মধ্যে 'স্ত্রীবধিয়া' সবচেয়ে বেশি নিন্দনীয় বলে গণ্য হত, যারা মৃত সন্তান প্রসব করতো তাদের নামে 'মরাছিয়া' অপবাদ রটত। পরদার গমন জনিত মারাত্মক অপরাধ

সম্পর্কে কবির সতর্কবাণী বারবার উল্লেখিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

শিশুদের খেলাধূলোর মধ্যে 'বাম্ভবাহক'-এর নাম পাওয়া গেছে আর একটি প্রিয় খেলা ছিল তাদের — চোর-রাজা সাজা। পুরুষ স্ত্রী-পরিজনদের নিয়ে উপকথা বলা, একসঙ্গে হাস্য পরিহাসে দিন কাটানো ছিল এক ধরণের অবসর বিনোদন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার গান গাইতো স্ত্রীলোকেরা সংসারের কাজের মধ্যে বা অবসরে। বিবাহ বাসরে গীতবাদ্যের ব্যবহার যেমন ছিল — যুদ্ধের সময়েও নানা ধরণের বাদ্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

যুদ্ধ ছিল সমাজের একটি অত্যাবশ্যক কর্ম। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হতো তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে যেতো। তারা স্বামীর মৃত্যু হলে বা প্রিয়জনের শোকে বিহ্বল হয়ে রণক্ষেত্রেই যেতো। এখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য প্রকাশের জন্য সর্বক্ষেত্রে তাঁর জয় দেখানো হয়েছে — অলৌকিকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। চতুরঙ্গ সেনা, অক্ষৌহিনী, গদাযুদ্ধ এবং তার নিয়মনীতি সবই ছিল যুদ্ধের অঙ্গ।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ কলিকালের কথা বলা হয়েছে — সবই প্রায় সমাজ সম্পর্কে। সবদিকে যে অবনতি ঘটবে — তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে ধর্মের লোপ ও অধর্মের জয় হবে। মানুষ কামুক, লোভী ও হিংসক হবে। ব্রাহ্মণ জপতপ ছেড়ে মিথ্যাচার করবে, সন্ন্যাসী হবে অর্থলোভী। ম্লেচ্ছজাতি রাজা হবে। সমস্ত হিংসা, দ্বেষ, দুষ্কর্মের পাপ থেকে মুক্তি পেতে গেলে হরিনাম-গঙ্গাস্নান করলেই হবে। সত্যযুগে যা যা করণীয় — দান, ধ্যান, তপস্যা ইত্যাদি না করলেও চলবে। সব গ্রন্থেই আরাধ্য দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করার রীতি ছিল — এখানেও সে প্রসঙ্গেই এসব ভবিষ্যৎ চিত্রের কথা বলা আছে।

তৎকালীন সমাজে শৈবধর্মেরও প্রচলন ছিল। শৈবযোগীরা দেবতাকে তুষ্ট করতে 'হাকন্দ সাধনা' করতেন নিজের গায়ের মাংস কেটে যজ্ঞে আহুতি দিয়ে। গলায় হাড়ের মালা পরে যোগীরা নগরে পরিভ্রমণ করতো —

'নগর বাহির হৈলা বড়ু রূপ হৈয়া।।.....
হাড় মালা গলে দিয়া খাএত মাগিয়া।।'

চণ্ডীপূজার উল্লেখ বারবার আছে। ভবানী, কাত্যায়নী, দুর্গতনাশিনী, ব্রহ্মাণী, পার্বতী, ভগবতী ইত্যাদি নানা নামে এই শক্তিদেবীর পূজা হত। সাধারণ গ্রাম্য নারীরাও যে মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাইতো রাত জেগে সে কথা চৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়। এখানেও পুরাণের কাল ও কবির কাল মিলেমিশে গেছে।

মুসলমানধর্মের আগ্রাসী ভূমিকায় পুরাণের ধর্মচেতনা বাধাপ্রাপ্ত হলেও লৌকিক ধর্মের উত্থান হতে শুরু করেছিল। বিশেষকরে সহজ সরল নামধর্মের (বৈষ্ণব) প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছিল। চৈতন্যদেবের পূর্ব সময়ে ভাগবত কথা পাঠ হত, চর্চা হত। অদ্বৈত আচার্য মাধবেন্দ্র পুরীকে 'ভাগবতীয়া বৈষ্ণব' বলে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তন্ত্র, মন্ত্র, যোগ সাধনার কথাও প্রমাণ করে সমাজে এসবেরও প্রভাব ছিল ভালোই। একাদশীর পরদিন দ্বাদশীর পারণায় নন্দ ঘোষ এবং অন্যান্যরা পুণ্যার্জনের জন্য নদীতে অবগাহন স্নান করতেন। সূর্য গ্রহণের সময় বিভিন্ন স্থান থেকে পুণ্যার্থীরা তীর্থস্থানে গমন করতেন।

বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে যেতে হত। সান্দীপনি মুনির গৃহে কৃষ্ণের ও বলরামের পাঠ শুরু হয়েছিল। সুদামা ছিলেন কৃষ্ণের সহপাঠী। চৌষট্টি রকমের বিদ্যা ছিল। মেধাবী ছাত্ররা তা চৌষট্টি দিনেই শেষ করতে পারতো। শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়ে নিজগৃহে শিষ্যরা চলে যেত। কৃষ্ণ গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন গুরুর সাগরের জলে মৃত পুত্রকে জীবিত করে দিয়ে।

মালাধরের সমাজমনস্কতার একটি ছোট দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আমরা আমাদের আলোচনা শেষ করবো। রাসলীলার বিস্তৃত বর্ণনা শেষ করেই তিনি একজন সচেতন নাগরিকের মতো পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন — কৃষ্ণের শরীরে পাপপুণ্য স্পর্শ করে না। সংসারের নাথ হয়ে তিনি যে পরনারী হরণ করেন (গোপীগণ) তার কারণ হল — 'আত্মপর নাঞী তার সংসার ভিতরে'। তিনি অগ্নির সমান। অগ্নির ক্ষমতা আছে ভালোকে এবং মন্দকেও পোড়ানোর। তাঁর মতো অন্যরা যদি করতে যায়, তবে —

'অন্যজন হৈলে তবে নরকে পচয়।
বিষ বর্ষণ হয়ে মহাদেবে খাই।
অন্যজন হৈলে তবে মরএ তথাই।।
সপনেহোঁ সংসার না করিহ পরদার।
পরদারাধিক পাপ নাহিক সংসার।।

মন্তব্য

চৌরাসি সহস্র নরক জত জম লোকে।
পরস্ত্রী হরণে তাহা ভুঞ্জি একে একে।।
না করিহ পরদার যুন সর্ব্বজনে।
পরদারে পাপ কহে গুণরাজখাঁনে।।'

— বিপর্যস্ত, অসহায়, বিভ্রান্ত হিন্দু সমাজের সামনে এমন একটি চরিত্র তিনি তুলে ধরতে চাননি যার আচরণের ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। তিনি যেন এখানে ভক্তের চেয়েও বেশি নীতিবাগীশ এবং সমাজরক্ষক। ঈশ্বরের মহিমার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও বাঁধতে চেয়েছেন নৈতিকতার দৃঢ় রজ্জু দ্বারা। তাই পরদার গমনের মতো পাপকার্য সম্পর্কে এত বার সাবধানবাণী উচ্চারণ।

কৃষ্ণনাম উচ্চারণের দ্বারা বাঙালি সমাজকে সুখে শান্তিতে ধর্মে বিনয়ে ভরিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখিয়েছেন কবি। রাসলীলা ব্যতীত অন্য কোথাও এত বিস্তৃতভাবে কৃষ্ণ ও গোপীদের কথা তিনি লেখেননি। কারণ হিসেবে সমালোচক পণ্ডিতেরা মনে করেন এসবের জন্য তৎকালীন সমাজ মানসই দায়ী। ''মুসলমান অভিযানের প্রবল বন্যা সরিয়া গেলে বাঙালি হিন্দুসমাজ প্রচণ্ড আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একজন বলিষ্ঠ ও বীর্যবান নরোত্তমের আদর্শ খুঁজিতেছিল। মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের' ঐশ্চর্য ও প্রতাপের মধ্যে বাঙালিজাতি সেই জাতীয় বীরকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। মালাধরও এই সামাজিক পরিবেশে বর্ণিত হইয়া নিজেও যেন একটা আদর্শ বীর্যবান চরিত্রাঙ্কনের প্রয়াস করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কৃষ্ণের ঐশ্চর্যলীলা অধিকতর বিকাশলাভ করিযাছে, তাহার কারণ — সেই যুগের সমাজ-পরিবেশ ও বাঙালির বাসনা ঐরূপ চরিত্রই চাহিতেছিল।'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫১-৫২ — অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়)।

এ বিষয়ে সকলে একমত না হলেও কবির সমাজমনস্ক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে কৃষ্ণচরিত্রে — একথা বলাই যায়।

১০.১৩ ঃ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের কাব্যমূল্য

মালাধর বসুর কাব্যের কবিত্ব বিচার করতে গেলে প্রথমেই চৈতন্যদেবের কথা মনে আসে। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদ এবং রামানন্দ রায়ের নাটক জগন্নাথ বল্লভ এবং বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত — এসব ভক্তিরসাত্মক কাব্য নাটক যিনি আস্বাদন করতেন তিনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবেন — এতো স্বাভাবিক। মালাধর পুত্র সত্যরাজের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হলে — উল্লসিত চৈতন্যদেব কী বলেছিলেন তা চৈতন্য চরিতামৃত থেকে উদ্ধার করা যাক —

'গুণরাজ খান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
তাঁহা এক বাক্যে তাঁর আছে প্রেমময়।।
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ।।
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর।।'

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ — পঙ্‌ক্তিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে আছে — বসুদেব সূত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।

— এতো গেল একজন পরমভক্তের কাছে গ্রন্থে পরিবেশিত ভক্তির বিচার বরং বলা চলে ভক্তিরস গ্রন্থের সম্পর্কে স্বয়ং ভক্ত শ্রেষ্ঠের ভক্তি নিবেদন। কিন্তু সাধারণ কাব্য সমালোচকেরা তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে কী বললেন — তা-ই আমাদের আলোচ্য।

আমরা পূর্বেই বলেছি তিনি যত বড় ভক্ত তত বড় কবি নন। তাঁর রচনার উদ্দেশ্য কাব্য রচনা নয়, তাঁর উদ্দেশ্য 'লোক নিস্তার' অর্থাৎ সকলের মধ্যে কৃষ্ণকথার প্রচার। লোক সাধারণের জন্য লেখা বলে তিনি লোকভাষাই গ্রহণ করেছেন, পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেননি। তাই সেই যুগের পক্ষে যতটা সহজ সরল করে লেখা যায় তিনি বলেছেন। রামায়ণের কথা বাদ দিলে তিনিই প্রথম (প্রামাণ্য রচনাকাল পাওয়া গিয়েছে বলে) অনুসারী সাহিত্যের স্রষ্টা। অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি মূলানুবাদ করেননি। পাঠকের কথা চিন্তা করে যে সব অংশ পাঠককে আকৃষ্ট করবে, — সে সব অংশ মূল গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন। প্রয়োজনে অন্যান্য পুরাণ থেকেও গ্রহণ করেছেন নানা ঘটনা। সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে তিনি মোটামুটিভাবে মূলানুবাদ করারই চেষ্টা করেছেন। পুতনা বধের কাহিনিটির একটি অংশ তুলে ধরা হল —

কৃষ্ণের স্তন্যপানে পুতনার মৃত্যু হলে তার বিশাল দেহ বারো মাইল পরিমিত স্থানের সমস্ত বৃক্ষ বিচূর্ণ করে মাটিতে পড়ল। দেহটি ছিল আশ্চর্যজনক।

'ঈষামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং গিরিকন্দরনাসিকম্।
গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণরুণমূর্ধজম্।।' ১৫।।
'অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণম্।
বদ্ধসেতুভূর্জোবিঙ্ঘ্র শূন্যতোয়হ্রদোদরম্।।' ১৬।।
'সন্তত্রসুঃ স্ম তদ্ বীক্ষ্য গোপা গোপ্যঃ কলেবরম্।
পূর্বং তু তন্নিঃস্বনিতভিন্নহৃৎ কর্ণমস্তকাঃ।।' ১৭।।

(১০ম স্কন্ধঃ অধ্যায় ৬)

— অর্থাৎ সেই রাক্ষসীর মুখ লাঙ্গলের অগ্রবাগের মতো তীক্ষ্ন দন্তবিশিষ্ট ছিল, নাসারন্ধ্র পর্বতের গুহার মতো গভীর, স্তনদ্বয় পার্বতশিখরচ্যুত প্রস্তরখণ্ডের মতো বিশাল এবং কেশরাশি বিক্ষিপ্ত ও তাম্রবর্ণ ছিল। তার অক্ষিকোটর অন্ধকূপের মতো গভীর, জঘনদ্বয় নদীতটের মতো ভীষণ, তার বাহু, উরু ও পদযুগল বিশাল সেতুর মতো এবং উদরটি জলশূন্য হ্রদের মতো ছিল। ইতিমধ্যেই সেই রাক্ষসের চিৎকারে গোপ এবং গোপীদের হৃদয় কর্ণ ও মস্তক কম্পিত হয়েছিল। পুনরায় তাঁরা যখন তার ভয়ঙ্কর শরীর দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা আরও ভীত হয়েছিলেন। কবি পয়ারে বদ্ধ করে লিখলেন —

'পড়িল পুতনা ছয় ক্রোস ঘুড়িঞা।
গোকুলের গাছপালা সকল ভাঙ্গিঞা।।
বিকৃতি মুখ রাক্ষসি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
এক ক্রোস ঘুড়িঞা পড়ে মস্তক ডাঙ্গর।।
নাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি।
উদর, গোটা দেখি জেনে যুখান পোখরি।।
দন্ত সৈল মস্তক পিঙ্গল কেসভার।
অন্ধকূপ গভীর আঁখি দেখি দুই তার।।
বড় দিঘির পাহাড় জেন হস্তপাদ ধরি।
গিরি কান্দর যেন দেখিঞা ভয় করি।।
দেখি ঞাত ত্রাস পায়ে গোকুল নগরে।'

এমনকি তার দেহ খানখান করে কেটে পোড়ানোর পর যে কস্তুরি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল সে কথাটিও মালাধর উল্লেখ করেছেন। এই অনুবাদ যথাযথ। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। ভাগবতকার সমস্ত দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা উল্লেখ করলেও মস্তকের কথা কিন্তু উল্লেখ করেননি। মালাধরের বাস্তবতাবোধ এখানে কাজ করেছে। তিনি এক ক্রোশ জুড়ে যে মস্তক পড়েছে — সে কথা লিখেছেন।

অযাসুর বধের বিবরণের একটি অংশ এ প্রসঙ্গে বলা যাক —

কংসের আদেশে অযাসুর ভয়ঙ্কর অজগর সর্পের রূপ ধরে বৃন্দাবনের গোষ্ঠে এল। মহাকায় অজগরের বর্ণনায় বলেছেন —

'কুড়ি যোজন দির্ঘে দেখিতে ভয়ঙ্কর।
তিন জোজন আড়ে সরীর প্রসার।।
একখান ওষ্ঠ তার গগন মণ্ডলে।
আর ওষ্ঠখান তার পৃথিবির তলে।।'

— এই বর্ণনায় দুবার 'ওষ্ঠ' শব্দের প্রয়োগ আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায়। একটি ওষ্ঠ অন্যটি অধর হওয়ার কথা ছিল। এক্ষেত্রে মূল অংশে ছিল — 'ধরাধরোষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো .....' অর্থ হল — ধরা (পৃথিবী) যার 'অধর ওষ্ঠঃ (নিম্ন ওষ্ঠ) এবং 'জলদ-উত্তর-ওষ্ঠ'; (ওপরের ওষ্ঠ মেঘ স্পর্শ করেছিল)। 'অধর ওষ্ঠ' আর 'উত্তর ওষ্ঠ' শব্দগুলি বাঙালিরা ব্যবহার করে না। সাধারণভাবে অধর ও ওষ্ঠ বলা হয়ে থাকে। কবি দুবারই ওষ্ঠ শব্দ ব্যবহার করায় তাদের পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন 'একখান ওষ্ঠ' এবং 'আর ওষ্ঠ' বলে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থটি শ্রীমদ্ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়। ভাগবত ছাড়াও তিনি হরিবংশ শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, মহাভারত ও কৃষ্ণকথাশ্রিত নানা লোককাহিনি ব্যবহার করেছেন। সব মিলিয়ে কৃষ্ণের একটি নিটোল জীবনকাহিনি বর্ণনা করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। ভাগবতের দুরূহ দার্শনিকতত্ত্ব বা ব্রজের মধুরলীলা বর্ণনা করাই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু নয়। যুগের প্রয়োজনে কৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনাবলী শুনে তার আদর্শে বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। তাই এই গ্রন্থে সেই মথুরানায়ক কৃষ্ণকেই আমরা পাই। আর এই কাজ করা যে কত কঠিন তা তিনি অতি সুন্দর কাব্যময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন —

'আকাসের তারা জদি একে একে গনি।
সমুদ্রের জল জদি ঘটে পরমানি।।
পৃথুবির রেণু জদি করি এ গনন।
তবুত বলিতে নারি কৃষ্ণের করণ।।'

— এই উপমা নির্বাচন তার কবিত্ব প্রতিভার প্রকাশ।

মালাধর সচেতনভাবে কবিত্ব করতে বসেননি। সে যুগে তার সামনে অনুসারী সাহিত্যের কোন আদর্শ তো ছিলই না (কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালি ছাড়া) সাধারণভাবেও আদর্শ বাংলা ভাষায় রূপটিও স্থিরীকৃত হয়নি। অপরিণত বাংলা ভাষা দিয়ে উচ্চতর কোন ভাবপ্রকাশ করা যায় না বলেই সাধারণের ধারণা ছিল না। সবাই বাংলা ভাষাকে 'লোকভাষা' বা 'লৌকিকভাষা' বলে হেয় করতো। কেউ কেউ তাও দুঃসাহস দেখিয়ে লিখেছেন এবং সবাইকে বলেছেন —

'লৌকিক বলিঞা না করিহ উপহাসে।
লৌকিক মন্ত্রেসি সাপের বিষ নাশে।।'
(গোপালবিজয় ঃ দেবকীনন্দন সিংহ)

আরও পরে মুকুন্দও চণ্ডীমঙ্গল লিখতে গিয়ে বলেছেন — 'মুকুন্দ রচিল গীত লৌকিকের ভাষা'। সর্বপ্রথম মালাধর লৌকিক ভাষায় তার কাব্য রচনা করে দুঃসাহসিক কাজই করেছেন। একটি উদাহরণ দেয়া যাক — যশোদার গর্ভে যোগমায়া জন্মগ্রহণ করেই

'উঙা উঙা করিয়া কান্দ এ কন্যা
চিয়াইল প্রহরী সব ক্রন্দন শুনি।।'

— এখানে 'উঙা উঙা' এবং 'চিয়াইল' একেবারের লৌকিক শব্দ।

বীররসের প্রাধান্য দিয়ে তিনি বেশিরভাগ যুদ্ধবর্ণনাই করেছেন। বাল্যকালে বৃন্দাবনে থাকতেই কৃষ্ণ পুতনা, তৃণাবর্ত বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, ধেনুকাসুর ইত্যাদি বধ করেছেন এবং যমলার্জুন ভঙ্গ, শকট ভঞ্জন ও ব্রহ্মামোহনের মতো অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। অঘাসুর বধের বর্ণনায় কবি বলেছেন —

'কুড়ি জোজন দির্ঘে দেখিতে ভয়ঙ্কর।
তিন জোজন আড়ে শরীর প্রসর।।....
রাঙ্গা মুখখান তার অরূপ কিরণ।
জিহি গোটা, গাইল তার সকলভুবন।।
মেঘখান উঠিল জেন যুড়িঞা আকাস।
দারুণ ঝড় বহে জেন নাকের নিস্বাস
স্বাসের ঘাএ শিশু সম্ভায়ে উদরে।
সভে সাম্ভাইলা কৃষ্ণ রহিলা বাহিরে।।'

— এসব বর্ণনায় বাস্তবতা রক্ষা করার জন্য কবি যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন। অরিষ্ঠাসুর কৃষ্ণকে বধ করবার জন্য বৃন্দাবনে প্রবেশ করল। তার পদক্ষেপের তীব্রতা বোঝাতে গিয়ে কবি বলেছেন — 'পদে পদে ভূমিকম্প আরিষ্ট নড়িতে হয়। ডাহিন বামে বৃক্ষ ভাঙ্গি গড়াগড়ি যায়।।' — অরিষ্টের কত বড় শরীর এবং তার কত ওজন — আমরা ব্যঞ্জনায় বুঝতে পারি। মূল ঘটনা অলৌকিক হলেও বাস্তব পৃথিবীর ধূলিমাখা অসহায় মানুষগুলিকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণের আবির্ভাব ও বীরত্ব প্রদর্শনের মধ্যে যতটুকু সম্ভব কবিত্ব প্রকাশ করেছেন — তার জন্য সযত্ন প্রয়াস ছিল না।

এই কাব্য রচনার পেছনে মঙ্গলকাব্য রচনার মতো স্বপ্নাদেশের কথাও কবি বলেছেন —

'স্বপ্ন আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস।।
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।'

— যদিও মঙ্গলকাব্যের বিষয়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়র কোন মিল নেই কিন্তু মধ্যযুগের প্রবণতাটি লক্ষণীয়।

যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে যে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন তার মধ্যেও কবি যথাযথ বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন দুই দলের রোষ, হিংসা ও প্রতিশোধপরায়ণতা এবং বীরত্ব প্রদর্শন —

'হস্তির পৃষ্ঠে দামা বাজে কাংস্য করতাল।
ঢাক ঢোল পড়া বাজে যুনিতে রসাল।।
বির মাদল বাজে সপ্তস্বরা বিন্দু আন।
দোসরি মোহরি রাজে বাদ্য প্রধান।।
রণ সাজে সারথি রথ আনিল সর্ত্তরে।

হস্তি ঘোড়া পাইক ভাগ সাজিল থরে থরে।।'

— এরকম যুদ্ধবর্ণনার, অজস্র বর্ণনা আছে। ভয়ঙ্কর ও বিস্ময় রসের আধারে পরিবেশিত এইসব যুদ্ধবর্ণনা সাধারণ মানুষকে উদ্দীপ্ত করতো। আমরা পৃথকভাবে তার আলোচনা করেছি।

শৃঙ্গার রসের বর্ণনা এখানে খুব অস্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। যদিও ভাগবতে পাঁচটি অধ্যায় জুড়ে রাসলীলা বর্ণিত আছে। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে যুবতীগণের হৃদয়ের বর্ণনায় মালাধরের কবিত্ব প্রতিভা ধরা পড়ে।

'সরত পুর্ন্নিমা সসি কইল উদয়।
সুগন্ধ সিতল বা মনোহর বয়।।
নব কিসলয় জত সব বৃন্দাবনে।
অধিক দ্বিপতি হৈল চন্দ্রের কিরণে।।'

— এমন প্রাকৃতিক রোমান্টিক পরিবেশে কৃষ্ণের রূপ যুবতি গণের মনকে পীড়িত করতেই পারে।

'হেন কালে হইলা কৃষ্ণ দ্বাদস বৎসর।
যুন্দর সরির দেখি আতি মনোহর।।'

— প্রাচীন অলংকার শাস্ত্র ও কৃষ্ণরস শাস্ত্র মেনে তিনি তুলনা করলেন কৃষ্ণের রূপের সঙ্গে প্রাকৃতিক নানা সুন্দর বস্তুর —

'পুর্ন্নিমার চন্দ্র জেন বদন নির্মল।
খঞ্জন জিনিঞা তার নয়ন চঞ্চল।।
পিত বসন ধড়া পড়ে বনমালী।
লৌতন মেঘে জেন পড়িছে বিযুরি।।'

— এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। বিদ্যাপতির কৃষ্ণের রূপবর্ণনামূলক ৬২৯ সংখ্যক পদটি —

'অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী রেহ।।
সামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কাজরে সাজল মদন সুবেশ।।'

— কৃষ্ণের এমন রূপ দেখে যুবতিগণের মন মুগ্ধ হল। তারা রাসমণ্ডপে উপস্থিত কৃষ্ণের বাঁশি শুনে যে যেমন অবস্থায় ছিল ধেয়ে এল। যারা 'স্বামির কোলে আছিল যুতিঞা', যারা বন্ধুদের সঙ্গে উপকথা শুনছিলেন, কেউ রান্না করছিলেন, কেউ শিশুকে স্তন্যপান করাছিলেন, স্বামীকে অন্ন পরিবেশন করছিলেন — তারা সবাই 'চলিলাত গোপনারি হরসিত মনে'। 'কামে পিড়িত গোপি হত চিত্ত হৈল' অথবা 'দাণ্ডাইলা তার পাশে চিত্রলেখিত হঞা'। অপূর্ব ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে তার এই 'চিত্রলেখিত' শব্দটিতে।

কৃষ্ণ যখন তাদের বোঝালেন —

'স্বামি বিনে কেহো নাহি জগত সংসারে।
স্বামি সেবা কইলে হএ নরকে উদ্ধারে।'

তখন তারা 'হেঠ মাথা করি সভে ভাবিতে লাগিল'। 'স্তন বাহিঞা' তাদের আঁখি জল ভূমিতে পড়ল এবং তারা 'পাত্রর অঙ্গুলি লেখে বোলে ধিরে ধিরে'। 'পায়ের অঙ্গুলি দিয়ে লেখা-র কথায় আমাদের মনে পড়ে যায় মহাদেবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহের কথায় পিতার পাশ্বে থাকা অধোমুখী পার্বতীর লীলাপত্র গণনার কথা। অপূর্ব ব্যঞ্জনা ধরা পড়েছে এখানে। গোপীদের বাড়ি ফিরে না যাবার ইচ্ছা এবং কৃষ্ণের নির্দেশে বাড়ি ফিরে যেতে হবে — এই দোটানায় পড়ে তাদের অসহায়তা, অনীহা ধরা পড়েছে চিত্রটিতে।

রাসলীলায় মিলনের বর্ণনায় তিনি বাড়াবাড় করেননি। কবি এখানে সামাজিক। সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন পাঠকদের উদ্দেশ্যে — মহাদেবের পক্ষেই সম্ভব বিষ খেয়ে হজম করা। 'অন্যজন হৈলে তবে মরএ তথাই'। আরও বললেন —

'সপনেহোঁ সংসার না করিও পরদার।
পরদারাধিক পাপ নাহিক সংসার।।'

এরপরই তিনি পরস্ত্রী হরণ করলে যে যমলোকের চুরাশি সহস্র নরক একে একে ভাগ করতে হবে তাও বললেন। ঘোষনার মতো করে বললেন —

'ন করিহ পরদার যুণ সর্ব্বজনে।

পরদারে পাপ কহে গুণরাজ খানে।।'

কবি এখানে শিল্পী নন, নীতিশিক্ষক, সমাজশিক্ষক, মানুষ মালাধর।

বিশুদ্ধ বিস্ময় রসের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে তিনি যদি শুধু কবিতাই লিখতেন বা কাব্য করতে বসতেন তবে তা মানোত্তীর্ণই হত। স্যমন্তক মণি হরণের সময় জাম্ববানের সঙ্গে গুহা যুদ্ধে কৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে ভেবে দেবী দৈবকী বিলাপ করতে করতে 'বলিতে বলিতে দেবী অচেতন হৈল / চির্ত্তের পুত্তলি জেন কাঁথেত নিখিল।' — একটি চিত্রকল্পের ন্যায় আমাদের মনে হয়।

কৃষ্ণের মৃত্যুর পর অর্জুন যখন তাঁর পত্নীদের সুরক্ষার জন্য নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন পথে আভীর দৈত্যরা তাদের হরণ করার জন্য অর্জুনকে বাধা দিয়ে তাদের স্পর্শ করা মাত্র —

'দৈস্যের পরসে গোসাঞের যত নারি।
পাসাণ প্রতিমা হৈল তনুত্যাগ করি।।'

অলংকারের আলোচনা আমরা পৃথকভাবে করলেও কবিত্বের মধ্যে অলংকারও পড়ে। প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রে শিক্ষিত মালাধর সুযোগ পেলেই নানা অলংকারে সজ্জিত করেছেন তার কাব্যদেহকে। রূপক ও উপমার একসঙ্গে ব্যবহার করে তিনি সংকরালংকার সৃষ্টি করেছেন —

'সভার অন্তরে থাকী পাত মায়াজাল।
বাদিয়া পুতলি হেন কর্মসূত্রে চাল।।'

গোপীদের হৃদয়ের আনন্দের প্রকাশ যখন দেখতে চেয়েছেন তখন প্রকৃতি থেকে উপমা চয়না করেছেন —

'মৃত সস্য মঞ্জরে জেন মেঘ বরিসনে।
তেন কৃষ্ণ দরসনে আনন্দ সর্ব্বজনে।।'

কিছু কিছু মর্মস্পর্শী বর্ণনায় মালাধরের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর যশোদার সাথে পুত্র কৃষ্ণের মিলন হলে অভিমানিনী মাতা কৃষ্ণকে কোলে করে বলছেন —

'কেমতে পাসরিলে বাপু সেই বৃন্দাবন।
কেমতে পাসরিলে তুমি গোপঘুপিগণ।।
কেমতে পাসরিলে তুমি গোকুলনগরী।
কেমতে পাসরিলে সেই গোবর্ধন গিরি।।'
কেমতে পাসরিলে তুমি নদী সে জমুনা।
কেমতে পাসরিলে বাপু আমা দুই জনা।

এই শেষ পঙ্‌ক্তিটি উচ্চারণ করে যশোদা তার অভিমানকে আরও গাঢ় করে তুলেছেন। হয়তো কেঁদে ভেসে গিয়ে তাঁর মুখে আর কথা ফোটেনি।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পূর্বে গোপীদের মনের অবস্থার বর্ণনাও কবিত্বরসে পূর্ণ।

'আর না যাইব সখি চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে।।'

তারা আর সে 'চাঁদবদন' দেখতে পাবেন না, সে 'মুখ চুম্বন' করতেও পারবেন না। সেই কৃষ্ণবিহীন কল্পতরুমূলেও তারা আর যাবেন না। কৃষ্ণগেলে তারা প্রাণত্যাগ করবেন। কেননা —

'কৃষ্ণ সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ।
অল্পধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে।'

— তাদের চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা ধরা পড়েছে এখানকার প্রতি ছত্রে ছত্রে।

মালাধরের কবিত্বের চূড়ান্ত রূপ ধরা পড়েছে গ্রন্থের শেষে। উদ্ধবকে তত্ত্বোপদেশ দিয়ে তাকে যখন কৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখালেন — যেন কোটি কোটি সূর্যের প্রকাশ হল। তাঁর মস্তক স্বর্গলোক আর পৃথিবী মধ্যভাগে। চন্দ্র, সূর্য তাঁর দুই চক্ষু।

'স্বর্গগঙ্গা হইল জিভুা পবন নিস্বাস
সমুদ্র উদর যত নদ নদি নাড়ি।'

অধোদেশ পরিব্যাপ্ত হল রসাতলে। কৃষ্ণের শরীরের মধ্যে নর, পশু, স্থাবর, জঙ্গম, অসুর, রাক্ষস ইত্যাদি অবস্থিতি দেখে উদ্ধব সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি উদ্ধবকে সাম্যরূপ দেখালেন বিশ্বরূপ ত্যাগ করে।

'শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গলে বনমালা।

পুর্ন্নিমার চাঁদ জেন উদয় সোলকলা।।'

এরপর তিনি উদ্ধবকে নানা বিষয়ে কিছু নীতি উপদেশ দিলেন যা ভাগবতে নেই। তিনি লোকনিস্তারের কারণে এই অংশটি শ্রীমদ্ভগবতগীতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই বর্ণনায় কবি মৌলিকতা দেখাতে পেরেছেন বলেই হয়তো তার স্বাধীন কবিত্ব শক্তি ফুটে উঠেছে।

সার্বিকভাবে তাঁর কবিত্বশক্তি নিয়ে অনেকেরই ধারণা — তাঁর পয়ার ত্রিপদী ছন্দ যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ ও কাব্যরসসিক্ত নয়। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর সম্পাদক কেদারনাথ দত্তের মতে — 'এই গ্রন্থের ভাষা অলংকৃত নয়, ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে ষোল সতের অক্ষর বা বারো-তেরো অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়' — একথা হয়তো ঠিক। পয়ার সুর করে পাঠ করা হোত মধ্যযুগে। সুর করে পাঠ করার সময় অক্ষরের অসমতা ধরা পড়তো না। মধ্যযুগের অনেক কাব্যেই এ দোষ আছে — এজন্য একা মালাধরকে দোষারোপ করা যায় না।

আবার আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে মালাধর মূলত কবি নন ঠিকই, তিনি প্রথমে ভক্ত পরে তিনি কবি। কিন্তু তাঁর কবিত্বশক্তি অনুল্লেখ্য নয়।

১০.১৪ ঃ ভাগবতের অন্যান্য অনুবাদ

চৈতন্য পূর্বযুগে একমাত্র অনুবাদ হিসেবে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ছিল প্রধানতঃ ভাগবতের ঐশ্বর্যবান, পৌরুষদীপ্ত কৃষ্ণের পরিচয়দান। কিন্তু চৈতন্যোত্তরকালে গৌড়ীয় 'রাগানুগা' ভক্তিতে স্নাত হয়ে বীর্যদীপ্ত কৃষ্ণ প্রেমিক কৃষ্ণরূপে আর্বিভূত হলেন। তাছাড়া এই পর্যায়ের ভাগবতের অনুবাদে মধুরলীলার পাশাপাশি অপর একটি মৌলিক বিষয়ের আমদানী ঘটে। ভাগবতে যার উল্লেখমাত্র নেই, সেই 'রাধা' চৈতন্যোত্তর ভাগবত অনুবাদগুলিতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীভূদেব চৌধুরীর অভিমত হ'ল, ''চৈতন্যোত্তর যুগের 'ভাগবত' কাব্যানুবাদ ও কৃষ্ণলীলা-গাথায়, পৌরাণিক ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে সমকালীন বাঙালি মানসের বাসনার ধন দানলীলাদির প্রসঙ্গই মুখ্য আসন অধিকার করেছে। তাই দেখি, এযুগের কৃষ্ণলীলা কাব্যের কোনো কোনোটিতে 'ভাগবত'-এর দশম স্কন্ধের কাঠামোটুকু মাত্র আছে, কোথাও কোথাও 'ব্রহ্মবৈবর্ত', 'হরিবংশা'দি অর্বাচীন পুরাণ কথা থেকে উপাদান গৃহীত হয়েছে; অন্যদিকে অনেক কাব্যেরই প্রায় একমাত্র উপজীব্য নিছক 'দানলীলা'দি লোককথা'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র সমকক্ষতা এই পর্যায়ের ভাগবত অনুবাদকদের মধ্যে লক্ষ্য না করা গেলেও, অনেক কবিই কিন্তু ভাগবত অনুবাদে মনোযোগী হয়েছিলেন। হুসেন শাহের পারিষদ যশোরাজ খানের 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের কথা উল্লেখ করেছেন ড. সুকুমার সেন। এই কাব্যটির যেমন কোন পুথির সন্ধান নেই, একইভাবে চৈতন্য পরিকর গোবিন্দ আচার্য ও পরমানন্দ গুপ্ত রচিত কৃষ্ণলীলা কাব্যেরও কোন পুথির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থে এই কবিদের কাব্যের পরিচয় মেলে। অন্যদিকে যে সব ভাগবত অনুবাদক কবিদের পুথি আবিস্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী'র কথা। রঘুনাথের উদ্দেশ্যই ছিল, ''মহাভাগবতে না কহিব অন্য কথা।' আদিঅন্ত গ্রন্থ রচনায় তিনি এই পণ সম্পূর্ণ রক্ষা করেছেন। সুবৃহৎ কাব্যখানিতে 'শ্রীমদ্ভাগত'-এর বারোটি স্কন্ধেরই মোটামুটি অনুবাদ করা হয়েছে। তাহলেও এ অনুবাদ মূলের আক্ষরিক অনুসরণমাত্র নয়; প্রতি স্কন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অবলম্বন করে স্বাধীন বাংলা ভাষায় কবিতার রূপান্তর সাধন করেছেন'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ ১ম পর্যায়)। রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী' কাব্যে চৈতন্যভাবাদর্শের যে প্রকাশ ঘটেছিল, তার পূর্ণ বিকাশ দেখা দেয় দ্বিজ মাধবের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যে। পরবর্তী কাব্যটি হ'ল কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'; যদিও কাব্যটির কবি প্রদত্ত নাম 'মাধবচরিত'। ষোড়শ শতাব্দীর ভাগবত অনুবাদকদের মধ্যে কবিশেখর ছিলেন বিখ্যাত। তাঁর কাব্যটির অর্থাৎ বাংলা কৃষ্ণলীলা কাব্যটির নাম 'গোপালবিজয় পাঁচালী'। এই কাব্যটিতে যেমন লৌকিক গল্পাদির প্রতি আগ্রহ প্রবল, 'দুঃখী' শ্যামাদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' সেইরকম লৌকিক কাহিনির প্রভাব পুষ্ট একটি পরিচিত কৃষ্ণলীলা কাব্য। এছাড়া আরও অনেক কবি এই পর্যায়ে ভাগবত অনুবাদ করে এই শাখাটির কলেবর বৃদ্ধি করেছিলেন।

মন্তব্য

১০.১৫ ঃ বাংলায় ভাগবত অনুবাদ সীমিত হওয়ার কারণ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অংশ অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় পুষ্ট। সংস্কৃত রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণ-গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদ এই অনুবাদ সাহিত্যের বিষয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত উঁচু-নীচু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিরপেক্ষভাবে সমানভাবে জনপ্রিয়। কারণ বাংলার লোকপ্রিয় এই দুই কবি বাঙালির রুচি ও মানসিকতা অনুযায়ী তাঁদের কাব্যের পরিকল্পনা করেছেন। অন্যদিকে ভাগবত বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের প্রধান আশ্রয় হলেও চৈতন্যযুগে ভাগবতের অনুবাদ জনসাধারণের চিত্তে সীমাহীন সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারেনি। এর কারণ ভাগবত মূলতঃ প্রচারধর্মী কাব্য। তাই শিল্প সৌন্দর্যের বিচারে রামায়ণ মহাভারতের নৈকট্যলাভের দাবি তার নেই। তাছাড়া ভাগবত প্রধানতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। কিন্তু রামায়েত গোষ্ঠীর জন্য লেখা কাব্য রামায়ণ নয়। আর কাশীরামের মহাভারতে বৈষ্ণব ভক্তির সুর বাজলেও মহাকাব্যটির নিজস্ব কাহিনি ও চরিত্রগৌরব তাকে সর্বাংশে ছাপিয়ে উঠেছে। ভাগবত বিসাল কাব্য হলেও বৈচিত্র্যের অভাব এর জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্যতম কারণ। অন্যদিকে ভাগবতের কৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী-কৃষ্ণ। কিন্তু চৈতন্য আবির্ভাবের পর বাঙালি মানসে কৃষ্ণ হলেন প্রেমের দেবতা, রাধা-রমণ। এই চিরকিশোর কৃষ্ণকে বাঙালি পেয়েছে বৈষ্ণব কবিতায়, ভাগবতে নয়। এই কারণেও ভাগবত জনচিত্ত জয়ে অসমর্থ।

বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উৎস ও ভাবাদর্শের দার্শনিক আশ্রয়স্থল হিসেবেই বাঙালি সমাজে ভাগবতের স্থান। তাই রামায়ণ মহাভারতের মত ভাগবত প্রবচনে, প্রাত্যহিক জীবনে বাঙালির জীবন সংস্কারে পরিণত হয়ে তার অস্থিমজ্জায় মিশে যেতে পারেনি। অন্যদিকে ভাগবতে রাধাপ্রসঙ্গ না থাকাটাও এর জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান তার সরলতার গুণে যেমন জনসাধারণর হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, তেমনি কাব্য প্রচারিত ভক্তিবাদ যাবতীয় তত্ত্ব অতিক্রম করে চিত্তজয়ে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু ভাগবতে কাহিনি গৌণ, তত্ত্বের আবেদন মুখ্য। তাই জনসাধারণ এই কাব্যের রসপ্রাপ্তির জন্য বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রেও পণ্ডিতের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকেছে। এই বিশেষ কারণেই কৃত্তিবাস ও কাশীরামের কোন অনুবাদ গ্রন্থের মত ভাগবতের কোন অনুবাদ জনচিত্তে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। বিশেষভাবে মনে হয়, কৃত্তিবাস ও কাশীরামের মত কোন প্রতিভাধর কবি ভাগবত অনুবাদে আবির্ভূত হননি। এই উন্নত কবি প্রতিভার অভাবেই অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় ভাগবত অনুবাদ তেমন পুষ্টিলাভ করেনি। সর্বোপরি রামায়ণ মহাভারতের তুলনায় ভাগবতের স্বল্প সংখ্যক পুথিই প্রমাণ করে ভাগবতের জনপ্রিয়তা সেকালে যথেষ্টই কম ছিল। তাছাড়া রামায়ণ-মহাভারতে কাব্যরসের যে বিপুল প্রবাহ আছে, ভাগবত অনুবাদ এই ব্যাপারে অনেক দূরে অবস্থিত। এই সব কারণেই রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদের তুলনায় ভাগবতের অনুবাদ এত কম।

১০.১৬ ঃ অনুশীলনী

১। পঞ্চদশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় দিন।

২। বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ভাগবত অনুবাদকের অনুবাদ কর্মের প্রকৃতি ও কবিত্ব প্রতিভার পরিচয় দিন।

৩। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-এর রচয়িতা মালাধর বসুর জীবনবৃত্তান্তের পরিচয় দিয়ে তাঁর কাব্যের উৎস, গ্রন্থ ঋণ ও মৌলিকতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের এইরূপ নামকরণের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের গুরুত্ব ও কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

৬। টীকা লিখুন — শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভক্তি ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ।

৭। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে বাঙালিয়ানার পরিচয় দিন।

৮। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের সমাজ জীবনের পরিচয় দিন। মন্তব্য

৯। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের কাব্যমূল্য বিচার করুন।

১০। ভাগবতের অন্যান্য অনুবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১১। বাংলায় ভাগবত অনুবাদ সীমিত হওয়ার কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১০.১৭ ঃ গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — ড. সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা — শ্রীভূদেব চৌধুরী।

মন্তব্য

একক ১১ - দৌলতকাজীর ঃ লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না

বিন্যাসক্রম

১১.১ ঃ উদ্দেশ্য।

১১.২ ঃ ভূমিকা।

১১.৩ ঃ আরাকান (রোসাঙ) রাজসভার কবি ও কাব্য।

১১.৪ ঃ আরাকান (রোসাঙ) রাজসভার বাংলা সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতা।

১১.৫ ঃ কবি দৌলতকাজীর পরিচয়।

১১.৬ ঃ কাব্য রচনাকাল।

১১.৭ ঃ কাব্য পরিচয় ঃ রোমান্টিক আখ্যানধর্মী।

১১.৮ ঃ কাব্যের উৎস ও নামকরণ প্রসঙ্গ।

১১.৯ ঃ কাহিনি পরিকল্পনা।

১১.১০ ঃ 'লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না'-র চরিত্র বিচার।

১১.১১ ঃ 'লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না'-র কাব্যমূল্য।

১১.১২ ঃ দরবারি সাহিত্য হিসাবে 'লোরচন্দ্রানী'-র গুরুত্ব।

১১.১৩ ঃ লোরচন্দ্রানী-তে অন্যান্য সাহিত্যের প্রভাব।

১১.১৪ ঃ অনুশীলনী।

১১.১৫ ঃ গ্রন্থপঞ্জি।

মন্তব্য

১১.১ ঃ উদ্দেশ্য

মধ্যযুগের দেববাদ নির্ভর সাহিত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার সাহিত্যকীর্তি হল দৌলতকাজীর 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী'। সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আলোচনার বিষয়। কারণ দেবতা নির্ভর দেশ প্রশস্তিমূলক মনুষ্যত্ববোধকে রাতারাতি দূরে সরিয়ে নতুন মন্ত্রে মানব প্রেমের বন্দনা গান গাইলেন আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিগণ। তাই সপ্তদশ শতকের কবিদের মধ্যে সেই ভাব বিহ্বলতাময় আবেশ আরও গতিশীল হয়ে উঠল। তবে এর আগে অর্থাৎ চর্যাপদে, মঙ্গলকাব্যে, বিশেষভাবে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে রোমান্টিকতার শুভ সূচনার বিকাশ ঘটতে চলেছিল, কিন্তু তেমন সাহসী প্রতিভাধর কবির কাব্যে তার রূপ পাচ্ছিল না। সে প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের কাব্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। রোমান্টিক প্রেমের জোয়ারে ভেসে গেল দেবতার উদ্দেশ্য, পৃষ্ঠপোষণকারী রাজা ও রাজ অমাত্যের উদ্দেশ্যে প্রশস্তিবন্দনা। নদীর মতো সাহিত্যও তার গতি পরিবর্তন করে নতুন প্রাণের আবেদন নিয়ে আসে। সাহিত্যও নতুন ধারার আবেদনে মানুষকে কাব্যের নায়ক করে তুলতে লাগল। শত বাধা, শত চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষই প্রেমের জয়গানে, রোমান্টিকতায় মজে রইল। সেই রোমান্টিক প্রণয়াখ্যানের টাল-মাটালে দেবতা নির্ভর মধ্যযুগের দেবনির্ভরতা কিছুটা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বিশেষকরে রক্তমাংসে গড়া মানুষই রোমান্টিক আদিরস নিয়ে দরবারি সাহিত্যের জমিকে উর্বর করেছিল। এই রোমান্টিক আদিরসের প্লাবন ধারায় আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতিকে নিবৃষ্ট করেছিল। তাই এই সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্যমূলকতা অবশ্যই জরুরি।

সাহিত্য আপনা থেকে গড়ে ওঠে না। বিশেষ অঞ্চলে, বিশেষ সময়ে আবির্ভূত হন ভাষা-শিল্পী — যিনি যুগ ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে কল্পনা ও মননশীল বিশ্লেষণের সমন্বয়ে সাহিত্য-রূপবন্ধে মূর্ত করেন। তাই একটি সাহিত্য-কৃতির পরিচয় গ্রহণ করতে গেলে লেখকের স্থান, কাল ও জীবনতথ্যের বিবরণও প্রয়োজন হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতে বিদেশি শাসক-শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটল। সেই শাসকেরা অনেকেই ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ক্রমে এদেশের মানুষও কিছু কিছু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী বাঙালি সম্প্রদায় গড়ে উঠল বিশেষভাবে বাংলার পূর্বাঞ্চলে, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই আমরা বাঙালি মুসলমানের লেখা বাংলা গান ও কাব্যের সন্ধান পেলাম। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দে সেই চর্চা আরও বর্ধিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দে আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত কাব্য 'লোরচন্দ্রানী ও সতী ময়না'। বৌদ্ধ রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত মুসলমান কবি রচিত কাব্যটি বিভিন্ন দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কাব্যটিকে প্রকৃত অর্থে হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে আগে জেনে নিতে হবে আরাকান অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান সহ আরাকান রাজ্যের ও রাজবংশের ইতিহাস। জেনে নিতে হবে কীভাবে বাংলার পূর্ব-প্রান্তসীমায় গড়ে উঠল এই মিলিত জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির বাতাবরণ। জেনে নিতে হবে কীভাবে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ চর্চা-কেন্দ্র গড়ে উঠল এই অঞ্চলে। বর্তমান একক সেই ইতিহাসের পটচিত্রকেই তুলে ধরেছে পাঠকদের সামনে। এই একক-এর উদ্দেশ্য আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যচর্চার পরিমণ্ডল সম্পর্কে পাঠকদের ও শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

১১.২ ঃ ভূমিকা

মধ্যযুগে দেববাদ প্রশস্তিবাচক সাহিত্যের আবরণে খানিকটা চাপা পড়েছিল রোমান্টিক মানবধর্মী প্রেম। সেই আবরণ উন্মোচন করার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা দেখালেন আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিগণ।

দেববাদ নির্ভর মনুষ্যত্ববোধ এবং দেবপ্রশস্তিমূলক কাহিনীকাব্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান বিষয়। প্রথানুগত্যের ফাঁকে ফাঁকে হয়তো কবিরা সামান্য সাহসের পরিচয় দিয়েছেন বিশুদ্ধ মানব বন্দনায়। কিন্তু সে অতি সামান্য। তা না হলে বিষয়ে, চরিত্রে, আখ্যান পরিকল্পনায় সর্বত্রই দেবতার কৃপা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে বর্ষিত হয়ে বিকাশের স্বাভাবিকতাকে ব্যাহত করেছে। একই খাতে ও ধারায় চলতে চলতে কাব্যধারা হয়েছে মন্থর এবং অনেকটাই শিথিল। প্রেমের কিংবা আদিরসের মত বিষয়কেও কবিরা ভক্তির মোড়কে পরিবেশন করতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এটাই কিন্তু শেষ পরিচয় নয়। নদীর গতি পরিবর্তনের

মন্তব্য

মত তারও গতি পরিবর্তন এবং বাঁক ফেরার ইঙ্গিত আছে। আখ্যানকাব্যের কোন কোন বিষয়ে, কোন কোন চরিত্রে রক্তমাংসের বাস্তব মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট মানুষ উঁকি দিয়েছে। বিশেষভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিপুল ধারায় যেখানে রাধা কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেম কীর্তিত, সেখানে ভক্তি আবরণ সরালে তো বটেই, না সরালেও কবিরা যে তাঁদের চোখের সামনের মানুষের প্রেমসম্পর্ককেই রূপ দিয়েছেন, সন্দেহাতীতভাবে তা স্পষ্ট। সামান্য হলেও এইভাবে বাস্তব মানুষের প্রেম চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তাও ভক্তির আড়ালে, দেবতাশ্রয়ী রূপকের আবরণে। রক্ত-মাংসের মানুষের কথা, তার ভাবনা-চিন্তা প্রেমাকুতির কথা তখনও পর্যন্ত অধরাই। এই সংশয় এবং অক্ষমতা দূর করতেই যেন চট্টগ্রামের আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিরা কলম ধরেছিলেন।

পূর্ববর্তী আখ্যান কাব্যের প্রথার প্রভাবে এই কবিরাও হয়তো দেবতার উদ্দেশ্যে, পৃষ্ঠপোষক রাজা ও রাজ অমাত্যের উদ্দেশ্যে প্রশস্তিমূলক বন্দনা গেয়েছেন। কিন্তু কোনোভাবেই মুক্ত প্রাণের প্রতীক রোমান্টিক প্রেমের পথরোধ করে মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতাকে মুখ্য করে তোলেননি। এই ধারার প্রথম সার্থক কবি দৌলত কাজী। দ্বিতীয় কবি সৈয়দ কবি সৈয়দ আলাওল। দুজনেই আরাকান রাজসভার কবি এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কবি।

প্রেক্ষাপট ও স্বাতন্ত্র্য ঃ- কবি দৌলত কাজী একেবারে রাতারাতি নতুন ভাবনার আমদানি করলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে এমনটা ভাবা সঙ্গত নয়। চর্যাপদে, মঙ্গলকাব্যে, বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলীতে মানবের যে প্রেমাকাঙ্খা দেবভাবনার আড়ালে উঁকি দিচ্ছিল, অথচ কোন প্রতিভাধর প্রবর্তক কবির কাব্যে তা রূপ পাচ্ছিল না — পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান কবিরাই প্রথম বিশুদ্ধ অর্থে মানব প্রেমের বন্দনা গান গাইলেন। হয়তো তা বিষয়-বিন্যাসে কাব্য পরিকল্পনা লাভ করল না; কিন্তু তার সূত্রপাতটি ঘটে গেল এই কবিদের হাতেই। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রধান তিন মুসলমান কবি — শাহ মুহম্মদ সগির, জৈনুদ্দিন ও মোজাম্মিল। যদিও কোথাও কোথাও এঁদের ষোড়শ শতাব্দীর কবি বলা হয়েছে। এঁদের কেউ কেউ কোরান, হাদিস, পীর-পয়গম্বর আল্লা প্রমুখ ধর্মীয় ভাবনাকে কাব্যের বিষয় করে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। আবার কোন কোন কবির কাব্য বিষয় সম্পূর্ণ অর্থে মানব প্রেম। শাহ্ মুহম্মদ সাগিরের 'ইউসুফ জোলেখা'-ই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের 'প্রথম পার্থিব প্রেমের কাব্য। সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''....যখন হিন্দু কবিরাও দেবদেবী ভিন্ন লৌকিক কাহিনি গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেন না, তখন এই মুসলমান কবি পার্থিব কাহিনি লইয়া যে রোমান্টিক আখ্যানকাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড ঃ ১ম পর্ব)। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই জাগতিক প্রেমেরই পরিপুষ্টি বিধান করেছিলেন আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজী এবং সৈয়দ আলাওল।

ধর্মমতে আরাকান রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। এই বৌদ্ধ রাজসভাতেই আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় মুসলিম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ চট্টগ্রামের আরাকান ঐ সময় থেকেই আরবী ও বাঙালী মুসলমানের বাণিজ্য ও যাতায়াতের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে গৌড়ে পাঠান শাসনের অবসানে ঐ অঞ্চলের বাংলা সাহিত্যচর্চা সুদূর আরাকানে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু আরাকান নয়, বাংলা সাহিত্যের চর্চা পল্লবিত হয় ত্রিপুরা, কামরূপ, চট্টগ্রাম, মল্লভূম প্রভৃতি বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে। ''বাংলাদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে আরাকান রাজসভার সঙ্গে গৌড় রাজসভার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। গৌড়ের বাঙালী মুসলমানগণ রোমাঙ্গে যাওয়া-আসা করতে শুরু করেন। ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় গড়ে ওঠে' (সতীময়না ও লোরচন্দ্রীণী, সম্পাদনা ঃ ড. মযহারুল ইসলাম, ড. দুলাল চৌধুরী)। আরাকানের বৌদ্ধমগ রাজারা বাংলা ভাষা বুঝতেন না। কিন্তু এই রাজাদের বিশ্বস্ত বাহালী মুসলমানগণ, যাঁরা প্রধানমন্ত্রী, অমাত্য, সমর সচিব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্মানীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা বাংলা ভাষা বুঝতেন এবং হিন্দুদের মতো বাংলা ভাষাচর্চায় অনুরাগী ছিলেন। প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত বাংলা সাহিত্য অনুরাগী এই মুসলমান অমাত্যবর্গই কবি সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করতেন বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে।

মেঙৎ-চৌ-মৌন, থিরি-থু-ধুম্মা, নরপদিগ্যি, সান্দ-থু-ধম্মা, থদো মিন্তার প্রমুখ আরাকান বৌদ্ধ রাজাদের শাসনকার্যে এইরকম অনেক গুণী দক্ষ মুসলমান অমাত্যের উপস্থিতি ঘটেছিল। যাদের কর্মদক্ষতায় এবং সাহচর্যে মুগ্ধ বৌদ্ধ রাজারা মুসলমান উপাধি গ্রহণ করে এবং মুদ্রায় তা উৎকীর্ণ করে গৌরব বোধ করতেন। এইরকম এক বৌদ্ধরাজা থিরি-থু-ধম্মা বা শ্রীসুধর্মার (১৬২২-১৬৩৮ খ্রীঃ) অমাত্য ছিলেন আশরফ খান। যাঁর উৎসাহ ও আদেশে কবি দৌলত কাজী তাঁর 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' নামক বিখ্যাত কাব্যটি রচনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রী সুধর্মার সময় থেকেই রোসাঙ রাজদরবারে বাংলা সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে এইরকম অনেক গুণী ও সাহিত্যরসিক

অমাত্যের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার ধারা অব্যাহত ছিল। বৌদ্ধরাজ থদে মিন্তারের প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুর, যিনি নিজেও একজন বড় কবি, তিনিই বিপদে পতিত কবি আলাওলকে বিপদমুক্ত করেন। এঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় এবং উৎসাহদানে আলাওল লেখেন বিখ্যাত 'পদ্মাবতী' কাব্য এবং কবি হিসেবে সুপরিচিত হন।

১১.৩ঃ আরাকান (রোসাঙ) রাজসভার কবি ও কাব্য

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তথা সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে-ইসলামীয় বাংলা সাহিত্যের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয় নব দিকনির্ণায়ক হিসাবে। যদিও পুরাণে বাংলা সাহিত্যেও ঐদিকনির্ণায়ক রসবস্তুটি প্রকট প্রচ্ছন্ন দুই অবস্থাতেই ছিল কিন্তু তা ছিল পূজা দেবপূজা সম্পুটে দৈবী মহিমার অর্ঘ্যপাত্র কোরকে নিবদ্ধ — আদিরস। আর বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় প্রণয়কাহিনিও লেখা হয়েছিল মুসলমান আনুকুল্যে। সর্বাপেক্ষা পুরানো যে লৌকিক প্রণয়কাব্য, বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত হয়েছে তা হোসেন শাহের পুত্রের রাজত্বকালে এবং তাঁরই নাতির নির্দেশে লেখা বলে অনুমান করা হয়। কবি দ্বিজ শ্রীধর-এর রচিত কাব্যের যে খণ্ডিত পুথি চাঁটিগাঁ অঞ্চলে পাওয়া গেছেঃ তার ভণিতায় পেরোজ সাহার উল্লেখ প্রমাণ করে 'দ্বিজ শ্রীধর' নুসরৎ সাহার পুত্র যুবরাজ ফিরোজ বা ফিরুজ 'শাহার' অনুচর ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রাপ্ত আর এক মুসলমান কবির বিদ্যাসুন্দরের খণ্ডিত পুথিতে দেবদেবী মহিমার মোড়ক ছিল না। আর যে হিন্দী-গুজরাটী কাব্যে ভোজ বিক্রমাদিত্যের বাহাদুরী গল্প এবং বাংলা কাব্যের লৌকিক কাহিনি দেব কেরামতির উপর নির্ভরশীল ছিল তার-দিক্ পরিবর্তন হতে লাগল এই সময় প্রেম-রোমান্স কাহিনির উত্তুঙ্গ ঊর্মীতে।

পাঠান রাজত্বে গৌড়দরবারকে আশ্রয় ও কেন্দ্র করে যে পশ্চিমাঞ্চলের — (পূর্বী হিন্দী ও ফরাসী ভাষা হইতে) লৌকিক প্রণয় কাব্যের বস্তু বাংলা সাহিত্যে আমদানি হল — আর চাহিদা ও কদর গৌড়ে যথার্থ স্থান ও রূপ পেল না। গৌড় দরবারের সেই নির্বাপিত ধূমায়মান বর্তিকা শিখা বহুগুণিত শিখা সমন্বিত দীপ্ত হয়ে জ্বলে উঠল বাংলা সীমান্তের সীমান্তবর্তী সামন্ত রাজসভাগুলিতে — কামতা কামরূপে, শ্রীহট্টে, ত্রিপুরায়, দরঙ্গ কাছাড়ে, সিলেট চাটিগাঁ-রোসাঙে, মল্লভূম-ধলভূমে। চাটিগাঁয়ে হোসেন শাহের প্রতিরাজ লস্কর পরাগল খান ও তাঁর পুত্র নুসরৎ খান গৌড় দরবারে অনুরূপ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রতিবেশ গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেও যোগ্য কবি পণ্ডিতের অভাবে তা ফলপ্রসূ ও রূপায়িত হয়নি। কিন্তু পরাগল নুসরতের ঐ পূর্বতন প্রচেষ্টার বীজই পরবর্তীকালে চাটিগা-রোসাঙ্গে (আরকানে) উল্লেখযোগ্য সাহিত্য মহীরূহে পরিণত হয়।

আরাকান রাজসভার অপর নামই হল রোসাঙ রাজসভা আরকান অধিবাসীরা নিজেদের 'রখইৎ' নামে পরিচয় দিতেন। ফলে ঐ 'রেখইৎ' শব্দ থেকেই 'রোসাঙ' শব্দের উৎপত্তি। রোসাঙ বা আরাকান রাজসভা ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত চাটিগাঁ (চট্টগ্রাম) সন্নিহিত হওয়ায় বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগসূত্র গভীরতর। এবং এই রাজসভায় বাঙালী অমাত্যদের প্রভাব ও প্রাধান্য সম্পর্ক থাকায় বাংলাবাষা দ্বিতীয় মাতৃভাষার মর্যাদা পেতে তাকে। এই অমাত্যরা বাঙালী মুসলমান হওয়ায় এঁদের সাহায্যেই বাঙালী মুসলমান কবিরা কাব্যরচনার উপযোগী সুযোগসুবিধা লাভ করেছিলেন। যার ফলশ্রুতি হিসাবে আরকান দরবার কেন্দ্রিক সাহিত্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও এই সপ্তদশ শতাব্দীতে চাটিগ্রাম ও আরকানে সৈয়দ সুলতান, মহম্মদ খান হাজি মহম্মদ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে মহম্মদ খান সবচেয়ে শক্তিশালী কবি ছিলেন, এর অধিকাংশ কাব্যই ইসলাম ধর্মের গৌরব বিষয়ক। কেবল সত্যকলি বিবাদ সংবাদ কাব্যটি রূপকধর্মী এবং হিন্দু ধরনের। কিন্তু 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ' কাব্য কাব্যশক্তিতে নিম্নমানের ও ইসলাম কেন্দ্রিক হওয়ায় তা হিন্দু সমাজে তেমন সাড়া ও প্রভাব ফেলতে পারেনি। অন্যদিকে সৈয়দ সুলতান ইসলামী বিষয় ও সুফী সাধনাকে কেন্দ্র করে হিন্দুযোগতন্ত্র ঘেঁষা পুস্তিকা লিখে মুসলমান সমাজে সমাদৃত হন। তিনি আটখানি কাব্য রচনা করেছিলেন এবং তাঁর নামে কিছু গানের সংগ্রহ পাওয়া গেছে। ঠিক এ সময়ে আরকান রাজ দরবারকে কেন্দ্র করে দু'জন বিখ্যাত কবির আর্বিভাব ঘটে যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান সমাজে সমানভাবে গ্রহণীয় ও সমাদৃত হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা হলেন দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল। এঁরা দুজনেই পূর্ব আমদানীকৃত হিন্দী-ফার্সী রোমান্সের সুরে আংশিক পরিবর্তন ও পুষ্টি সাধন করেন। এই কবিদের আখ্যান কাব্যগুলিকে স্বাধীন কাব্য বলে অভিহিত করা হয়। বাংলা পুরাণ অনুবাদের ধারায় এগুলি নবতর সংযোজন। দেবী মহিমার খোলস ছেড়ে এই কাব্যগুলি মানবরসের ধারায় অভিসিঞ্চিত — প্রণয় কাহিনির কামকেলী উচ্ছ্বাস এবং সুফী ভাব চিন্তার উৎকৃষ্ট ফসল।

উক্ত রোসাঙ রাজসভায় অন্যান্য মুসলমান কবিদের মধ্যে আমরা 'জ্ঞান প্রদীপ' 'নবীবংশ' প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা 'সৈয়দ সুলতান, মহম্মদ খান রচিত মুক্তাল হাসেন শাহু, মহম্মদ সগীর রচিত

মন্তব্য

'ইউসুফ জোলেখা' প্রভৃতি কাব্যের নাম করা যায়। এছাড়া 'কারবালা'র যুদ্ধ এজিদের কথা' 'লায়লা মজনুর' প্রেমকাহিনিও উল্লেখযোগ্য। অন্যদিক মৈমনসিংহ গীতিকা পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র মানব রস কেন্দ্রিক প্রেম আখ্যানগুলি একটি নতুন মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে হাজির হয়েছে। যারা 'আমাদের অন্তরে' স্থান করে নিয়েছে অনায়াসে এবং পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের গতিটিকে করেছিল নিয়ন্ত্রিত বেগবান আধুনিক। ফলে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাবিত রচিত আদিম নিষাদ - কিরাত - জাতি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে ইসলামী সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার ফলে সৃজিত রোসাঙ রাজসভার মুসলমানী সাহিত্যের অবদান এক যুগান্তকারি ঘটনা, যা বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যে চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

১১.৪ ঃ আরাকান (রোসাঙ) রাজসভার বাংলা সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতা

থিরি-থু-ধম্মা (শ্রীসুধর্মা) রোসাঙ সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সেই সময় তিনি রাজ্য পরিচালনা করেননি। জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে সিংহাসনে বসলেই এক বছরের মধ্যে তিনি মারা যাবেন। তাই তিনি মন্ত্রী আশরফ খানের হাতে রাজত্বভার দিয়ে বনবিহার, শিকার, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির মধ দিয়ে কাল কাটান। বারো বছর এভাবে কাটিয়ে তাঁর মনের পরিবর্তন হয়। ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজ্য পরিচালনার ভার নেন এবং ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শত্রুহস্তে নিহত হন।

থিরি-থু-ধম্মার আমলে প্রকৃতপক্ষে রাজকার্য পরিচালনা করেছেন তাঁর মন্ত্রী আশরফ খান। দৌলত কাজী রাজপ্রশস্তি প্রসঙ্গে বলেছেন —

'নামে শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতারি।'

মন্ত্রী আশরফ খান সম্বন্ধে দৌলত কাজী বলেছেন —

'শ্রীযুক্ত আশরফ খান অমাত্য প্রধান।
যোলকলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান।।'

এঁর হাতে রাজা রাজ্যভার অর্পণ করেছিলেন। দৌলত কাজী লিখেছেন —

'মহারাজ আয়ুশেষ জানি শুদ্ধ-মন।
তান হস্তে রাজনীতি কল্য সমর্পণ।।'

আশরফ খান অমাত্য হয়েও নিম্ন-বর্মা আরাকান অঞ্চলে বঙ্গ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা তথা প্রণয়-কাব্য চর্চার পৃষ্ঠপোষণা করেন। দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রাণী ও সতী ময়না' কাব্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনিই —

'ঠেঁট চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারি ভাষা কোনো কোনো জনে।।
দেশী ভাবে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে।।
তবে কাজি দৌলতে বুঝিয়া আরতি।
পঞ্চালি রচিয়া কহে মধুর ভারতী।।'

দৌলত কাজী স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, আশরফ খানের ইচ্ছানুযায়ী সাধনের কাব্যকথাকে পাঞ্চালীর ছন্দে রূপ দিয়েছেন তিনি।

রাজা শ্রীসুধর্মার অমাত্য আশরফ খানের কথামতো দৌলত কাজী কাব্য রচনা করেন। তিনি অবশ্য কাব্যটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। তাঁর অসমাপ্ত কাব্যকে সমাপ্ত করেন আর এক বড়ো — কবি সৈয়দ আলাওল। রাজা থদো মিন তার-এর (১৬৪৫ - ১৬৫২) মহামাত্য মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন সৈয়দ আলাওল। তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যের মাগন-প্রশস্তি অংশ থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। মাগনের মৃত্যুর পর কবি শ্রীচন্দ্রসুধর্মার মহাপাত্র সোলেমানের আশ্রয় লাভ করেন। এই সোলেমান আলাওলকে দৌলত কাজী রচিত অসম্পূর্ণ রসকথা 'লোরচন্দ্রাণী' সম্পূর্ণ করার ভার দেন।

সোলেমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৬৩-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কবি আলাওল ইউসুফ গদা রচিত ইসলামি স্মৃতিশাস্ত্র 'তোহ্‌ফা' অনুবাদ করেন। থদো মিনতার-এর রাজত্বকালের মধ্যেই 'পদ্মাবতী' রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। আর চন্দ্রসুধর্মার আমলে মাগনের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল'

রচনা শুরু হয়েছিল। সেটি ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ রচনা সম্পূর্ণ করলেন চন্দ্রসুধর্মার মহাপাত্র সোলেমানের অমাত্য সভায়। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের পৃষ্ঠপোষকতায় আলাওল নিজামীর ফারসি কাব্য 'হপ্ত পয়কর'-এর অনুবাদ করেন। এরপর কবি আলাওলের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। কোনো কারণে তিনি সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের বিরাগভাজন হন এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। 'হপ্ত পয়ক'র-এর অনুবাদ রচনার পরের রচনা 'তোহ্‌ফা'র কথা বলেছি। কারাবাস ভোগ করার পর কবি আবার সোলেমানের সান্নিধ্যে এসেছেন। এরপর ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে রোসাঙে-র রাজ-অমাত্য সৈয়দ মুসার পৃষ্ঠাপোষকতায় অসমাপ্ত কাব্য 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল' কাব্যের শেষাংশ সমাপ্ত করেন। তিনি ১৬৭৪ সালে মজলিস নবরাজ্যের (অমাত্য) পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন 'সেকেন্দার নামা'। এই নিজামী রচিত ফারসি কাব্য 'ইসকান্দারনামা'র অনুবাদ।

''দৌলতকাজী এবং আলাওল দু-তিন দশকের ব্যবধানে যে অমাত্যসভার সংস্পর্শে আসেন তা ছিল সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার কেন্দ্রস্থল।

আশরফ খান ও মাগন ঠাকুরের অমাত্য সভায় আরবী ফারসি হিন্দী সংস্কৃত সর্বোপরি বাংলা ভাষার চর্চা হত। গুজরাতী ভাষার চর্চার কথাও জানা যায়। পুরাণ, নীতিবিদ্যা, কাব্যশাস্ত্র, সঙ্গীতকলা, রাজসভায় বহুবিধ শাস্ত্রের চর্চা কবিদেরও অল্পবিস্তর প্রভাবিত করেছিল। মুসলমান কবি হয়েও দৌলত কাজী ও আলাওল দুজনেই রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, কালিদাসের কাব্য-নাটক, জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রমুখ কবির রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। রাজসভার কবি হিসাবে দৌলত কাজী ও আলাওল উভয়েরই নাগরিক চেতনা বৈদগ্ধ্যের ভিতর দিয়ে বিকাশ লাভ করেছিল।''

('লোরচন্দ্রাণী ও সতী ময়না' — ভূমিকা, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

১১.৫ ঃ কবি দৌলতকাজীর পরিচয়

দৌলতকাজী বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি তাঁর কাব্যে নিজের সম্পর্কে কোনো কথা লিখে যাননি। শুধু ভণিতা অংশে নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে এইটুকুই জানা যায় যে, তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা শ্রীসুধর্মা এবং রাজ-অমাত্য আশরফ খান। বিশেষত আশরফের অনুগ্রহেই তাঁর কাব্যজীবন পরিচালিত হয়েছিল। বিভিন্ন সূত্র থেকে তাঁর সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি হল দৌলতকাজী চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামের এক কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের তারিখ বা সাল কিছুই পাওয়া যায়নি। দৌলতকাজীর কাব্যের বেশিরভাগ পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে। চট্টগ্রামের সুলতানপুর গ্রামে কবির বাস্তুভিটার চিহ্নও আবিস্কৃত হয়েছে। এর থেকেই অনুমান করা হয় কবি চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভণিতায় কাজী উপাধির ব্যবহার দেখে মনে হয় তিনি সম্ভ্রান্ত কাজী বংশে জন্মেছিলেন। কাব্যের মধ্যে কবি রোসাঙ্ রাজ শ্রীসুধর্মার প্রশংসা করেছেন। এই রাজার রাজত্বকাল ১৬২২-১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। কবির জন্মমৃত্যুর তারিখ পাওয়া যায় না। শ্রীসুধর্মার রাজত্বকালের মধ্যেই অর্থাৎ ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কবি মারা যান। কেন-না পরবর্তী দশকের কবি আলাওলের সঙ্গে দৌলতকাজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা তা ইতিহাস থেকে জানা যায় না। দৌলতকাজী তাঁর কাব্য অসমাপ্ত রেখে মারা যান।

কবি তাঁর কাব্য 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না'র রচনাকাল জানাননি। কাব্যের শেষে হয়ত তিনি জানাতেন কিন্তু শেষ করার সুযোগ তিনি পাননি। কাব্যে তিনি শ্রীসুধর্মার প্রশংসা করেছেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৬২২-১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল মনে করেন — এর মধ্যবর্তী যে কোনো সময় কাব্যটির রচনাকাল। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন ১৬৩৫ থেকে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাব্যটির রচনাকাল। কবি লিখেছেন ''মহারাজ প্রসাদে সর্বত্রে লোক সুখি''। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত রাজত্বকাল অর্থাৎ রাজ্যাভিষেকের সময় থেকে রাজার মৃত্যুর সময়ের মধ্যবর্তী কালকে ধরেছেন। অনেকে বলে থাকেন যে, শ্রীসুধর্মার প্রকৃত রাজ্যাভিষেকের ঘটনার উল্লেখ কাব্যের মধ্যে নেই। সেইজন্য ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আগেই এই কাব্য রচিত হওয়ায়র সম্ভাবনা। কবি কেবল আশরফ খানের হাতে রাজ্যভার প্রদানের ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বনবিহার থেকে ফিরে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজ্যভার স্বহস্তে পরিচালনা করার সম্পর্কে কোনো কথাই বলেননি। সুতরাং ১৬৩৫-এর আগেই দৌলতের রচনার কাজ শেষ হয়েছিল এবং কবির মৃত্যুও ঘটেছিল — এমন অনুমান করা যেতে পারে।

মন্তব্য

১১.৬ ঃ কাব্য রচনাকাল

কবি পরিচয়ের মত প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যের রচনাকালও সংশয়নির্ভর, অনুমানসাপেক্ষ। কোন কোন কবি অবশ্য সাংকেতিক প্রহেলিকাময় ভাষায় কাব্যরচনাকালের ইঙ্গিত গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করায় মনোযোগী হয়েছেন। কিন্তু সেখানে এই জাতীয় সংকেত নেই, যেমন দৌলতকাজীর কাব্যে যেখানে পৃষ্ঠপোষক রাজার শাসনকাল সহ অন্যান্য তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে অনুমান ও সম্ভাবনার সাহায্যে গড়ে তোলা সেই রচনাকালকে যথার্থ বলে কোনোভাবেই দাবী করা যায় না। সেক্ষেত্রে 'সতীময়না' কাব্যে আরও জটিলতা উপস্থিত। কেননা দৌলতকাজীই এই কাব্যের একমাত্র কবি নন, তাঁর অসমাপ্ত কাব্যকে সমাপ্ত করেন আলাওল। অতএব শুরু এবং শেষ এই দুই মিলেই 'সতীময়না' কাব্যের পরিপূর্ণ কাব্যরচনাকাল।

দৌলতকাজীর 'সতীময়না' কাব্যে নির্দিষ্ট কোন সন তারিখের উল্লেখ নেই। ড. সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল ১৬২২ থেকে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাব্যটির রচনাকাল বলে অনুমান করেছেন। রোসান রাজ শ্রী সুধর্মার রাজত্বকাল বিস্তৃত ১৬২২-১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। রোসান রাজ শ্রীসুধর্মা কিন্তু ষোল বছরের রাজত্বকালের দীর্ঘ বারো বছর রাজা থেকেও অভিষিক্ত হননি। অর্থাৎ তিনি অনাভিষিক্ত রাজা ছিলেন। ড. ঘোষাল মনে করেন, ''....ইহার কারণ, এক গণৎকার নাকি ভবিষ্যদ্বানী করেন যে, রাজ্যাভিষেকের এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। সেজন্য ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়, নরবলি প্রভৃতি নানা ভয়াবহ অনুষ্ঠান সহযোগে'' (বিশ্ববারতী প্রকাশিত সাহিত্য প্রবেশিকা, ১ম খণ্ড)। রাজা সুধর্মার অভিষেক না হওয়ার ঘটনা সমর্থিত হয় দৌলত কাজির নিজের বক্তব্যে —

'মহারাজা আয়ুশেষ জানি শুদ্ধ মন।
তান হস্তে রাজনীতি কৈল্য সমর্পণ।।'

বক্তব্যটিতে সুধর্মা রাজা হয়েও আশরফ খানের রাজ্য পরিচালনার কথা সমর্থিত হয়। একইভাবে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যদি রাজা সুধর্মার রাজ্যাভিষেক ঘটে এবং দৌলতকাজীর কাব্যে তার বর্ণনা মেলে; তাহলে প্রমাণিত হয় দৌলতকাজী ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন এবং কাব্যরচনায় নিয়োজিত ছিলেন। কাব্যরচনা সম্পর্কিত এই সংশয় জটিলতায় ড. মযহারুল ইসলাম সুচিন্তিত মতামত পোষণ করেছেন, ''....কবি ত্রিশ বছর বয়সে শ্রী সুধর্মার রাজ্যসভায় ১৬২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে প্রবেশ করেন এবং ১৬৩০-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে 'সতীময়না' কাব্যটি রচনা আরম্ভ করেন ও ১৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের দিকে কাব্যটি অসমাপ্ত রেখেই মৃত্যুমুখে পতিত হন'' (সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী, সম্পাদনা ড. মযহারুল ইসলাম, ড. দুলাল চৌধুরী)। শেষপর্যন্ত অনুমান করতে হয় যে ১৬৩০-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে দৌলতকাজী কাব্য রচনা আরম্ভ করেন এবং ১৬৩৫-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় মৃত্যুবরণ করেন এবং কাব্যটি অসমাপ্ত থাকে।

'সতীময়না' কাব্যের এই অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেন কবি সৈয়দ আলাওল। আরাকান রাজ সান্দ-থু-ধম্মা বা চন্দ্রসুধর্মার (১৬৫২-৮৪ খ্রী.)। রাজত্বকাল মুখ্য অমাত্য ছিলেন সুলেমান। এই সুলেমানের নির্দেশেই কবি 'সতীময়না' কাব্য সমাপ্ত করেন এবং প্রহেলিকাময় পয়ারে সমাপ্তিকাল নির্দেশ করেন —

'মুসলমানী শকসংখ্যা শুন দিআ মন।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধি মন্ত জন।।
সিন্ধু শূন্য দেখিআ আপনা দুই দিগে।
সূত কলানিধিরে রাখিলা বাম ভাগে।।
মগদের সনের শুনহ বিবরণ।
যুগ শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাঙ্কন।।'

সাংকেতিক স্তবকটি থেকে পাওয়া যাচ্ছে, সিন্ধু অর্থে সমুদ্র অর্থাৎ সংখ্যা ৭, কলানিধি অর্থে চন্দ্র অর্থাৎ ১, গণনাটি সম্পূর্ণ করলে দাঁড়ায় মুসলমানী শক অর্থাৎ ১০৭০ হিজরী। আবার ১০৭০ হিজরী সমান ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। আবার মগী সনের বিচারে দেখা যাচ্ছে — এক জোড়া শূন্যের মধ্যে যুগ অর্থাৎ ২ এবং মৃগাঙ্ক অর্থাৎ চন্দ্র, সংখ্যা হল ১, স্বভাবতই যথার্থ মগী সনটি হল ১০২০। মগী সনের সূত্রপাত ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব আলাওল রচিত সংকেতটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 'লোরচন্দ্রাণী'র সমাপ্তিকাল ১০২০ + ৬৩৮ = ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং 'সতীময়না' কাব্যটি দৌলতকাজী আরম্ভ করেন আনুমানিক ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এবং আলাওলের হাতে কাব্যটি সমাপ্ত হয় মোটামুটি ১৬৫৮-১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

মন্তব্য

১১.৭ ঃ কাব্য পরিচয় ঃ রোমান্টিক আখ্যানধর্মী

বাংলা ভাষায় রচিত দৌলতকাজীর 'সতীময়না' আদ্যন্ত রোমান্টিক কাব্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। রোমান্টিকতা বা রোমাঞ্চ মানুষের স্বভাব ধর্ম। স্রষ্টা হিসেবে মানুষের সেই স্বভাব ধর্মের ছায়াপাত ঘটে সাহিত্যে শিল্পে। দৈনন্দিন তুচ্ছতা ও একঘেঁয়েমিতার ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির মধ্যে মানুষ হাঁপিয়ে উঠে রোমান্সের জগৎ আমদানি করতে চায়। কেননা ঐ জগৎ আশ্চর্য বর্ণরঙিন, 'কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগের সমাবেশ' এই জগতেই মেলে। সীমার জগৎ হারিয়ে গিয়ে রোমান্টিক মনে চেনা জগতের বাইরে অন্য এক অচেনা জগতের রহস্যময়তা জেগে ওঠে। দৌলতকাজী 'সতীময়না' কাব্যে এই ধারারই দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। তবে বিদেশী প্রভাব নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর অপূর্ব প্রেমচিত্র, তাঁর কাব্যে প্রভাব ফেলেছে।

'সতীময়না' পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যে বিচ্ছিন্নভাবে রোমান্টিক আবহ গড়ে উঠলেও, পার্থিব প্রেমকে অবলম্বন করে রোমান্স এমন উদ্দাম হয়ে ওঠেনি। আলোচ্য কাব্যে জাগতিক প্রেম নির্ভর রোমান্টিকতাই প্রধান সুর, বাইরের বিচ্ছিন্ন উপাদানও এই ভাবনার প্রতিবন্ধক নয়। রোমান্টিক কবি মানস সীমাহীন সৌন্দর্য চেতনা, অসীমের প্রতি একজাতীয় বিস্ময়বোধ, অপ্রাপ্তিজনিত বিষাদ কাতরতা, রহস্যময় ব্যঞ্জনাধর্মীতার প্রতি ধাবিত হয়। অবাধ কল্পনার বিস্তারে প্রতিনিয়তই স্বাভাবিকতা ও সম্ভাবতার সীমা লঙ্ঘিত হয় বলেই রোমান্স ধর্মে লোককথা রূপকথার জগত প্রতিবিম্বিত হয়। পরিচয়ের মধ্যে অপরিচয়ের একটা আবেশ ঘনিয়ে আসে। 'সতীময়না'-কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও কাব্যভঙ্গীতে লোককথার স্পষ্টতা প্রথমেই একটা রোমান্টিক পরিবেশ গড়ে তোলে। বাস্তবে রাজা লোরের রূপসী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও চিত্রপট দর্শনে ব্যাকুল হয়ে সুন্দরী পরস্ত্রীর জন্য দুঃসাহসিক যাত্রায় সন্দেহাতীতভাবে রূপকথার রহস্য রোমাঞ্চজনিত রোমান্টিকতাই প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর শত বাধা-বিপত্তিকে জয় করে প্রেমসৌন্দর্যের প্রতীক চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলন, রূপকথার জগতের সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে ভিন্নদেশী বীরপুরুষ রাজপুত্রের কথাই মনে করায় —

'দেয়ালের চারি পার্শ্বে ফিরে রাজ লোর।
চন্দ্রের উদ্দেশে যেন ভ্রময় চকোর।।
দ্বারে দ্বারে দ্বারী জাগে হাল্কারে হুঙ্কারে।
কার শক্তি তদ্বারেতে দ্বার করিবারে।।
তবে লোর ভাবি চিন্তি দড়ির বরশি।
খেপিলেন্ত কুমারীর মন্দির উদ্দেশি।।'

পরিচিত জীবনের বাইরের রাজা লোরের অ্যাডভেঞ্চার ধর্মের মধ্যে রোমান্সের রহস্যময়তা দানা বেঁধে উঠেছে।

গা-ছমছমে পরিবেশ, ভীতি বিহ্বলতা অথচ পরকিয়া জনিত নিষিদ্ধ প্রেমের জগতের হাতছানি কাব্যের রোমান্টিক পরিবেশকে এমন আশ্চর্য সুন্দর করে তুলেছে। প্রেম সুন্দর, পরকীয়া প্রেম আরও সুন্দর। পরকীয়া প্রেমে থাকে বাধা-বিপত্তির বেড়াজাল। এই বেড়াজাল ছিঁড়ে অভিসার যাত্রায় থাকে নতুন জগতের হাতছানি। নবীনত্বের স্বাদে রোমান্টিকতার জগৎ পরিপূর্ণ বলেই মানুষকে, বিশেষ করে প্রেমিক মানুষকে তা এমন করে হাতছানি দেয়। সৌন্দর্য প্রতিমা ও রোমান্স একাকার হয়ে যায় বলেই স্বাভাবিকভাবেই জেগে ওঠে একধরণের বীরত্ব। এই বীরত্ব রোমান্টিক ধর্মের অপর এক বিশিষ্ট উপাদান। তবে শুধু বীরত্ব নয়, কেমন পরিবেশে এই বীরত্ব কল্পিত, সম্ভাব্যতার কথা ও যুক্তি-পরম্পরা তাতে লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা, সেটাও বিচার্য। দৌলতকাজীর রোমান্টিক কবিমানস এই জাতীয় বীরত্বের ছবি অঙ্কনে পুরোপুরি সফল। অপহৃতা চন্দ্রাণী সহ পলায়নপর লোরের সঙ্গে বামনের যুদ্ধ বর্ণনায় বীরত্বকেন্দ্রিক রোমান্টিকতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত —

'ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে লোর যেন অগ্নিসম শর
ব্যস্ত হৈল কুমার বামন।।
চোখা চোখা হানে শর জর্জরিত কলেবর
না পারে বামন সহিবারে।
শিথিল বামন মতি বুঝিয়া যে সে সারথি
রথ তারি রাখে তরু আড়ে।।'

রোমান্স রস দৌলতকাজীর কবিমানসকে পুষ্টিবিধান করেছে। কাব্যখানির সূত্রপাতে, বর্ণনাভঙ্গীতে এবং অগ্রগতিতে সেই রোমান্স রস চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। 'সতীময়না' কাব্যে রোমান্স রস এবং অন্যান্য যাবতীয় রোমান্টিক ধর্মের প্রধান আশ্রয় জৈবধর্ম দ্বারা পরিচালিত আবেগ জর্জর

মন্তব্য

রোমান্টিক প্রেম। কবি দৌলত কাজী এই রোমান্টিক প্রেমের বিচিত্র মূর্তি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে তার শিক্ষা প্রতিভারই পরিচয় রেখেছেন। ময়নার মধ্যে সতীত্বের নিঃকম্পা শিকায় একলক্ষ্যমুখী প্রেম চিত্রিত। বাহ্যবিচারে গৃহাভিমুখী এই প্রেমের রোমান্টিকতার লক্ষণ নেই বলেই মনে হয়। সৌন্দর্য ও আবেগের পাখায় ভর করে পথাশ্রয়ী প্রেমই রোমান্টিক প্রেমের একমাত্র নিদর্শন নয়। প্রিয়তমের জন্য ব্যাকুল হয়ে স্থির দেহেই আকাঙ্খা মনে জাগিয়ে রাখে সে, প্রিয়তমের আগমন বার্তার জন্য সে উন্মুখ হয়ে থাকে —মানস অভিসার পুষ্ট সেই প্রেমও রোমান্টিক। তাছাড়া বিষাদ কাতরতা, মিলনোত্তর বিচ্ছেদ যন্ত্রণাও রোমন্টিক প্রেমের যথার্থ উপাদান। ময়নার চরিত্রে রোমান্টিক প্রেমের শ্রেণিগত এই লক্ষণকেই উজ্জ্বল করেছেন কবি —

'ফাগুনে কোন্ গুণ রঙ্গিমা ফাগুন
কুঙ্কুম সৌরভ সিন্দুর।
খেলি, কেলি, মেলি সকল গেল মেরি,
যদি গেল কান্ত সে দূর।।'

চন্দ্রাণী চরিত্রকে ঘিরে রোমান্টিক প্রেম ধর্ম আবর্তিত। প্রেমের সৌন্দর্য প্রতিমা এই নারী। প্রেমের যে দুর্বার গতি রোমান্টিক ভাবনাকে সর্বাংশে উজ্জ্বল করে চন্দ্রাণী চরিত্রের মধ্য দিয়ে দূরাকাঙ্খী, সববাধাজয়ী সেই প্রেমের ছবিই এঁকেছেন কবি। স্বামী থাকা সত্ত্বেও নিজের মনোগত পুরুষের জন্য দিবসযাপিনী অধীর আগ্রমেহ অপেক্ষা করা, রোমাঞ্চ রহস্যময়তার মধ্যে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং পিতামাতা পরিজন সব ত্যাগ করে দুর্বার প্রেমশক্তির বশে লোরের সঙ্গে পলায়ন ---- চন্দ্রাণী চরিত্রকে রোমান্টিক প্রেমের উচ্চতম শিখরে উন্নীত করে। কুলছাড়া বাঁধনহারা অনিশ্চিত যাত্রায় পার্থিব প্রেম রোমান্স ধর্মে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চন্দ্রাণী চরিত্রের ভাবনা ও আচরণে এ কথাই প্রমাণিত। চন্দ্রাণীর রোমান্স যাত্রা রাজা লোরের বীরত্ব কর্মেরই অনুগামী —

'এ বলিয়া ক্ষেপে বর্শি ছানির উপরে।
বজ্র যেন ভেদি রহে কৈলাস শিখরে।
ভেদিয়া রহিল বর্শি উপরের ছানি।
কুমার বিক্রম দেখি আনন্দ চন্দ্রাণী।।'

কাহিনীর অন্যান্য অংশও রোমান্টিক ভাবধারাকেই বহন করে। যোগীর আগমনে, রাজার সঙ্গে মিলনে এবং লোর সহ মোহরা দেশে গমনের মধ্যে রোমান্টিকতার রেশ ফুটে উঠে। পরবর্তী ক্ষেত্রে রাজা লোরের যোগীবেশ ধারণ করে চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলন বুদ্ধিশিখা ধাইয়ের চাতুর্য্যে মালিনী চরিত্রের বক্তব্যে ও আচরণে, সর্বোপরি বিভিন্ন স্থানে অতিপ্রাকৃতের আমদানিতে রোমন্টিকতা প্রস্ফুটিত। রোমান্টিক প্রেমের মূল আখ্যানকে আরও বেশী বর্ণময় করে তুলেছে সমগ্র কাব্য জুড়ে কবির অসাধারণ রোমান্টিক প্রকৃতির চিত্রণে। লোর-চন্দ্রাণীর প্রসঙ্গেও যেমন, ময়নার চরিত্রে বিষাদ জড়িত প্রেম চিত্রণেও প্রকৃতির ভূমিকা অনবদ্য। মালিনীর বর্ণনায় রোমান্টিক প্রেমের অনুষঙ্গ হিসেবে প্রকৃতি চিত্রণ আশ্চর্য সুন্দর —

'বিচিত্র তারকা শশী শোভায় অম্বর।
জলে কুমুদিনী শোভে কুসুম্বে ভ্রমর।।
ধবল শরৎ ঋতু উজ্জ্বল যামিনী।
নারী-পুরুষের কথা শুনলো কামিনী।।'

রোমান্টিসিজম হ'ল স্বপ্ন ও কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখার বিশিষ্ট ভঙ্গী। রূপকথার জগৎ 'এই স্বপ্ন ও কল্পনার জগৎ। 'সতীময়নার' যে অংশটুকু আলাওল রচিত, সেখানেও বিস্ময় ও রহস্যময়তার পথে রোমান্স রস পরিবেশিত। প্রেম স্বপ্নের জগতে সব কিছুই সম্ভব বলে, আলাওল যে শাখাকাহিনী সংযোজিত করেছেন তাতে রূপকথার বর্ণনায় রোমান্টিকতা পরিবেশিত। ভাগ্যলিপি বর্ণনা প্রসঙ্গে রতন কলিকার যে লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ মাত্রা, কাব্যরসের কৌতুহল বাড়িয়ে তোলার অনুষঙ্গ হিসাবে রূপকথাকে ব্যবহার করেছেন সেখানে কবি —

'আর চারিভিতে দিলা ছোট ছোট দ্বার।
খেলিলে পবন বহে খণ্ডে অন্ধকার।।
ছয় মাসের তৈল জল মাঞ্জাসে ভরিয়া।
আদেশিলা কন্যা প্রতি শীঘ্র উঠ গিয়া।।'

আলাওল পণ্ডিত কবি, কিন্তু জীবন রসিক। এই জীবনরস রসিকতাই কবিকে রোমান্টিক পরিবেশ

গঠনের অনুকূলে অবাস্তবরাজ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ভাসমান সমুদ্র শিলার প্রসঙ্গ, রতনকলিকার গাছে ওঠার কথায় সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। সর্বোপরি হস্তিকর্ণ নামে রাক্ষস এবং ভোমরার মধ্যে রাক্ষসের প্রাণের অস্তিত্ব — রূপকথার জগতের পরিপূর্ণ আস্বাদ। আধুনিক কালের পরিমার্জিত রোমান্স ভাবনা না পাওয়া গেলেও, 'সতীময়না' কাব্যে দৌলতকাজী ও আলাওল পার্থিব প্রেমের অবাধ চিত্রণে রোমান্স রসেরই প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন।

মন্তব্য

১১.৮ ঃ কাব্যের উৎস ও নামকরণ প্রসঙ্গ

বিভিন্ন সূত্র থেকে দৌলতকাজীর 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' কাব্যের কাহিনি গৃহীত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির শেষে কাব্যপরিচয় বিষয়ক পুস্তিকায় বলা হয়েছে — 'ইতি লোরচন্দ্রানি আদিপর্বের সৎ ময়না যুরস পাঞ্চালিকা সমাপ্ত কবি কাব্যের প্রথমে একে বলেছেন — 'ময়নার ভারতী'। 'সৎ ময়না' ও 'ময়নার ভারতী' ছাড়াও আরও নানা নামে কাব্যটি অভিহিত। যেমন — 'লোরচন্দ্রাণী' 'চন্দ্রাণী' 'সতীময়না' প্রভৃতি। কাব্যের উৎস একাধিক বলেই কাব্যনামে ভিন্নতা ঘটেছে।

কবি দৌলতকাজীর পৃষ্ঠপোষক রাজ-অমাত্য আশরফ খান 'দেশী ভাষে' অর্থাৎ বাংলা ভাষায় হিন্দি কবি সাধনের 'লোরক ময়না'র কাহিনি শুনতে চেয়েছিলেন। ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্য রচিত হয়। কবি সাধনের একশো বছর আগেকার কবি মুল্লা দাউদ বা মৌলানা দাউদ 'অবধি হিন্দি'তে রচনা করেন 'চন্দ্রাইন' কাব্য। কাব্যটির রচনাকাল ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

দৌলতকাজীর কাব্যের 'সতী ময়না'র কাহিনির সঙ্গে সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্যের মিল আছে; আবার 'লোরচন্দ্রাণী'র কাহিনির সঙ্গে মুল্লা দাউদের 'চন্দ্রাইন' কাব্যের মিল আছে।

আশরফ খাঁ যখন কবিকে 'ময়নার ভারতী' রচনা করতে আদেশ দেন তখন কবি একশো বছরের ব্যবধানে রচিত দুটি পৃথক কাহিনিকে একত্র সন্নিবিষ্ট করে একটি নতুন উপাখ্যান রচনা করলেন। দুটি কাব্যের কাহিনি একত্র মিশে গিয়ে দৌলতের রচনায় সম্পূর্ণ নতুন কাব্যরূপ লাভ করে। দাউদ এবং সাধন দুজন কবির কাছেই দৌলত ঋণী, কিন্তু দাউদের চেয়ে সাধনের প্রভাব দৌলতের কাব্যে বেশি।

কবি সাধনের কাব্যের সঙ্গে দৌলতকাজীর কাব্যের বিভিন্ন দিকের মিল আছে। দুজনেরই কাব্যের নায়িকার নাম ময়না। অবশ্য সাধনের কাব্যে হিন্দি উচ্চারণে মৈন্য। সম্ভবত মদনা শব্দ থেকে ময়না এসেছে। প্রতিনায়ক সাতন এবং ছাতন নামের মধ্যে উচ্চারণ-পার্থক্য ছাড়া অমিল আছে বলে মনে হয় না। দুই কাব্যেই রত্না দূতীর কথা আছে। দূতীর প্ররোচনার বিষয় দুই কাব্যেই আছে। নায়িকার বারোমাস্যা ও নিবৃত্তির প্রতি আকাঙ্খা দুই কাব্যেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

সাধনের কাব্যের সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে দৌলতকাজীর কাব্যের অমিলও ঘটেছে। দৌলতের কাব্যের নায়কের নাম লোর এবং তিনি রাজা; সাধনের কাব্যের নায়কের নাম লালন এবং তিনি বণিক। সাধনের কাব্যে লোর, চন্দ্রাণী ও বামনঘটিত কাহিনি নেই। সাধনের কাব্যে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ এক বছরের। দৌলতের কাব্যে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ বারো বছরের।

দাউদের 'চন্দ্রাইন' কাব্যের সঙ্গে দৌলতের 'লোরচন্দ্রাণী'র কাহিনির মিল আছে। যোগীবেশে লোরের মন্দিরে অবস্থান, নায়ক-নায়িকার গোপনে মিলন; চন্দ্রাণীকে নিয়ে লোরের পলায়ন; বামনের সঙ্গে যুদ্ধ; সর্পদংশনে চন্দ্রাণীর জীবনসংশয়; যোগীর দ্বারা জীবনলাভ ইত্যাদি ঘটনাগুলি দাউদের কাব্য থেকে নিয়েছেন দৌলত। লোরক, চান্দা ইত্যাদি হিন্দি নামগুলি বাংলায় লোর, চন্দ্রাণী ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছে।

দুটি ভিন্ন কাহিনির সমন্বয়ে রচিত দৌলতের কাব্যের নাম 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না'।

নামকরণের সঙ্গে লেখকের একটি ভাবনা ও উদ্দেশ্য জড়িয়ে থাকে। গ্রন্থের নামকরণ তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিপাদ্য বিষয় এবং উদ্দেশ্য নামকরণে প্রতিবিম্বিত হয়। দৌলতকাজী সচেতন শিল্পী হিসেবে কাব্যের নামকরণে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবির 'সতীময়না' কাব্যের উৎস মৌলিক বিষয়বস্তুত নয়, পূর্ববর্তী হিন্দী কবি সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্যের বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থের নামকরণ দৌলতকাজীর নামকরণের ব্যাপারে; একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে সে কথা যথার্থ। মধ্যযুগের আখ্যানকাব্যগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বিশেষ চরিত্রের নামেই নামকরণের প্রথা। মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, এমনকী চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত — চরিত্রনির্ভর প্রথানুযায়ী নামকরণ।

মিয়া সাধনের কাব্যের নাম 'মৈনাসৎ'। কাব্যের নামকরণেই প্রমাণিত ময়নার সতীত্বই এই

মন্তব্য

কাব্যেরই প্রধান উদ্দেশ্য। দৌলতকাজী তারই অনুসরণে কাব্যের নামকরণ করেছেন 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী'। ময়নার অবিচলিত সতীত্বের জয়গান গাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে দৌলতকাজী 'সতীময়না' নামকরণে শিল্প সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন। 'সতীময়না' নামকরণটি তাঁর পক্ষে কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ময়নার সতীত্ব প্রদর্শনে কাব্যপরিকল্পনার সূত্রপাত। বন্দনা অংশগুলি বর্ণনার পরেই কবির 'কথারম্ভ' শিরোনামে বর্ণিত মূল বিষয় ময়না —

'রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী
ভুবন বিজয়ী কন্যা জগতে পার্বতী।।'

লক্ষ্য বস্তুকেই যে কবি পাঠকের সামনে আলোকিত ও উন্মোচিত করতে চাইছেন, ময়নার বন্দনা দিয়ে মূল গল্পের অবতারণে সেকথাই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

দৌলতকাজী বড় কবি নিশ্চয়, কিন্তু তিনি দরবারী কবিও বটে। দরবারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে কবি তাই ময়নার সতীত্বেই আটকে পড়েননি। অতি দ্রুত কাহিনীর মধ্যে রোমান্টিক প্রেমের যাবতীয় উপাদান সমেত লোর চন্দ্রাণীর প্রসঙ্গ এনে ফেলেছেন। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা দৌলত কাজীর মৌলিকত্ব এবং অমরতা-বিষয় পরিবেশনের এই মুন্সীয়ানায়। আনুপূর্বিক ময়নার সতীত্ব ও পতিব্রত্য পরিকল্পিত হলে, দরবারের খোরাক কোনোভাবেই মিটত না। সুন্দরী পত্নী ভুলে অপর এক সুন্দরী রমণীর জন্য রাজা লোরের উন্মাদনার যদি ময়নার প্রসঙ্গই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করত; তাহলে 'সতীময়না' কাব্যের রোমান্টিক প্রেমের রহস্য রোমাঞ্চ এমন করে দানা বেঁধে উঠত না। অপূর্ব শিল্পবোধে কবি তাই ময়নার স্বামী বিচ্ছেদ কাতরা বিরহ ব্যাকুলতার স্বল্পাকৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেই লোরচন্দ্রাণী রোমান্টিক প্রেমের ইন্দ্রধনু গড়ে তুলেছেন। ময়নার প্রসঙ্গে ধ্রুব আদর্শ এবং লোরচন্দ্রাণীর উদ্দাম প্রেমে কবি মানুষের স্বভাবজাত অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্খার ছবি চিত্রিত করতে চেয়েছেন। 'সতীময়না' কাব্যের এই নামকরণের সঙ্গে তাই অপূর্ব সঙ্গতিবোধে যুক্ত হয়েছে 'লোরচন্দ্রাণী' শীর্ষক নামকরণ। দরবারী সাহিত্যের অনুকূলে লোরের বীরত্ব, দুঃসাহসিকতা এবং রোমান্টিক প্রেমাবেগ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করে 'লোরচন্দ্রাণী' নামকরণটিকে যথার্থ করে তুলেছেন কবি।

দৌলত কাজীর নামকরণ অনুসরণ করলেই আখ্যান বিন্যাসে দুটি বিভাজন ব্যঞ্জনধর্মী হয়ে ওঠে। ময়নার প্রসঙ্গ দিয়ে যে কাহিনীর সূত্রপাত, নাটকীয়ভাবে সেখানে এক যোগীর আবির্ভাব ঘটিয়ে কবি কাহিনীর গতিপথ চন্দ্রাণীর অভিমুখে নিয়ে গেছেন। একটি মন্থর কাহিনির মধ্যে মুহূর্তেই প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত তৈরী করে কবি কাব্যমধ্যবর্তী গল্পকেই দীর্ঘায়িত করলেন তাই নয়, বৈচিত্র এবং নতুনত্বের আমদানিতে পাঠকের কৌতুহল সদাজাগ্রত করে তুললেন। পরবর্তী ঘটনাগুলিতে কবি এমন এক রুদ্ধশ্বাস অবস্থা তৈরী করলেন, যার চমৎকারিত্বে এবং রূপকথার বর্ণালেপনে পাঠকের মনে অবিরত চমকিত হয়ে উঠলো। মানুষ সর্বাগ্রে চায় গল্প। মুহূর্তেই ফুরিয়ে যাবে, নানারকম বিষয়ের আমদানিতে তার গৃহযুদ্ধ প্রাণকে আকুলি-বিকুলি করে তুলবে না। কবি দৌলত কাজী এটা জানতেন। তাই যোগীর প্রদর্শিত সৌন্দর্য মোহ শুধু রাজা লোরকেই আবিষ্ট করল না, দুঃসাহসিক রোমান্সের পিঠে ভর করে পাঠকও স্বপ্ন সৌন্দর্যের দেশে উপস্থিত হল মুহূর্তেই।

লোরচন্দ্রাণীর কাহিনি অংশে কবির সংযমবোধও অসাধারণ। রাজা লোর চঞ্চল স্বভাবের কারণে চন্দ্রাণীর জন্য ছুটে গেলেও, চন্দ্রাণীকে কবি কেবল কামনা জগতের রাণী কিংবা কামসর্বস্ব নারী হিসেবে উপস্থিত করলেন না। স্বামী মিলনে অতৃপ্ত এক নারীকে ময়নার মত বিশুদ্ধ আদর্শের পথে পরিচালিত না করে, চন্দ্রাণীকে রোমান্স জগতের আধিবাসী করে তুললেন। বিষাদকাতরতা বা অতৃপ্তি রোমান্টিকতার অন্যতম উপাদান হওয়ায় লোর বা চন্দ্রাণীর রোমান্টিক জগতে পদচারণা করতে বাধা রইল না। লোরের মধ্যে নিয়ে এলেন কবি সৌন্দর্য-মোহ এবং রূপের জন্য আগ্রাসী ব্যাকুলতা এবং অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তা। চন্দ্রাণীকেও কবি এই সাম্রাজ্যের যথার্থ অধীশ্বরী করে তুললেন। একের পর এক বর্ণিল ঘটনার আমদানিতে কবি রহস্যময় রোমান্টিক দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন। রূপোন্মত্ত লোর-চন্দ্রাণীর গোপন মিলন, দুঃসাহসিক রোমান্টিকতায় চন্দ্রাণীকে নিয়ে লোরের পলায়ন, বামনের সঙ্গে লোরের যুদ্ধ, চন্দ্রাণীর সর্পদংশন প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ও চমকপদ ঘটনার লোর-চন্দ্রাণীর ভূমিকাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যে বিষয়ের প্রতি লেখকের মনোযোগ গড়ে ওঠে, সমগ্র কাহিনির অঙ্গীভূত অপরিহার্য হয়ে ওঠে ঘটনা বিষয় নামকরণের ক্ষেত্রে তাকে অস্বীকারের উপায় নেই। ময়নার সতীত্ব প্রতিপাদনই হয়তো লেখকের প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু লোর-চন্দ্রাণীর কাহিনিও প্রাধান্য অর্জনে পুরোপুরি সফল। ময়নার ঘটনার পাশাপাশি লোর-চন্দ্রাণীর কাহিনী কেন্দ্রীয় ঘটনা। নামকরণ হিসেবে 'সতীময়না'র সহযোগী 'লোর-চন্দ্রাণী'ও সুপ্রাসঙ্গিক ও যথার্থ।

নামকরণের ক্ষেত্রে 'সতীময়না' ও 'লোর-চন্দ্রাণী' পরস্পরের পরিপূরক। লেখকের উদ্দেশ্যও তাই। সুফী ধর্মের প্রভাবে দেহের মধ্যে দেহাতীতের উপলব্ধি দৌলতকাজীকে দেহভাবনাযুক্ত প্রেমের

মধ্যে আদর্শায়িত প্রেম সন্ধানে উন্মুখ করে তুলেছে। লোর-চন্দ্রাণীর দেহকেন্দ্রিক রোমান্টিক প্রেমের বিপরীতে ময়নার অবিচল আদর্শ উজ্জ্বল প্রেমের ছবি তাই এঁকেছেন কবি। দেহধারী মানুষের মধ্যে যে দুই প্রকার প্রেমের অস্তিত্বই বিরাজমান এটা ফুটিয়ে তোলাও হয়তো লেখকের উদ্দেশ্য। তবে স্পষ্ট করে একটা কথা বলা যায় যে, লোর-চন্দ্রাণীর রোমান্টিক প্রেম সম্পর্ক এবং ময়নার আদর্শপুষ্ট প্রেম ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কবির এই সুনিপুণ পরিকল্পনায় কাহিনির মধ্যে বিপরীত স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত তৈরী হয়েছে একথা যেমন সত্য; দুই ধারণার সমন্বয় ভাবনার মধ্যে কবির বিশেষ দর্শনও প্রতিফলিত হয়েছে। 'সতীময়না ও লোর-চন্দ্রাণী'-র পূর্ণ কাব্যনামের প্রথমাংশে সতীময়নার নামই উল্লিখিত। কাব্য আখ্যান পরিকল্পনার অগ্রবর্তী ভূমিকা ময়নারই। কবির যে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য এবং দর্শন এই নামকরণ পরিকল্পনায় আভাসিত, আয়াসহীনভাবে সে কথা অনুধাবনযোগ্য। আসলে বিপুল ভোগের পেছনেই যে মহৎ ত্যাগ বিরাজিত, কামনা মদির প্রেমের পাশেই কল্যাণমুখী প্রেম উজ্জ্বলতায় স্থিত — ময়নার বিস্তৃত বারমাস্যা বর্ণনায় কবি সে কথাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সামান্য সুখভোগের কারণে যদি মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাসটাই হারিয়ে যায়, তাহলে তার আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে তাই শত প্রলোভন ও প্ররোচনায় স্থূল রুচির মানুষ ছাতন কুমারের দূতী ভ্রষ্টা রত্না-ময়নাকে নিজের দর্শন ও সতীত্বের স্বর্ণ সিংহাসন থেকে সরাতে পারেনি। দীর্ঘ এগারো মাস ধরে রতনা মালিনী দেহ ও ভোগের রঙিন রাজ্যে ময়নাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। আর প্রতিবারই ময়নার অন্তরের স্বচ্ছ চেতনার আলো মালিনীর বক্তব্য প্রতিহত করেছে। কামনার পিচ্ছিল স্রোতে ভেসে না গিয়ে ময়না বলেছে —

'প্রাণের দুর্লভ কান্ত দেখিলে হৃদয়ে শান্ত
আঁধি যুগে পিয়ার আনন্দ।
মধুর-মুরতি পতি আলোল-বিলোল গতি
অমৃত মণ্ডলী মুখ-চান্দ।।'

বারমাস্যার দীর্ঘ বর্ণনায় দৌলতকাজী প্রকৃতপক্ষে, ময়না চরিত্রের অবিচল দৃঢ়তার অক্ষুণ্ণ রূপটি তুলে ধরেছেন। ক্ষণিক মিলনের স্মৃতি চির বিচ্ছেদ জয় করে বেঁচে থাকার দর্শন ময়নার মধ্যে নেই। কিন্তু প্রেমের জন্য দিবস রজনীর বিপুল প্রতীক্ষা, ময়নার সতীত্ব এবং চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। লোর-চন্দ্রাণীর কামনা মদির রোমান্স ভাবনার উজ্জ্বল ছটা থিতিয়ে গেলেই ময়নার আরাধ্য প্রেমের দেখা মেলে। বৈষ্ণব পদকারেরা ঠিক এই কারণেই জীবাত্মা রাধার অভিসার যাত্রাকে এত বিপদসঙ্কুল, এত আশঙ্কা জর্জরিত ভীষণ করে তুলেছেন। যা সহজেই পাওয়া যায়, সেখানে প্রাণের ভালোবাসা, আত্মার জাগরণ ঘটে না। প্রিয়তমকে পেতে হলে, তার সঙ্গে মিলিত হতে গেলে 'দুতর পন্থ গমনধনী সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি'-র অবস্থায় নিজেকে নিয়ে যেতে হয়। দৌলতকাজী 'সতীময়না' কাব্যে প্রেমের এই প্রগাঢ় দর্শনকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কবি আলাওলও দৌলতকাজীর এই প্রেম দর্শনের অনুকূলে তাঁর রচনা পরিকল্পনা করেছেন। সেই কারণেই আলাওল যে অংশটুকু রচনা করেছেন, তাতেও সতীময়না ইতর মালিনীকে তাড়িয়ে দেয়। সর্বোপরি সখীর কাছে রতনকলিকার ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার কাহিনি শুনে নিজের মনোবল বাড়িয়ে নেওয়ার প্রেরণালাভ করে। কাব্যের উপসংহারে লোরের সঙ্গে ময়নার মিলনে প্রেম ও সতীত্ব জয়যুক্ত হলে 'সতীময়না' নামকরণটি সুপ্রযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, এই বৈশিষ্ট্যে।

১১.৯ ঃ কাহিনি পরিকল্পনা

দৌলতকাজীর কবিপ্রতিভা অবিসংবাদিত। 'সতীময়না' কাব্যে দৌলতকাজী মূলত পার্থিব প্রেমের জয়গান করেছেন। তিনি নিজে ছিলেন সুফী সাধক ও কবি। সহজিয়া ভাবসাধনাই কবিকে নর-নারীর প্রেম চিত্রণে উৎসাহিত করে থাকবে।

'সতীময়না' দৌলতকাজীর অসমাপ্ত কাব্য। কবি যেটুকু রচনা করেছিলেন তাতেই তাঁর সাফল্য বিস্ময়কর। সে বিস্ময় কাব্যপরিকল্পনায়, অভিনব আখ্যান বিন্যাসে, অসাধারণ শিল্প পরিমিতিবোধে। এই বিচারে তিনি শুধু মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট কবি। দৌলতকাজী প্রাচীন লোকগাথা থেকে কাহিনির উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। দাউদের 'চন্দ্রায়ন' কাব্যের বিষয়ও কবিকে সাহায্য করে থাকবে। তবে সে কাব্যটির ভাবানুবাদে বাংলা ভাষায় পয়ার ছন্দে 'সতীময়না'র পরিকল্পনা — সেই কাব্যটি ঠেট্ গোহারী ভাষায় রচিত মিয়া সাধনের অতি ক্ষুদ্রাকৃতি কাব্য 'মৈনাসৎ'। প্রত্যক্ষ প্রভাব বলতে এটুকুই। বাকি সমস্ত বিষয়ে দৌলতকাজী 'সতীময়না' কাব্যকে মৌলিক সৃষ্টির পর্যায়ে নিয়ে গেছেন।;

মঙ্গলকাব্যের প্রথা মেনে দৌলতকাজীও দেব বন্দনা এবং পৃষ্ঠপোষক রাজা ও রাজ অমাত্যের

মন্তব্য

প্রশস্তি রচনা করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এইসব গতানুগতিক অংশেও কবি অসাধারণ কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রান্তবাংলা আরাকান ও নদীবেষ্টিত চট্টগ্রামের সে প্রাকৃতিক বর্ণনা কাব্যে পরিবেশিত —চূড়ান্ত শিল্পবোধ না থাকলে এ বর্ণনা গড়ে ওঠে না। অন্যদিকে পৃষ্ঠপোষক রাজা ও রাজ অমাত্যের প্রশস্তি অংশে এমন একজন তথ্যসমৃদ্ধ সমাজসচেতন কবির পরিচয় মেলে, মধ্যযুগের অপর এক বিখ্যাত কবি মুকুন্দরামের সঙ্গে যাঁর একমাত্র তুলনা চলে। রাজা শ্রী সুধর্মাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি লিখেছেন —

'নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।।
প্রতাপে প্রবাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন।।'

সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছাড়াও এই বক্তব্যে আরাকান রাজসভায় একটা উদার উপযুক্ত পরিবেশের ছবিই ইঙ্গিতমুখর হয়ে ওঠে। এই মুক্ত পরিবেশ মুসলমান কবিদের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে অসাম্প্রদায়িক কাব্য রচনায় প্রণোদিত করেছিল। ভাবলে অবাক লাগে সেকালে জাতপাতের বিচারে মানুষের মুক্তপ্রাণ প্রতি পদে-পদে লাঞ্ছিত ও প্রতিহত ছিল; সেইযুগে আরাকানের রাজসভায় একটা সর্বধর্মী সমন্বয়ের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। কবি তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই মহামতি শ্রীযুক্ত আশরফ খানকে সম্মান প্রদর্শনের বর্ণনায় প্রকৃতপক্ষে অসাম্প্রদায়িক সমাজের ছবি উজ্জ্বল করে এঁকেছিল —

'নানা জাতি লোক সবে ধরিল যোগান।
সভাতে বসিলা শ্রী আশরফ খান।।
সৈয়দ শেখ আদি মোগল পাঠান।।
স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।
সারি সারি বসি চলন্ত যেন মহেশ্বর।।'

'বন্দনা' ও 'মহম্মদের সিফত' — এই দুটি অংশেই শুধু ইসলাম ধর্মের গুণকীর্তন আছে নাহলে সমগ্র কাব্যে হিন্দু ও মুসলমান সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এর পেছনে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গুরুত্বপূর্ণ কারণ। প্রধান কারণ বোধহয় দেবমহিমা বর্জন করে মানব প্রেম ও তার মহিমাকে সম্মানীয় আসন দানের বাসনা।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোককথা, যার সঙ্গে রূপকথার ভাবনা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এমন বিষয়কেই দৌলতকাজী সুসংহত অথচ রসময়তায় গতিশীল কাব্যমূর্তি দান করেছেন। ফলে 'সতীময়না' কাব্যটি ক্লাসিক ও রোমান্টিকধর্মের অপূর্ব সমন্বয় সহাবস্থানে অনন্য শিল্পমূর্তি লাভ করেছে। সুরাত্মক ধীরগতির পয়ার ছন্দে বর্ণনার উত্থান পতন এবং চরিত্রের অন্তর্বর্তী ভাবরাজ্যের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অধিকাংশ আমলেই সূচারুরূপে উত্থাপিত হয় না। এ ব্যাপারেও দৌলতকাজী প্রশংসনীয় গৌরব দাবী করতে পারেন। ময়নার সঙ্গে গোপন মিলনের সময় রাজা লোরের অ্যাডভেঞ্চার ধর্মের বর্ণনায় কবির কবিত্বশক্তি সীমাহীন —

'হাতে খড়্গ শোভে নেত ধরা পরিধান।
বীরমূর্তি অকাতর মাতঙ্গ সমান।।
কপালে দোলায় মণি কুণ্ডল শ্রবণে।
চন্দনে চর্চিত তনু প্রসন্ন বদনে।।'

সমগ্র কাব্য জুড়ে এই জাতীয় বর্ণনাভঙ্গি মুক্তাহারের মত ছড়িয়ে আছে।

সমালোচকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, ''লোরের বনগমন এবং যোগীর কাছে চন্দ্রাণীর চিত্র দর্শন, অভিযাত্রা, বামনের সঙ্গে লোরের যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত অথচ রসগ্রাহী। ময়নাবতীকে সত্য থেকে বিচ্যুত করার জন্য মালিনী ও ছাতনের ষড়যন্ত্র কাহিনিকে উপন্যাসোপম অথচ আধুনিক কাহিনিসম্মত করে তুলেছে'' (সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণীর সম্পাদনা, ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ দুলাল চৌধুরী)। বীরত্ব, প্রেম, নিয়তির রহস্যময়তা, যুদ্ধ, অলৌকিক কাহিনির সমাহার, মানবোচিত প্রবৃত্তির অবাধ প্রকাশ বর্ণময় কল্পনায় চিত্রিত হলে রোমান্সধর্মী বিষয়ের মর্যদা পায়। এক রাজার ছিল এক রাণী ---- রূপকথার এই ঢঙে সাজিয়ে দিয়ে দৌলতকাজী 'সতীময়না' কাব্যে একসাথে লোককথা রূপকথা জাতীয় রোমান্সধর্মীতা এবং বাস্তবজগতের মানুষের ছবি হিসেবে মর্ত্যজীবনের ছবিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। রাজা লোর ও বামনের নারীকে কেন্দ্র করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে রূপকথার জগতের প্যাটার্ন প্রতিবিম্বিত হয়

ঠিকই, কিন্তু বাস্তব জগতের ঐতিহাসিক সত্যতাও সুচারুরূপে কাব্যে স্থান করে নেয়। সেকালে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে জয়ী রাজা পরাজিত রাজার রাজ্যই শুধু অধিগ্রহণ করতেন তাই নয়, সেই রাজ্যের রাজকুমারী এবং সুন্দরী যুবতী রাজমহিষীর উপরও বিজীত রাজার কর্তৃত্ব জন্মাত।

নিপুণভাবে গল্প বলার এই ক্ষমতাই দৌলতকাজীকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। রূপকথার অলৌকিকতামাখা কাহিনি যখন বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, তখনই রোমান্সধর্মী কাব্য হয়ে ওঠে — পুরোপুরি রোমান্সের অতিপ্রাকৃত ধর্ম বহন করে না। কবি দৌলতকাজী এ-ব্যাপারে শুধু সচেতন ছিলেন তাই নয়, যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয়ই উপস্থাপিত করেছেন। বর্ণনাভঙ্গীতে হয়তো কবি রূপকথার জগতের আমদানি ঘটিয়েছেন; কিন্তু মূলগল্প সত্যজীবনের সঙ্গে সমন্বয় সাধনে উপন্যাস ধর্ম বহন করে সত্যবস্তুর নির্মাণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাহিনির মধ্যে এসেছে অসাধারণ জীবন দর্শন। কারণ সাহিত্যে শিল্পে আমরা আমাদের চারিপাশের জীবনকেই অনুসন্ধান করি। কবি শিল্পী সেই জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে একটা জীবন দর্শনও গড়ে তোলেন। কখনো বিষয় বর্ণনার মধ্যে, কখনো চরিত্র নির্মাণে। 'সতীময়না' কাব্যে যোগ বিষয়ক দর্শন।

'নয়ন মুদিয়া পাতাল ভেদিয়া
দৃষ্টি চন্দ্র মূলে করে।
স্থলে ডিম্ব রাখি জলে কূর্ম থাকি
কূর্মে ডিম্ব দৃষ্টি ধরে।।'

যোগ দর্শনের মূল কথা অসাধারণ কাব্যমূর্তি লাভ করেছে। স্বামী প্রসঙ্গে নারীর জীবনদর্শনও দৌলতকাজীর বর্ণনায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

'পশু সঙ্গে মনুষ্যের কোন্ অভিলাষ।।
মূর্খ স্বামী সঙ্গে ক্রিয়া সহস্য জঞ্জাল।'

শুধ দর্শন নয়, সমগ্র কাব্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসাধারণ বাক্যবন্ধ। জীবনের নানা দিক অপূর্ব সত্যদৃষ্টিতে ছুঁয়ে যায় এই বাক্যগুলি। প্রাজ্ঞতার সুচারু উপস্থাপনে এই পর্যায়ে কবি ভারতচন্দ্রের কথাই মনে হয়। 'সতীময়না' কাব্যে রচিত ঐ রকম কয়েকটি বাক্যবন্ধ —

ক) 'যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা।
তস্করেতে ধর্মকথা বেশ্যাকে ভর্ৎসনা।।'

খ) 'যুবক পুরুষজাতি নিষ্ঠুর দুরন্ত।
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত।।'

গ) 'পুরুষ ভ্রমরা জাতি মধু যথা পায়
সুগন্ধি কুসুম নারী রসেতে খেলায়।।'

'সতীময়না' কাব্যে কবি আসলে জীবনের বিচিত্র রূপকেই চিত্রিত করেছেন। এই কাব্যের প্রধান রস জীবনরস — নরনারীর বিচিত্র প্রেমলীলাই যার উৎসভূমি। কবির কৃতিত্ব, তিনি একটি সরলরৈখিক প্রেমচিত্রণ উপহার দেননি। ময়নার সতীত্বে প্রেমের অবিচল নিষ্ঠা, রোমান্টিক প্রেমের দূরবর্তী প্রেমকাঙ্খারই অপূর্ব মূর্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত। এই চরিত্রের দুঃখভোগ ও যন্ত্রণা বারোমাস্যার বর্ণনায় বাস্তবের মৃত্তিকা সংযুক্তিকরণ ঘটিয়েছে —

'চাকা চকীরে জিনি রজনী দপ্তুতি বিনি
একাকিনী জাগি প্রেম-ত্রাসেরে।
লোর বিনে লোর ঘোর নয়নে বরিখে মোর
তনু দহে মদন-হুতাশে রে।।'

মর্ত্যজীবন পিপাসা চন্দ্রাণী চরিত্রটিকে আদ্যান্ত রোমান্টিক করে তুলেছে। প্রেমের মহিমা ও সৌন্দর্য মিশে গেছে চন্দ্রাণী চরিত্রে। ''তাই আদর্শ নারী সতীময়না 'টাইপ' চরিত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, আর চন্দ্রাণীর উজ্জ্বল নায়িকামূর্তি জীবনচাঞ্চল্যে অধিকতর চিত্তাকর্ষী হইয়াছে'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। ময়না চরিত্রটি 'টাইপ' কিনা তা তর্কসাপেক্ষ, তবে চন্দ্রাণী এবং লোর-চন্দ্রাণীর সম্পর্ক মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট নর-নারীর সত্যবন্ধ প্রেম আখ্যান। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে লোর একাধারে রোমান্টিক ও বাস্তববাদী হয়ে কাব্যমধ্যে নিজের জায়গা সুনিশ্চিত করে প্রকৃতপক্ষে মানবের দ্বৈত সত্তাকেই রূপায়িত করেছে। অন্যান্য চরিত্রের ভূমিকা এবং হয়ে ওঠাও প্রশংসনীয়।

দৌলতকাজী মুসলমান কবি, কিন্তু জন্মসূত্রে বাঙালী। তাই বাংলার সমাজ জীবনের ছবি,

মন্তব্য

বাঙালি চরিত্র, প্রকৃতি বর্ণনায় বাংলাদেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের সঙ্কেতে কাহিনি প্রধান হয়ে ওঠেনি, বাঙালির সংস্কৃতি ও জীবনভাবনাই কাব্যের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে ধরা পড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৎকালীন চৈতন্যভাবাশ্রিত বৈষ্ণব প্রভাব। যে কারণে বৈষ্ণব পদের মত ছন্দ ও ভাব লালিত্যে প্রশংসনীয় কিছুপদ কবির রসবোধ, ভাষা ও ছন্দ-নির্মাণ ক্ষমতার স্বাক্ষর রূপে দেখা দিয়েছে। লোরের জন্য ময়নার বিরহ, বিদ্যাপতির বিরহ পর্যায়ের পদকেই মনে করায় —

'মালিনি কি কহব বেদনা ওর।
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর।।'

বৈষ্ণবীয় প্রেমবোধ, সুফীধর্মের সহজ জীবনানন্দ মিলেমিশে 'সতীময়না' কাব্যে মাটি ও মাটির মানুষকেই প্রধান বিষয় করে তুলেছে। দেহবাদী এবং দেহাতীত এই প্রেমভাবনায় দেবতা নয় মানুষই প্রধান অবলম্বন। দৌলতকাজীর কাব্যে এই নরস্তুতি ও নরলীলাই প্রধান —

'নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান।।
নয় বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান।
নর সে পরম দেব তন্ত্র-মন্ত্র-জ্ঞান।'

উপকাহিনি সংযোজন, গীতিধর্ম ও নাটকীয়তার আভাস — যাই হোক না কেন, কবি আসলে সমগ্র কাব্যে এই মানুষকেই সন্ধান করেছেন। তাই দুর্ভাগ্যবশতঃ কবির মৃত্যুতে কাব্য সেখানে থেকে গেছে — সেখানেও সেই মানুষের দুঃখবোধ আকাশ স্পর্শ করেছে।

দৌলতকাজীর অসম্পূর্ণ কাব্যকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিয়ে আলাওল অভিনব কোন কবি দৃষ্টির পরিচয় রাখেন নি। বরং রোমান্টিক প্রেমাবেগ ও জীবন রস-রসিকতায় দৌলতকাজী সেখানে মানব প্রেমকেই জয়যুক্ত করেছেন, আলাওল সেখানে পাণ্ডিত্য ও তত্ত্ব দর্শনের রসহীনতায় জট পাকিয়ে ফেলেছেন। আলাওলের রচনাংশে দেববন্দনা, পৃষ্ঠপোষকের স্তুতি অযথা উপকাহিনির উপস্থিতি ঘটেছে, কিন্তু জীবনের সহজ দাবি ও মানব প্রেমের যথার্থ আকুতি হারিয়ে গেছে। একটি অসাধারণ রোমান্টিক প্রেমের গল্পকে যথার্থ পথে পরিচালিত হতে না দিয়ে মহৎ সম্ভাবনার বিনষ্টি ঘটিয়েছেন আলাওল। কাব্য সমাপ্তির পূর্বে সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন —

'শ্রীযুক্ত দৌলতকাজী মহা গুণবন্ত।
তানে আদ্যে করিয়া রচিল আদি অন্ত।।
তান সম আমার না হয় পদগাঁথা।
গুণিগণ বিচারিয়া কহ সত্য কথা।।'

আলাওলের এই বক্তব্য অক্ষমতাজনিত যে বিনয়, তাতে পুরো সত্য প্রতিফলিত নয়। কবি হিসেবেও আলাওল প্রতিভাধর এবং তিনি দৌলতকাজীর মত সুফী সাধক ও কবি। মানুষ ও তার প্রেম কথা এই কবিরও মূল লক্ষ্য। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই মূল বিষয়টিকেই ছুঁতে চেয়েছেন কবি —

'কমল মনোহর উদত্র হিমকর
শীতল নির্মল রাতিয়া।।
নয়ন রঞ্জন চঞ্চল খঞ্জন
বিরাজে শারদ ভাতিয়া।'

রোমান্টিক প্রেমের জটিল আখ্যান হিসেবে কাব্যবিষয় হয়তো এক; কিন্তু কবি হিসাবে দৌলতকাজী ও আলওল পৃথক কবি। তাই কাব্য পরিকল্পনা, দার্শনিক বোধে, কবিমানসিকতায় উভয়ের পার্থক্য থাকাটাই স্বাভাবিক। সুফী ধর্মের প্রেম ও বিরহ চিন্তা, সর্বোপরি ভুবনজয়ী প্রেমের স্তুতির বর্ণনায় উভয় কবিকে একাসনে বসানোও; স্বকীয় দর্শনে নিজস্বতাও গড়ে তুলেছে। রতনকলিকা উপাখ্যান অংশে আলাওলের সেই বিশিষ্ট জীবনদর্শন প্রতিভাত হয়েছে। ভাগ্যনির্ভরতার পাশে আত্মবিশ্বাস এবং জীবনে এই দুইয়ের সমন্বয় সাধনই আলাওলের জীবনদর্শন ও তাঁর মৌলিকতা। এই মৌলিকতার প্রতিফলন কাব্যের উপসংহারেও। মিলন এবং মিলনোত্তর মৃত্যুজনিত বিষাদে আলাওলকৃত কাব্যাংশের সমাপ্তি। কাব্যের এক জায়গায় দৌলতকাজীর বক্তব্য ছিল —

'ময়নাবতী রাজ্যে লোরেন্দ্র আইল পুনি।
তবে কোন উপাত্র করিলেক চন্দ্ররাণী।।
কোন মতে এ তিন মিলিবে তার সঙ্গ।
কোন মতে ময়না সঙ্গে ছাতনা প্রসঙ্গ।।'

দৌলতকাজীর কাব্যসমাপ্তির এই মিলন ভাবনার পরিবর্তে আলাওলের বিষাদাত্মক পরিণতিতে কাব্যসমাপ্তির পরিকল্পনাকে কবির সংগতিবোধের অভাব ভাবলে ভুল হবে। প্রাপ্তি নয় অপ্রাপ্তি, দেহ নয় দেহাতীত, সীমা নয় অসীমাকুতিই রোমান্টিকতার বিষয়। সেক্ষেত্রে রোমান্টিক প্রেমের রহস্যময় বিষয়কে বেদনাবিধুর সমাপ্তি দান করে কবি আলাওল প্রকৃতপক্ষে কাব্যে মূল বিষয়ের প্রতি অনুগত থেকে তাঁর কাব্যদৃষ্টির মৌলিকতার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন।

কাব্যপরিকল্পনায় প্রসাধনকলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদার প্রেমের ভাব এই বিষয়ে দৌলতকাজীকে সংকীর্ণতার জগত থেকে মুক্ত দিয়েছিল। অন্তর্বর্তী কাব্যশক্তির সঙ্গে বৈষ্ণবীয় ললিতমাধুর্য 'সতীময়না' কাব্যের ভাব-ভাষা নির্মাণে সহায়তা করেছিল। ছন্দনির্মাণে ও ভাবদেহ গঠনে জয়দেবের প্রভাব কবি দৌলত অস্বীকার করতে পারেন নি —

'কোকিল কাকলি কলকল কুজিত
লুলিত ললিত নিকুঞ্জে।।'

১১.১০ ঃ 'লোরচন্দ্রাণী' ও 'সতীময়না'-র চরিত্র বিচার

লোর চরিত্র ঃ- লোর 'সতী ময়না' কাব্যের নায়ক। নায়ককে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করতে হয়। এই কাব্যের ঘটনাবলি লোরের জীবনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। কাহিনির কেন্দ্রমূলে তাঁর অবস্থান। অতএব লোর এই কাব্যের নায়ক। এ ছাড়া নায়কের কিছু নায়কোচিত গুণ থাকা দরকার। সেই সব গুণ লোরের আছে। এখন সেইসব গুণের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। তিনি সুপুরুষ, সাহসী, বীর এবং নানা শাস্ত্রে বিচক্ষণ। দৌলতকাজী লিখেছেন —

'নানাগুণে বিশারদ লোরক দুর্জয়।
বিচক্ষণ বলবন্ত সাহস নির্ভয়।।'

বাহুবলে অন্য নারীকে জয় করে তাকে ভোগ করার মতো মধ্যযুগীয় রাজকীয় রোমান্সের তিনি একজন প্রতিনিধি। চন্দ্রাণীকে লাভ করার জন্য সবরকমের বিপদের ঝুঁকি এমনকি প্রাণনাশের আশঙ্কাকেও তিনি অঙ্গীকার করেছেন। বাঞ্ছিতাকে লাভের জন্য তিনি দ্বৈরথ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে চন্দ্রাণীকে লাভ করেছেন। তাঁর অস্ত্রবিদ্যা বীর বামনকে লজ্জিত করেছে —

'শীঘ্র হস্তে লোরবর নিবারয় শরে শর
লজ্জা পায় বামন কুমারে।'

অবশ্য বীর বামনের অস্ত্রাগাতে লোরকেও একবার সংজ্ঞাহীন হতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কপট যুদ্ধে জয়লাভ করতে হয়েছে।

মধ্যযুগের সামন্ত রাজারা এক পত্নীতে আসক্ত থাকতেন না। বহুনারী-বিলাস তাঁদের জীবনের বাসন তথা স্বাভাবিকতা ছিল। চিত্রদর্শনের ফলে রাজা লোরের মধ্যে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছিল এবং বিবাহিত পত্নীকে ত্যাগ করে — তাঁকে দুঃসহ কষ্ট দিয়ে তিনি অন্য এক যৌবনসুখ উপভোগ-বঞ্চিতা-বিবাহিতা নারীকে উপভোগের জন্য প্রয়াস করেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে সামাজিকভাবে এই কাজ নিন্দনীয় — কিন্তু সেই কালের রাজকীয় জীবনের কাছে এটিই ছিল স্বাভাবিক এবং পবিত্র কর্তব্য। চন্দ্রাণীকে পাবার জন্য যোগীরূপ ধারণ, দুর্গম অন্দরমহলে প্রবেশের জন্য দুঃসহ কষ্টভোগ এবং যুদ্ধ যাত্রার মতো কাজ তাঁকে করতে হয়েছে। ছলে-বলে-কৌশলে চন্দ্রাণীকে অধিকারের মধ্য দিয়ে এবং নিজের পত্নীকে বারো বছর ধরে বঞ্চিত করে অমর্যাদা করার মধ্যে তাঁর পৌরুষ কতটা প্রকাশিত হয়েছে তা সাধারণের পক্ষে ধারণা করা কঠিন। নপুংসকের সুন্দরী ও বিদ্রোহিনী স্ত্রীর কামনা চরিতার্থ করা যেখানে মধ্যযুগের বীর নায়কের পবিত্র কর্তব্য সেখানে সাধারণ মানুষ তার মূল্যায়ন করতে পারে না। সাধারণের চোখে লোর একজন কামুক রাজা। কেন না দুর্জয় কামনার বশবর্তী হয়েই তিনি গবাক্ষ পথে চন্দ্রাণীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছেন। উপস্থিত বুদ্ধির জোরে চন্দ্রাণীকে চিনেছেন এবং কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থও করেছেন। কাব্যের উপেক্ষিতা ময়নাবতী যথার্থই বলেছেন —

'পুরুষ ভ্রমরজাতি মধু যথা পায়।
সুগন্ধি কুসুম নারী রসেতে খেলায়।।'

লোরকে মোহরা রাজ্যের অধিপতি হিসাবে দেখিয়ে দৌলতকাজী তাঁর শেষ করেছেন। ময়নার বঞ্চনার হাহাকার তাঁর কাব্যে রোমান্স ও অ্যাডভেঞ্চার রসের চেয়ে অনেক বেশি দাগ কেটেছে পাঠকের মনে। লোর চরিত্রটিকে আমরা যেভাবে পেয়েছি তাতে মধ্যযুগীয় উপকথার নায়কের

মন্তব্য

গুণাবলিই তার মধ্যে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। বারো বছর ধরে দেশে ফিরে তিনি দুই পত্নী নিয়ে সুখে রাজ্যসুখ ভোগ করেছেন। সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্যের নায়ক লালন একবছর পর ঘরে ফিরেছিলেন। ময়নার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটেছিল —

'অবসূত্রী ঘর লালন আনা।
সুরূখ সরীর ভয়ে সুরতানা।।
লালন ঘর আয়ে মহমংতা।
মৈনা মিটী সরব মন চিংতা।।'

(অনুবাদ ঃ এরপর শয়নগৃহে লালন এলেন, বিরহশীর্ণ শরীর সুরতযুক্ত হল। মহামতি লালন ঘরে এলেন, তাতে ময়নার সব চিন্তা দূর হল। 'লোরচন্দ্রাণী' ও 'সতীময়না'।) আলাওল সাধনের অনুসরণেই পুনর্মিলন দেখিয়েছেন। তবে অনেকে অতিরিক্ত কথা বলেছেন ও অতিরঞ্জন ঘটিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, লোরকে কেউই অপরাধী বলে গণ্য করেননি। চরিত্রটিকে বিচার করতে হবে সেই কালের প্রেক্ষিতে।

ময়নীবতী চরিত্র ঃ- ময়নাবতী অসাধারণ সুন্দরী। কবির বর্ণনায় —

'কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গের লীলায় যেন কান্ধিছে অনঙ্গ।।'

রূপসী ময়নাবতী বিনা অপরাধে যৌবনের দিনগুলি স্বামীর অবহেলায় বিরহে কাটাতে বাধ্য হয়েছেন। বারো বছর ধরে বিরহজ্বালা ভোগ করেছেন। তবু স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের চিন্তা মনে স্থান দেননি। তাঁর কাছে প্রলোভন এসেছিল। কিন্তু সতীত্ববলে সেই প্রলোভনকে জয় করেছেন। তাঁর চরিত্রের মূল ভিত্তি স্বামীপ্রেম। ময়নাবতী পতিব্রতা —

'প্রিয়বাদী পরিতব্রতা সুলাস সুমতি।
প্রত্যক্ষ শঙ্কর সম সেবে নিজ পতি।।'

কিন্তু তা সত্ত্বেও ময়না স্বামীকে ধরে রাখতে পারেননি। মহিষীকে 'একসরী' রেখে লোর কানন বিহারে গেছেন এবং সেখানে যোগীর কাছে চন্দ্রাণীর চিত্রদর্শন করেছেন।

মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থায়, পুরুষশাসিত সমাজে বিবাহিত নারীর স্ত্রী হিসাবে তেমন কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। স্বামী নিত্য নতুন সম্ভোগপণ্যরূপে নতুন নতুন নারীর সন্ধান করতেন আর স্ত্রী তা নীরবে মেনে নিতে বাধ্য হয়ে স্বামী-বিরহে দিন কাটাতেন। দাম্পত্য জীবনের শুচিতা রক্ষার দায়িত্ব একা নারীকেই বহন করতে হত। তাই ময়নাবতী সুন্দরী ও পতিপরায়ণা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করে স্বামী লোর অনায়াসে অন্য নারী চন্দ্রাণীতে আসক্ত হয়েছেন।

নায়ক লোর নতুন নারীকে পেয়ে প্রথমা পত্নীকে একেবারে ভুলে গেছেন। পক্ষীসংবাদে পূর্বস্মৃতি জাগরিত হয়েছে এবং ময়নার কাছে ফিরেছেন চন্দ্রাণী সহ। ততদিনে বারো বছর কেটে গেছে। স্ত্রীর প্রতি মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় স্বামীর অবহেলার এটি চরমতম নিদর্শন।

ময়না ও চন্দ্রাণী দুজনেই এই কাব্যের নায়িকা। কবির কাছে পৃষ্ঠপোষক আশরফ খান যা শুনতে চেয়েছিলেন তা হল 'কোন মতে হৈল ময়না পতিব্রতা সতী।' কাব্য আরম্ভ হয়েছে ময়নাবতীর রূপবর্ণনা দিয়ে। দাউদের 'লোরচন্দ্রাণী' আর সাধনের 'মৈনাসৎ' জুড়ে গিয়ে ময়না ও চন্দ্রাণী নায়িকা ও প্রতিনায়িকা হয়েছেন এই কাব্যে। ময়নার গুরুত্ব এখানে কম নয়। কবির মূল উদ্দেশ্য ছিল পতিব্রতা সতী ময়নার কাহিনি বর্ণনা। ময়নাকে কবি সতীধর্মের আদর্শ করে এঁকেছেন। সেই আদর্শ শুধু ভাবাদর্শ নয়। ময়নাবতী রক্তমাংসে গড়া নারী। লোরের বিরহে তাঁর কাতরতার মধ্যে বঞ্চনার আর্তি প্রকাশ পেয়েছে —

'মর্মে পাইলুম ঘাও মুখেতে না আইসে রাও
প্রেমানলে তনুমন পোনে।'

অথচ এটি কাব্য ছিল না। একদিন প্রেম ছিল —

প্রেমাঙ্কুর মনে পালিনু যতনে শিশু হস্তে সঙ্গে পতি।

আগে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই ছিল তুল্যানুরাগ। তিলেক বিচ্ছেদে দুজনেই আকুল হতেন —

'অন্যে অন্যে দোহ চিত্তে প্রেমের মুকুল।
তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে দোহন আকুল।।'

কিন্তু সেই প্রেম পুরাতন হয়ে গেল। লোর ময়নাতে তৃপ্ত নন। তিনি সঙ্গীদের নিয়ে বনবিহার

করে বেড়ান। লোরের লাম্পট্যকে ময়না পুরুষের ভ্রমরবৃত্তি বলে মেনে নিয়েছেন —

'যুবক পুরুষজাতি নিষ্ঠুর দুরন্ত।
এক পুষ্পে নহে জেনো মধুকর শান্ত।।'

কিন্তু ময়না আদর্শ হিন্দু নারী তাই একনিষ্ঠ প্রেমকেই তিনি জীবনের আদর্শ বলে মেনেছেন এবং শত প্রলোভনকে তুচ্ছ করতে পেরেছেন এই প্রেমের শক্তিতেই। কবির সহানুভূতি ময়নার প্রতি। দৌলতের ইচ্ছা ছিল এইভাবে কাব্য শেষ করবেন —

'লোর ময়না চন্দ্রাণীর হৈল একস্থান।'

আলাওল দৌলতের ইঙ্গিত অনুযায়ী চন্দ্রাণীসহ লোরকে ময়নার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। এ কাব্যের নায়িকারূপে ময়নাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। 'সতীময়না' অংশে ময়নাই একতমা নায়িকা। সেখানে প্রতিনায়িকা চন্দ্রাণীর কোনো স্থান নেই। কবির নৈতিক ভাবনা ময়নার জীবনাদর্শকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। স্বামী ছাড়া নারীর দ্বিতীয় পুরুষ-চিন্তা যে পাপ — ভারতীয় আদর্শের এই সত্যটিকে ময়না তাঁর চরিত্রে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল লোরের সঙ্গে তাঁর মিলন হবেই। স্বামী জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্কে স্ত্রীর সঙ্গে আবদ্ধ — এই বিশ্বাস থেকেই ময়না বলেছেন —

'যদি ইহলোকে না মিলে লোরক পরলোক হইব সঙ্গী'। তাঁর তিক্ষা এবং বিশ্বাস অবশেষে জয়ী হয়েছে, তিনি ইহলোকেই স্বামীকে ফিরে পেয়েছেন।

ভোগবাদের আদর্শকে দৌলত বড়ো করে দেখাতে চাননি। ময়নার চরিত্রই তার প্রমাণ। রত্না মালিনী আষাঢ় থেকে শুরু করে প্রতি মাসের প্রকৃতি বর্ণনার মাধ্যমে ময়নার মধ্যে কামনা জাগানোর যে চেষ্টা করেছিল সে চেষ্টা বিফল হয়েছে। আলাওল দেখিয়েছেন ময়না বিতাড়িত করেছেন রত্নাকে। অন্য পুরুষের আহ্বানকে তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। (কাহিনি-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)।

চন্দ্রাণী চরিত্র ঃ- দৌলতকাজীর কাব্যের মূল উপাখ্যান গড়ে উঠেছে ত্রিভুজ প্রেম নিয়ে। এক পুরুষকে নিয়ে দুটি নারীহৃদয়ের সুখদুঃখ ও বিরহ-মিলনের চিত্র কাব্যে রূপলাভ করেছে। নায়ক লোরের জীবনে যে যুগল নায়িকার আবির্ভাব তার এক কোটিতে রয়েছেন ময়নাবতী আর অন্যপ্রান্তে চন্দ্রাণী। চন্দ্রাণী প্রথমে প্রেয়সী পরে দ্বিতীয়া পত্নী। পত্নী ময়না স্বামী লোরকে চান — কিন্তু লোর ছুটছেন চন্দ্রাণীকে পাবার জন্য। চন্দ্রাণী পূর্বেই বিবাহিতা। তিনি পরোঢ়া। তাঁর স্বামী বামন বীর, কিন্তু নপুংসক।

— রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল।

চন্দ্রাণীর বাসনাময় চিত্ত এই ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের গ্লানি বহন করতে সম্মত নয়। চন্দ্রাণীর অনেক রাত্রি কেটে গেছে বামনের সঙ্গে নিষ্ফল নিশাযাপনে।

'মদন বেদনে কন্যা জাগে একসর।
চক্ষেতে না আসে নিদ্রা হৃদয় ফাঁফর।।
সঙ্গী হেন নাহি কাকে কহিব বচন।
মত্ত মত নিদ্রা যায় স্বামী নরাধম।।'

বামনের ব্যর্থতা চন্দ্রাণীকে পীড়িত করেছে এবং অসামাজিক মিলনের প্রতি উন্মুখ করে তুলেছে। কামাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে চন্দ্রাণী বীর্যবান লোরকে বামনের অনুপস্থিতির সুযোগে নিজের নিভৃত শয়নমন্দিরে প্রবেশাধিকার দিয়েছে। আবার বামনের আগমন সংবাদে নিজেই উদ্যোগী হয়ে লোরকে নিয়ে অন্য রাজ্যে পলায়নের প্রস্তাব দিয়েছে —

'সেই ভাল তুমি আমি যাই দেশান্তর।
এড়াইমু বামন ক্রোধ কলঙ্ক দুস্তর।।'

চন্দ্রাণী জেনেশুনেই অসমাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন কেন-না আত্মসংযমে তিনি অনিচ্ছুক। ব্যর্থ দাম্পত্যকে বহন করতে তিনি রাজি নন। সেইজন্য লোরকে নিয়ে পালাতে চান। জীবনকে যৌবনকে উপভোগ করার ব্যাপারে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা নেই।

তবে পাশাপাশি নারীসুলভ কুলমর্যাদাহানির বেদনাও তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে —

'তিল এক সুখ লাগি হারাইলুঁ কুল।
মাঠেতে বসিয়া মুই হারাইলু মূল।।'

এই দ্বন্দ্বের জন্য তিনি স্বাভাবিক মানবী। স্বামী বর্তমানে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন যে সমাজসমর্থিত নয় এ সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তবে দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও ভোগবাদী মানসিকতাই তাঁর মধ্যে

মন্তব্য

প্রবল। সামাজিক কলঙ্কজনিত লজ্জা কখনও অবৈধ মিলনশয্যাকে দ্বিধাকন্টকিত করেনি। বামনের প্রতি চন্দ্রাণীর মন প্রথম থেকেই বিরূপ ছিল না। স্বামীকে দেহ-মনে পাবার আগ্রহ নিয়ে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দৈহিক অতৃপ্তি তাঁকে বিরূপ করে তোলে এবং বিরূপতা শেষ পর্যন্ত বৈরিতায় পরিণত হয়। পশ্চাদ্ধাবিত বামনের সঙ্গে লোরের যুদ্ধে তিনি লোরের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। বামনের মৃত্যু চন্দ্রাণীকে বিচলিত করেনি। সম্ভোগে অতৃপ্তি তাঁকে স্বৈরিণী নারীতে পরিণত করেছে। লোরকে পেয়ে তিনি তৃপ্ত হয়েছেন। মাতৃত্বে সার্থক হয়েছে তাঁর নারীজীবন। ময়নার সঙ্গে থাঁর প্রভেদ এইখানেই। ময়না পতিপ্রেমের আদর্শ রক্ষায় জীবনকে বঞ্চিত করেছেন আর চন্দ্রাণী জীবনকে সার্থক করার জন্য আদর্শকে বলি দিয়েছেন। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর যৌবন উপভোগকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন কবি। ময়না ও চন্দ্রাণী দুজনেরই সমান স্থান রাজা লোরের জীবনে। বারো বছর ভিন্ন নারী সহবাস সত্ত্বেও প্রথমা পত্নীর কথা মনে পড়ায় তিনি ফিরে এসেছেন দুজনেই অনুমৃতা হয়েছেন আলাওলের কাব্যে। দৌলতের ইচ্ছা অনুযায়ী কাব্যের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন তিনি। চন্দ্রাণীর পিতা ও রাজ্যের প্রজারাও লোর ও চন্দ্রাণীর সম্পর্ক মেনে নিয়েছেন।

হয়তো দৌলতের মনে রাধা-কৃষ্ণ কথা সক্রিয় ছিল। সমাজে পরকীয়া প্রেম নিন্দনীয়। লোকে কলঙ্ক ঘোষণা করে। আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধাকেও লোকে কলঙ্কী বলত। চণ্ডীদাসের পদে রাধার মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যের চন্দ্রাণীর মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন কবি —

'লোকে ঘুষিবেন্ত রাজসুতা দুষ্টা ছলে।
নিজকান্ত বিনাশিল উপকান্ত বলে।।'

আয়ানের মতো বামন এখানে নপুংসক এবং রাধার কৃষ্ণাভিমুখী হওয়ার মতো চন্দ্রাণীও এখানে লোরের অভিমুখী। বাইরের এই মিলটুকু আছে। ভিতরে তত্ত্ব আছে। বৈষ্ণব পদাবলির হ্লাদিনী শক্তির তত্ত্ব অবশ্যই দৌলতের কাম্য নয়। তবে সুফিতত্ত্ব আছে। সে প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। এখানে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে চন্দ্রাণীর সঙ্গে রাধার তুলনা করা হচ্ছে।

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের প্রভাবও কিছুটা আছে। বিদ্যার মতো চন্দ্রাণীও পরপুরুষকে তথা প্রেমিককে শয়নকক্ষে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। দুই ক্ষেত্রেই প্রেম অবৈধ হলেও বিদ্যার ক্ষেত্রে তা কুমারীর প্রেম আর চন্দ্রাণীর ক্ষেত্রে তা বিবাহিতা নারীর পরকীয়া প্রেম। সুন্দর সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার শয়নকক্ষে এসেছেন; লোর গবাক্ষপথে এসেছেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কাহিনিতেও বিল্বমঙ্গল দড়ি মনে করে সাপকে ধরে চিন্তামণির ঘরে এসেছিলেন। এক্ষেত্রে চিন্তামণির প্রেম পতিতার প্রেম। লোরের গবাক্ষপথে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গেই শুধু এর মিল। চন্দ্রাণীকে আমরা কামতাড়িত না বলে স্বাভাবিক আকাঙ্খার বশবর্তিনী বলব। পরে সে লোরের সঙ্গে ফিরে এসে সপত্নীর সঙ্গেও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

বামন চরিত্র ঃ- এই কাব্যের প্রতিনায়ক চন্দ্রাণীর স্বামী বামন। তিনি নপুংসক। বীর হলেও যৌবন-উপভোগ উন্মুখ স্ত্রীর মনোবাঞ্ছা পূরণে অসমর্থ। আকৃতিতে খর্ব হলেও বীরত্বে খর্ব নন। তাঁর মধ্যে সারল্য আছে। পত্নীর প্রতি ভালোবাসা আছে। যদিও যৌনতার বিচারে তিনি অক্ষম স্বামী। তিনি বীর বলেই তাঁর অনুপস্থিতিতেই চন্দ্রাণীকে নিয়ে প্রায় পলাতকের মতো রাজ্য ছেড়ে চলে যান লোর। বামন যখন জানতে পেরেছেন তখনই পশ্চাদ্ধাবন করে পথমধ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি সরল বলেই ভাবতে পারেননি তাঁর স্ত্রী অবিশ্বাসিনী। তিনি অবশ্যই যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। কিন্তু মূর্ছাহত লোরের সারথি কৌশল করে চন্দ্রাণীর ওড়না রক্তে ভিজিয়ে তারে সাহায্যে বামনের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে মানসিকভাবে তাঁকে দুর্বল করে তোলে। যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয়ে থাকে তবে আর যুদ্ধের প্রয়োজন কী — এই ভেবে বামন অস্ত্রত্যাগ করেন। তাঁর মোহগ্রস্ত অবস্থার সুযোগে লোর তাঁকে হত্যা করেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি মানবিক উদারতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। কপট যুদ্ধে হারলেও লোরের বীরত্বকে তিনি উপেক্ষা করেননি। লোর সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য —

'হেন বীর অবতার না দেখয় এ সংসার
মোহর গোচরে ধনু ধরে।
আমারে রণেতে জিনি লই যাও চন্দ্রাণী
কে সহিব তোমারে সমরে।।'

নপুংসক বামনের প্রতি পাঠকের একই সঙ্গে করুণা ও শ্রদ্ধা জাগে।

অন্যান্য চরিত্র ঃ- প্রধান চারটি চরিত্র ছাড়া ছোটোখাটো অনেক চরিত্র আছে। সেগুলি মূল কাহিনিকে বিকশিত ও পরিণামমুখী করেছে। যেমন লম্পট ছাতনকুমার। ময়নাকে বশীভূত করার জন্য সে রত্না মালিনীকে নিয়োগ করেছে। কিন্তু ময়নার সতীত্বের কাছে তার চাতুরী ব্যর্থ হয়েছে।

অবশ্য তার জন্যই ময়নার চরিত্র আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসুন্দরের হীরা মালিনীর মতই রত্না মালিনী। সে একজন কুট্টিনী। টাইপ চরিত্র। চন্দ্রাণীর বাবা স্নেহশীল পিতা। চন্দ্রাণী ও তাঁর স্বামী বামন একত্রে রাত্রি যাপন করছেন জেনে খুশি হয়েছেন। পরে কন্যার দুঃখে দুখিত হয়েছেন। বামনের মৃত্যুর পর কন্যার সুখের জন্য লোরকে জামাতা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। চন্দ্রাণীর চিত্র দেখেছিলেন এবং তাঁর গল্প শুনেছিলেন রাজা লোর একজন যোগীর নিকট। সেই যোগীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন গোহারী দেশে। এই যোগীও এক গৌণ চরিত্র। কাহিনির প্রয়োজনেই তিনি এসেছেন এবং কাজ ফুরিয়ে গেলেই তিনি বিদায় নিয়েছেন। এছাড়া গৌণ চরিত্রের মধ্যে আছে চন্দ্রাণীর সখীরা। তারা লোর-চন্দ্রাণীর প্রণয়ে সহায়তা করেছে। সখীদের বিভিন্ন খাটের উপর শায়িতা রেখে লোরকে পরীক্ষা করেছেন চন্দ্রাণী। এছাড়া ধাত্রীর চরিত্র আছে যে চন্দ্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীলা এবং তার প্রণয়ে সহায়তা করেছে।

মধ্যযুগের বাংলা আখ্যানকাব্যগুলির একটি বৈশিষ্ট্য সর্বজনস্বীকৃত। কাহিনী বিন্যাসে মধ্যযুগের এই কবিরা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিণত শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি; কিন্তু প্রচুর সার্থক ও উজ্জ্বল চরিত্র সৃষ্টি করে প্রশংসনীয় গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। সেই ধারারই একজন সার্থক কবি আরাকান রাজসভার দৌলতকাজী। বিষয়ের ব্যাপারে অর্থাৎ কাহিনীর ক্ষেত্রে তিনি হিন্দী কবি সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্যের খণ্ড, কাব্যের সূত্রপাতেই স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু যে অলৌকিক প্রতিভায় তিনি একটি অতি ক্ষুদ্রাকৃতি রূপকথা সমৃদ্ধ কাব্যকে অসাধারণ আখ্যানকাব্য হিসেবে গড়ে তুলেছেন — সেই একই অঘটনপটিয়সী প্রতিভায় তিনি সৃষ্টি করেছেন বেশ কয়েকটি অসাধারণ চরিত্র। তবে একই আখ্যানকাব্যের সব চরিত্রই যে সার্থক উজ্জ্বল এবং অবিস্মরণীয় হবে তা নয়। শুধু কাহিনীর প্রয়োজনে প্রচুর চরিত্রের আমদানী ঘটবে যারা পাঠকের হৃদয়ে তেমন করে দাগ কাটবে না। এও বলা যায় এই চরিত্রগুলির প্রয়োজনানুযায়ী উদ্‌ঘাটন কিংবা অপ্রয়োজনীয় আনয়ন কবি প্রতিভার সুনাম ও গৌরব সবসময় বৃদ্ধি করবে না। এই জাতীয় চরিত্র গৌণ চরিত্র। কাহিনির কর্তৃত্ব যার হাতে কিংবা যে চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে কাহিনির পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়, সেগুলি প্রধান বা মুখ্য চরিত্র। 'সতীময়না' কাব্যে প্রধান চারটি চরিত্র — ময়নাবতী, রাজা লোরক, বামন এবং চন্দ্রাণী। গৌণ চরিত্রের তালিকা বেশ দীর্ঘ — যোগী, ধাই, সখী, সারথী, চন্দ্রাণীর পিতা, দৈবপুরুষ, রতনা মালিনী, সৃঞ্জয় রাজা, রাজপুত্র স্বর্ণষ্ঠীব, মুনিবর অঙ্গিরা ও নারদ, ছাতন কুমার, রাজা উপেন্দ্রদেব, রাণী রতন কলিকা, আনন্দ, মদনমঞ্জরী, সদাগর রাক্ষস, শুক পাখি, ব্রাহ্মণ, রাজপুত্র প্রচণ্ডতপন, চন্দ্রপ্রভা প্রমুখ।

ময়নাবতী ঃ- দৌলতকাজীর চরিত্র নির্মাণের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য নজর এড়িয়ে যাওয়ার নয়। কাব্যের নারী চরিত্রগুলিকে কবি যেমন পূর্ণতা দান করেছেন, প্রায় কোন পুরুষ চরিত্রই সে দাবী করতে পারে না। রাজা লোরের কথা মনে রেখেও একথা সত্য। নারী চরিত্রে মাধুর্য ও ঔদার্য কবি অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের পাঞ্চভৌতিক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সমীরের মুখ দিয়ে বলেছেন, ''বাংলা সাহিত্যে পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রগুলি জীবন্ত।'' দৌলতকাজীর 'সতীময়না' কাব্যের নারীচরিত্রগুলি জীবন্ত ও গতিশীল হওয়ার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত।

কাব্য-সাহিত্যে কোন কোন চরিত্রের বিশেষ একটি ভূমিকা থাকে। কোন কোন চরিত্র স্রষ্টার বিশেষ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দর্শনকে ধারণ করে বিবর্তিত হয়। 'সতীময়না' কাব্যে সতীত্বের আদর্শ পুষ্ট ময়না। এই চরিত্রের মধ্যে প্রেমের এক দীপ্ত শিখা সতীত্ব ও পতিব্রত্যকে ভিত্তি করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাব্যবিন্যাসে কবি দৌলতকাজীর এই বিশেষ উদ্দেশ্যটি অনুচ্চারিত থাকেনি। 'রোসাঙ্গের রাজার প্রশস্তি' অংশে কবি তারই নির্দেশ রেখেছেন —

'শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি।
শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী।।
ভারতে পুরাণে সত্য, সত্য সে বাখানে।
চন্দন তিলক সত্য উগে সর্বস্থানে।।
সত্য বলে মহাপাত্র বাড়িল, উন্নতি।
কোন্ মতে হৈল ময়না পরিব্রতা সতী।।'

সত্যের এই জ্যোতির্ময় আলোক ময়না চরিত্রের ধ্রুবতারা। পরিপূর্ণ সত্যের বিশ্বাসে যাবতীয় প্রতিকূলতার মধ্যেও স্থির অচঞ্চল থাকার সাধনা ও প্রেরণা ময়নার। 'কথারম্ভ' অংশের সামান্য বর্ণনাধর্মী উপস্থাপনায় কবি দেবী পার্বতীর সঙ্গে তুলনার সাদৃশ্যে দৃঢ় সংকল্প ময়নার অসামান্যতাই চিত্রিত করেছেন —

'রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী।

ভুবন বিজয়ী কন্যা জগতে পার্বতী।।'

দেবী চরিত্রের সঙ্গে যে চরিত্রের তুলনা, তার রূপে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া উজ্জ্বলতা নেই, একটি স্নিগ্ধতা বিরাজমান। মনে হয় যেন ময়নার বাইরের অনুপম রূপ ও সৌন্দর্য ময়নার অন্তরকে প্রেম সুধায় উদ্ভাসিত করে। কল্যাণময়ী প্রেমের প্রতীক এই রমণীর আচারে আচরণে সংসারে শ্রী ও মঙ্গল আবর্তিত হয়। পতি এই নারীদের প্রিয়তম পুরুষ, তাদের আরাধ্য দেবতা —

'প্রিয়বাদী পতিব্রতা সুলাস সুমতি।
প্রত্যক্ষ শঙ্কর সম সেবে নিজ পতি।।'

পতি বিমুখ হলে অসহনীয় যন্ত্রণায় তার পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করে। হৃদয়ে জাগিয়ে রাখে স্থির বিশ্বাস। রূপতৃষ্ণার্ত চঞ্চল পুরুষ রাজা লোরের পত্নী স্বামী সান্নিধ্য বঞ্চিতা জীবন মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু গৃহকর্মে ও গৃহধর্মে নিযুক্তা ময়না সত্যনিষ্ঠায় এক বিন্দু আঁচড় পড়তে দেয় না। স্বামী বঞ্চনায় অসহিষ্ণু কোনোভাবেই নিজের ধর্ম বিশ্বাসকে লঙ্ঘন করে কর্মক্ষেত্রে চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না, পরপুরুষ আসক্তি তার কল্যাণময়ী মানসগৃহে উঁকি দেয় না। উমা-পার্বতীর সঙ্গে তপস্যা ধর্মে ময়না একাসনে বসার অধিকারী।

পতি যে কামোন্মত্ত পুরুষ ময়নার তা অজানা নয়। কিন্তু যুগে যুগে মঙ্গলময়ী পতিপরায়ণা রমণীরা এই উচ্ছৃঙ্খল পরনারী আসক্ত পুরুষদের জন্য পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে অপেক্ষা করে। হৃদয়ে জ্বালিয়ে রাখে প্রেমের পুতাগ্নি। 'সতীময়না' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে এই ময়নাকেই বিরহের আগুনে পুড়িয়ে কবি যোগিনীর রূপ দান করেছেন। 'বারমাস্যা'-র দীর্ঘ অংশে দেহ ও পরিবেশ সচেতন কিন্তু বিশ্বাসে স্থির, লক্ষ্যে অবিচল ময়নারই আবির্ভাব ঘটেছে। শরীরের প্রসঙ্গ উপেক্ষা না করে ময়না বাস্তব মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট নারীর যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। শরীর আছে, মিলনের আকাঙ্খা সেই শরীরেও ঝেঁপে আসে। ময়না সে দিক উদ্‌ঘাটিত করে আমাদের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে —

'শ্রাবণের গগনে সঘন ঝরে নারী।
তবু মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর।।
মদন ঐষিক জিনি বিজলীর রেহা।
তর্কয় যামিনী কম্পয় মোর দেহা।।'

ময়নার শরীরের প্রতি এ আকুলতা প্রকাশ আশ্চর্য স্বাভাবিক। কারণ তার পতি বর্তমান। মিলনের আকাঙ্খাও তার স্বাভাবিক। এই আকাঙ্খা ময়নাকে দেহবাদী নারী না করে স্বামী অনুরাগিনী নারীতে পরিণত করেছে। ময়না চরিত্রের অসাধারণত্ব দেহ ভাবনার প্রকাশে নয়, সেই মিলনাকাঙ্খাকে আশ্চর্যের কাঠিন্যের প্রতি সংযমে। এই নারীর চোখে পরপুরুষসঙ্গ অকল্পনীয়, বিষবৎ পরিত্যাজ্য —

'আন পুরুষ নহে লোর সমতুল।।
লাখ পুরুষ নহে লোরক সরূপ।
কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ।।
গরম সদৃশ পর পুরুষের সঙ্গ।
দংশিয়া পলায় যেন এ কাল ভুজঙ্গ।।'

ময়না চরিত্রের এই দর্শন পাণ্ডিত্যের প্রভাবজাত নয়, জীবনের সত্য আলোক চেতনা থেকে স্বতোৎসারিত। ছাতন কুমারের প্রলোভন বার্তায় মাঝে মাঝে দেহ ও মনে দ্বন্দ্ব জেগে উঠেছে। কিন্তু ক্ষণিকের বুদবুদের মত জেগে ওঠে এই দেহচেতনা হারিয়ে গেছে, পরাজিত হয়েছে বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও সংযমের গভীরতম বোধের কাছে। সংকল্পের এই দৃঢ়তায় স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা বিরহকাতরা ময়না সত্যসুন্দরের উপাসনায় শুদ্ধ প্রেমেরই আরতি করেছে —

'নিজ রাজ্যে ময়নাবতী দেব ধর্ম পূজে নিতি
স্বামী-বর মাগে সর্ব কালে।'

ময়নার একটাই লক্ষ্য স্বামীর প্রত্যাবর্তন এবং স্বামীর সঙ্গ সুখ। রাজার স্ত্রী হিসেবে ময়না চাইলেই হয়তো যুদ্ধ সংঘটিত করে চন্দ্রাণীর কবল থেকে স্বামীকে উদ্ধার করতে পারত। কিন্তু ময়নার মত রমনীর পক্ষে সে পথ যথার্থ পথ নয়। তাছাড়া ঐভাবে স্বামীকে ফিরে পেলেও তার প্রেম যে ময়নার প্রতি ধাবিত হবে এমন ভাবনায় জোর করে কিছু বলার উপায় নেই। কবি তা চান নি বলেই লোরের কামনা ও ভোগের রাজ্যে ময়নাকে উপস্থিত করেন নি। ময়নাকে বিরহ ব্যথার যন্ত্রণায় আরাধও তাপসীর মূর্তি দান করেছেন। তপশ্চর্যার এই মঙ্গল ও সত্য চিরকাল ভোগ ও চঞ্চল কামনার ঊর্ধ্বে বিরাজমান। সীমাহীন প্রতিক্ষার এই সাধনাই একদিন কামনার রাজ্য থেকে রাজা লোরকে ময়নার কাছে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। কামনা নয় প্রেমই শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছিল।

বিশ্বাস ও সত্যের একটি তারে চরিত্রকে আদ্যন্ত গড়ে তুলেছেন, কবি দৌলতকাজী। আলাওলও সত্যবন্ধ ময়নার চরিত্রকেই আলোকিত করেছেন। এক সুরে বাঁধা ময়না চরিত্র তবু চরিত্রে পর্যবসিত হয়নি। সত্য বিশ্বাস ও অবিচল প্রতীক্ষার নিঃকম্প শিখা মাঝে মাঝেই কম্পিত হয়েছে দেহের বাস্তবতায়, সতিনী চন্দ্রাণীর প্রতি অভিশাপ বাণী উচ্চারণে —

'যে দুঃখ মোহর পরে পড়িয়াছে ধাই।
সেই দুঃখ পড়োক গিয়া সতিনীর ঠাঁই।।'

'আমার পরাণ যেমতি করিছে, তেমতি হউক সে' — যন্ত্রণাদগ্ধ রাধার এই উচ্চারণের সঙ্গে মিলে যায় ময়নার উচ্চারণ। ময়না চরিত্র গড়ে তুলতে গিয়ে বৈষ্ণব পদাবলীর জগতের রাধার চরিত্র বৈশিষ্ট্যেই আদ্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন কবি। রাধা চরিত্রের মূল ভাব বীজ দৌলতকাজীর হাতে যেন ময়নার মূর্তি ধারণ করেছে। তাই সতিনীকে গালমন্দ করছে ময়না, প্রতিনিয়ত বিরহ যন্ত্রণায় পিষ্ট হচ্ছে, কিন্তু পরপুরুষের প্রসঙ্গ আনলেই দূতীকে গালমন্দ করে সেই যোগিনীর বেশকেই স্বীকার করে নিচ্ছে ময়না। যোগিনী ময়নার সেই মূর্তি মালিনী রত্নার বক্তব্যে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত —

'মলিন চিকুর তোর মলিন অম্বর।
মলিন দেখয় তোর চারু কলেবর।।
নয়নে অঞ্জন নাহি সীযেত সিন্দুর।
ত্রিভঙ্গ খোপার মাঝে না দেখি তোহোর।।'

ময়না চরিত্রের এই স্বামীপ্রেম অগ্নিশিখার মত বিরাজমান, এই সত্য তার অন্তরের সুদৃঢ় সংস্কার। শত প্রলোভনও এই সত্যের দেওয়ালে ফাটল ধরাতে পারে না। এই সতীত্ব ধর্মকে কবি অনবদ্যরূপে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে রেখেছেন ময়না চরিত্রে। বাহ্যবিচারে ময়না হয়তো সক্রিয় নয়, চন্দ্রাণীর মত নিজের তৃপ্তির প্রয়োজনে প্রণয়ীর সঙ্গে মিলনে দুঃসাহসিক ও অসামাজিক প্রচেষ্টা তার নেই। আসলে ময়না ও চন্দ্রাণী ভিন্ন প্রকৃতিতে গড়া। তাই চন্দ্রাণীর মধ্যে রোমান্টিক আবেগ উচ্ছ্বলতা, ময়নার চরিত্রে নীতির মূল্যবোধের স্বচ্ছতা ও গভীরতা। আলাওল রচিত অংশে, নীতি ও সংযমে সুস্থির কিন্তু বাস্তবের আঘাতে চঞ্চল সজীব ময়নারই দেখা মেলে —

'স্বামীর বিচ্ছেদে ঘোর অসন্তোষ চিত।
সংসারের যত সুখ লাগে বিপরীত।।
মোহর ঘরেতে লোর আসিবেক যবে।
এক রাতে শতরাত্রি সুখ হৈব তবে।।'

দৌলতকাজী ও আলাওল উভয় কবি এমন ময়নাকেই জীবন্ত করেছেন। কবি দৌলতকাজী জীবিত থাকলে ময়না চরিত্র হয়তো আরও মাধুর্যপূর্ণ, সতীত্বধর্মে অবিচল নারী চরিত্রের পরিণতি লাভ করতো। কবি আলাওলও ময়না চরিত্রের পূর্বাপর সঙ্গতিবিধান করেছেন। ময়না চরিত্রের ক্ষেত্রে উভয় কবি মিলে ময়না চরিত্রকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন। আলাওল ময়না চরিত্রকে আর একটু এগিয়ে দিয়েছেন একটি বিশেষ ভাবনায়। চূড়ান্ত প্রতীক্ষার পরও স্বামীর প্রত্যাবর্তন না ঘটায় শুক পাখি সহ এক ব্রাহ্মণকে রাজা লোরের চেতনা ফেরাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে। বাস্তব মানুষের অগ্রবর্তী ভাবনায় ময়না এই অংশে একেবারে মাটির কাছাকাছি চলে আসা চরিত্র এবং তার পূর্ণতা সব মিলিয়ে।

চন্দ্রাণী ঃ- প্রাত্যহিকতার পরিচিত পথ রোমান্স অধিবাসীকে আকর্ষণ করে না। অন্তরের প্রচণ্ড তাগিদ এবং সব ছাপিয়ে যাওয়ার দুর্বার বাসনাই রোমান্টিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন নর-নারীকে ঘর ছাড়া করে। রহস্য রোমাঞ্চ এবং অজানার হাতছানি এদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে সাহস। এই সাহসই জাগতিক বন্ধন ছিঁড়ে রোমান্টিক নর-নারীকে দূরে বহুদূরে হারিয়ে যেতে সাহায্য করে। সুপী প্রেমের আদর্শ দৌলতকাজীকে দেহ ও দেহাতীত প্রেমে সমন্বয় সাধনে উদ্যোগী করেছিল। মঙ্গল ও সত্যের প্রতি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবির সমর্থন থাকলেও কবি হৃদয়ের আকুতি ছিল অন্য ছবি অঙ্কনের প্রতি। স্পষ্টভাবে বলতে হয়, দৌলতকাজীর কবি হৃদয় বিভাজিত হয়েছিল দুই শ্রেণির প্রেমের প্রতি। কবির নৈতিক সমর্থন ছিল সতীত্বের মহনীয়তার উজ্জ্বল ময়নার প্রতি। কিন্তু প্রাণের সমর্থন ছিল বাসনা রাজ্যের রাণী রোমান্টিক চন্দ্রাণীর প্রতি।

রাজসভার দরবারী রুচি ও আকাঙ্খাও দৌলতেকাজীর কাব্য পরিকল্পনার পেছনে কাজ করেছিল সন্দেহ নেই। রাজসভার পরিবেশ মানেই ভোগের উন্মত্ত প্রবাহ, কামনার ফেনিল উচ্ছ্বাস এমনটা নয়। তবে রাজা ও রাজপুরুষেরা শুধু সতী লক্ষমী স্ত্রীর সাহচর্যই একমাত্র আদর্শ বলে স্বীকার করতেন না। যুদ্ধের রণদামামা অপরের রাজা অধিগ্রহণের বাসনা তাঁদের হৃদয়ে সাহসের উত্তেজনা জাগিয়ে তুলত। নারীর সৌন্দর্য ও নারী শরীর ভোগের মধ্যে রাজারাজড়ারা কোন বিবেকের তাড়না

মন্তব্য

অনুভব করতেন না। 'সতীময়না' কাব্যে চন্দ্রাণী চরিত্রটি পরপুরুষের ভোগের সামগ্রী না হয়ে নিজের অতৃপ্ত যৌবন বাসনার প্রচন্ড তাগিদে ভোগের রাজ্যকে নিজেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বলতে বাধা নেই, রোমান্টিক প্রেমের অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে পাঠকের সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করে উজ্জ্বল হয়ে আছে রাজকন্যা চন্দ্রাণী। এই নারী কামনা রাজ্যের রাণী নয়। বরং দেহগত যে বাসনা স্বামীর সহবাসহীনতায় অপরিতৃপ্ত, তার প্রভাবই চন্দ্রাণী চরিত্রের চালিকা শক্তি। ময়নাকে কবি দেবী পার্বতীর সঙ্গে তুলনা করে তার সতীত্ব ও ত্যাগ তিতিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। অসাধারণ শিল্পবোধ সেই কবি ইন্দ্রপত্নী শচীর সঙ্গে তুলনা করলেন চন্দ্রাণীর —

'স্ত্রীর মধ্যে চন্দ্ররাণী শচী কলাবতী।'

চন্দ্রাণী অসাধারণ রূপসী রাজকন্যা, তার বিয়েও হয় মহাবীর বামনের সঙ্গে। কিন্তু এই বীর বামন সঙ্গমে অসমর্থ

'রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল।'

ভরা যৌবনের এই ব্যর্থতা কিন্তু চন্দ্রাণীকে কামময়ী করে তোলে না। তবে বিবাহ অনুসারী যে মিলনের স্বপ্ন নারী দেখে, তা প্রতিহত হওয়ার একটা হাহাকার তার মধ্যে জেগে ওঠে। বাধ্য হয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে তাকে বলতে হয় —

'সম্ভোগে শিশুর প্রায়, জ্ঞানে নহে আন।।
পশুমত স্বামী মোর, বুঝিলুঁ ধরণ।
শুন যদি তাকে মোকে করাও মিলন।
গরল ভক্ষিয়া মুই তেজিমু জীবন।'

স্বামীর এই অক্ষমতা অন্যের কাছে বলতে যাওয়া শুধু স্বামীর নয়, নিজেরও অপমান। এমন অবস্থা দেহসর্বস্ব নারী ছাড়া অধিকাংশ নারীই প্রেমের আলোকে অতিক্রম করে যেতে চায়। চন্দ্রাণীও হয়তো তাই করত। কিন্তু বামন সঙ্গমে অসমর্থ শুধু নয়, সে অসভ্য, অমার্জিত, প্রেমবর্জিত। এমন স্বামীর প্রসঙ্গে চন্দ্রাণীকে বলতে হয় —

'পশু সঙ্গে মনুষ্যের কোন্ অভিলাষ।।
মূর্খ স্বামী সঙ্গে ক্রিয়া সহস্র জঞ্জাল।'

সর্বগ্রাসী কামনা নয়, বিবাহিত নারী স্বামীর কাছ থেকে প্রেমযুক্ত কামনাই প্রত্যাশা করে। চন্দ্রাণীও তাই চেয়েছিল। কিন্তু বামনের কাছ থেকে সবদিক থেকে আশাহত হয়ে সে বলে ওঠে 'না মাগম কেলি কলা রতি রঙ্গ আশ।' এমন অবস্থার মধ্যেই কিন্তু চন্দ্রাণী তার লক্ষ্য স্থির করে নেয় এবং মায়ের কাছে প্রার্থনা করে —

'ভিন্ন এক মন্দির রচিয়া দেও মোকে।
সখীগণ সঙ্গে তথা থাকিমু কৌতুকে।।'

দেহগত কামনার প্রচণ্ড পীড়নই চন্দ্রাণীকে রাজা লোরের প্রতি আকর্ষণ করে তা নয়। চন্দ্রাণী নিজে অসাধারণ রূপসী। এই রূপ সচেতনাই তার মধ্যে বদ্ধ পক্ষ বিহঙ্গের মত রূপতৃষ্ণাকে লালিত করেছে। দৌলতকাজী চন্দ্রাণী চরিত্রের এই মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন একে একে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাছাড়া ফুলে মধু থাকলে ভোমরা গুন্‌গুন করবেই। চন্দ্রাণীর রূপের আগুন তাই অনেক পুরুষকেই তাড়িত করেছে, একটিবার দেখার আগ্রহে তাদের হৃদয় তৃষিত হয়ে রয়েছে। চন্দ্রাণী যদি শরীর সর্বস্ব নারী হোত, তবে তার কামনার আগুন মেটাবার জন্য পুরুষের অভাব হোত না। চন্দ্রাণীর দেহগত কামনা স্বাভাবিক, কিন্তু তাকে কোনোভাবেই অবাধ না করে আশ্চর্য সংযমে লক্ষ্য স্থির করেছে সে —

'কুল লজ্জা অন্তস্পট করি নারী রহে।
দক্ষিণ পবনে যেন শরীর না দহে।।
বৎসরের দুই বার যায় দেব স্থানে।
না দেখে সুন্দর রূপ তপন নয়ানে।।'

লোরের রূপ দেখে এই নারী একদিন আকুলিত হয়ে উঠল। এই আকুলতা স্বাভাবিক এবং চরিত্রানুগত। ময়নার সংযম প্রেমবোধ চন্দ্রাণী চরিত্রে প্রত্যাশা করা যায় না। স্বামীর সহবাসের ব্যর্থতা ময়নাকে তাড়িত করেনি, স্বামীর উপেক্ষা ও দূরে চলে যাওয়া তাকে ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতীক করে তুলেছে। চন্দ্রাণীর যন্ত্রণা ও যাতনা ভোগ স্বামীর সঙ্গমজনিত অসামর্থে — মানস সংঘটনের এই ভিন্নতাই এই দুটি নারী চরিত্রকে ভিন্ন মেরুর করে তুলেছে। তাছাড়া চন্দ্রাণী যে অনেকটাই দেহগত ও সৌন্দর্যমগ্ন — কামনা প্রতিহত আক্ষেপোক্তির মধ্যেই তা প্রমাণিত।

চন্দ্রাণীর রূপের মোহ ও কামনার সংযম চেষ্টাগত, হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত নয়। তাই লোরের রূপ মুহূর্তেই তাকে অবশ ও অচৈতন্য করে তোলে। এই দৃষ্টিকোণে চন্দ্রাণী রোমান্টিক নারী। যে কুলপ্লাবী লোর-আশক্তি এরপর চন্দ্রাণী চরিত্রে সঞ্চারিত তা কোন গৃহগতপ্রাণা নারীর মধ্যে সম্ভব নয়। নীতি-নৈতিকতা উপেক্ষা করার সাহস, কামনার রাজ্যে পুরুষকে পতঙ্গবৎ আকর্ষণ করার ক্ষমতা, বন্ধনমুক্তির অদম্য উৎসাহ, দেহযুক্ত রোমান্টিক প্রেমের জগতে হারিয়ে যাওয়ার যে বাসনা মানুষকে রোমান্টিক জগতের অধিবাসী করে তোলে তার সবকটি বৈশিষ্ট্যই চন্দ্রাণীর মধ্যে বর্তমানে আগত। এরপর একের পর এক দুঃসাহসিক কাজে সে চমকিত করে দিয়েছে। এইকাজে চন্দ্রাণীকে সাহায্য করেছে রতিবিলাসিনী রতিপণ্ডিত ধাই বুদ্ধি শিকা। এই বুদ্ধি শিখার পরামর্শেই দর্পণে নিজের মূর্তি দেখিয়ে লোরকে বিবস করে দিয়েছে চন্দ্রাণী। তারপর যখন যোগিবেশী লোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শনের সুযোগ এসেছে, তখন নিপুণ ছলাকলায় রতিশাস্ত্রের সহজ স্বাভাবিকবোধে সুকৌশলে ছিঁড়ে ফেলেছে গলার হার। যে সময়ে সখীরা অমূল্যরত্ন কুড়োতে ব্যস্ত, সেই দুর্লভ অবসরে প্রতিমার আড়াল থেকে লোরের সঙ্গে তার চাক্ষুস মিলন সংগঠিত হয়েছে। এই নারী ময়না নয়। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তা, সৌন্দর্য মোহগ্রস্ততা চন্দ্রাণীকে সম্পূর্ণ অন্য এক জগতের অধিবাসী করে তুলেছে। রোমান্টিকতার দুর্জয় সাহসে সমস্ত বিপদ বাধাকে উপেক্ষা করে চন্দ্রাণীই লোরকে মিলনের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। অতৃপ্ত যৌবন ক্ষুধা সর্বগ্রাসী হয়ে চন্দ্রাণীকে এ কাজে তাড়িত না করলেও পছন্দসই পুরুষের সঙ্গে মিলনে নারী হয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করায় বিবেকের কোন তাড়না তাকে প্রতিহত করেনি। বরং রূপের মোহে অজস্র প্রতিকূলতা জয় করে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনে রোমান্টিকতাই জয়যুক্ত হয়। মুক্ত প্রাণের এই অধিবাসীরা যথার্থই রহস্যময় রোমান্স জগতের। অনেক বাধার পরে মিলনের স্বাদ এদের আকুল করে বলেই মিলনানন্দকে রোমান্টিক নারী-পুরুষ অসামাজিকতার অপরাধ বিচারে দূরে সরিয়ে রাখে না। গোপন মিলনের শিখরস্পর্শী সে ছবি কবি আমাদের উপহার দিয়েছেন —

'বিদ্যার সম্পাশে যেন বসিল সুন্দর।
দূরে গেল বদনের লজ্জার অম্বর।।
দোহ উন্মত্ত দোহ রসেতে দুজন।
কাম রসে রতি শাস্ত্রে দোহান বিদ্বান।।
পয়োধর গ্রীবা ধরি ঘন বাহু তাড়ি।
রতি যুদ্ধে যেন দুই মত্তে গড়াগড়ি।।'

মধ্যযুগীয় আদিরসের অনাবৃত হয়তো একে বলা যায়। কিন্তু পুলক রোমাঞ্চিত দেহগত স্বাভাবিক মিলনের রোমান্টিকতা এই জাতীয় আচরণের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। যা স্বাভাবিক মন যাকে চায় — রোমান্টিকতার যাত্রা সেই পথেই। আদর্শের জন্য জীবনের স্বাভাবিক জীবনাগ্রহকে বলি দিতে রোমান্টিকতা চায় না। তাই মিলনেই শুধু নয়, আরো দূরে অভিযান শেষ নবীন মিলনও রোমান্টিকতা প্রত্যাশা করে। স্বামী থাকা সত্ত্বেও সাহসী পুরুষের সঙ্গে রহস্যরোমাঞ্চের পথে চন্দ্রাণী ঝাঁপিয়ে পড়ে শুধু এই আকুলতায়। শুধু তাই নয়, পলায়ন যাত্রায়, বামনের সঙ্গে যুদ্ধে। যোগ্য নির্বাচিত পুরুষকে সার্থক প্রতিনিধি হয়ে সে উৎসাহিত করে। এই অংশে চন্দ্রাণী রোমান্টিক পুরুষের যোগ্য সহযাত্রী। কিন্তু চন্দ্রাণী বাস্তববুদ্ধি সম্পন্না নারীও বটে। ক্রমাগত গোপন মিলন যে একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং বীর বামন যে তাকে সমূলে বিনাশ করবে, চন্দ্রাণী এই আশঙ্কার কথা প্রণয়ী লোরের কাছে উত্থাপিত করে। কারণ লোরের সঙ্গে বহুদূরে পালিয়ে যাওয়ার বাসনা চন্দ্রাণীর। কিন্তু লোর যখন বামনকে বিনাশের কথা বলে, সেই মুহূর্তে চন্দ্রাণীর বক্তব্যে শুধু সমাজসচেতনতাই নয়, অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানেরও প্রকাশ মেলে —

'করিব বৈরিতা যুদ্ধ বামনের সঙ্গে।
পৃথিবীতে তোমা নাম রহিব কলঙ্কে।
লোকে খুষিবেন্ত রাজ-সুতা দুষ্টা ছলে।
নিজ কান্ত বিনাশিল উপকান্ত বলে।।'

উপপত্নী হিসেবে না থাকতে চেয়ে চন্দ্রাণী আত্মমর্যাদায় লোরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার আকাঙ্খা প্রকাশ করে। মধ্যযুগীয় রোমান্স ভাবনায় নয়, যেখানে অবিশ্বাস্য ভাবনা জড়িত — সেই চরিত্র পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে গিয়ে দৌলতকাজী চন্দ্রাণী চরিত্রে পরিণত রোমান্টিকতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

লোর ঃ- পৃথিবীর পুরুষ জাতি ও চরিত্র সম্পর্কে একটি চালু অপবাদ কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। 'সতীময়না' কাব্যের রাজা লোর সেই পুরুষ জাতির যোগ্য প্রতিনিধি। পতিব্রতা সতীসাধবী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও চঞ্চলতা সেই এক কামোন্মত্ততারই প্রমাণ। দৌলতকাজীও লোরকে সেইভাবেই উপস্থাপিত করেছেন —

মন্তব্য

'যুবক পুরুষ জাতি নিঠুর দুরান্ত।
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত।।
আচম্বিতে মতি হৈল লোরক নৃপতি।
ছাড়িয়া রতন-হার গুঞ্জাত আরতি।।'

চরিত্রের এই আগ্রাসী ভোগলিপ্সার কারণেই স্ত্রী ময়নাকে পরিত্যাগ করে রাজা লোরের বনবিহার। স্বামীর এই জাতীয় মনোভাব ময়নার অজানা নয়। সামন্ত মানসিকতা পুষ্ট লোরের নারীপ্রীতির প্রতি বিরোধিতা করা ময়নার পক্ষে অসম্ভব। এটা এমন সময় যখন রাজারাজড়াদের বিবাহিতা পত্নীরা থাকত অন্তঃপুরে; আর কামনা মদির রাজারা সুন্দরী রমণীদের শরীরের আকর্ষণে ফেনিল উদ্দামতায় বর্ণময় জীবন অতিবাহিত করত। ময়নার এমন স্বামী রাজা লোর। যার চরিত্র সম্পর্কে স্ত্রী হয়েও ময়নাকে বলতে হয় —

'পুরুষ ভ্রমর কঠিন কলেবর
অন্তরে বাহিরে কালী।
যাবৎ মত্তমতি পুরি মনঃপ্রীতি
আর পুষ্পে করি কেলি।।'

লোর চরিত্র আদ্যন্ত কামনালুব্ধ, ভোগবাদ সর্বস্ব পুরুষচরিত্র, জোর করে একথা বলা যাবে না। রোমান্স জগতের অপর এক চরিত্র চন্দ্রাণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, দৌলতকাজী লোর চরিত্রের ভিন্নাত্মক মাত্রা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যোগী প্রদর্শিত অসাধারণ রূপসী চন্দ্রাণীর চিত্রপট দর্শনেই রাজা লোরের কামনামদির চিত্তে গোহারি দেশে যাত্রা। এই আচরণ চঞ্চল মতি পুরুষের আচরণ ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে কবি নায়কের অভিসার যাত্রা করিয়েছেন, তাকে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় দুঃসাহসিক করে তুলেছেন, সেই মুহূর্তেই চরিত্রটিতে রোমান্টিকতার স্পর্শ লেগেছে। তারপর একের পর এক তার রোমাঞ্চপুষ্ট আচরণে হালকা হয়েছে স্থূল রুচির বৈশিষ্ট্য। রূপকথার জগতের বীর রাজপুরুষ যে সাতসমুদ্র তেরো নদী অতিক্রম করে বিশাল এক দেশের রাজকন্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছে — তার ছায়াতেই এই অংশের লোর চরিত্র গঠিত। অপরিচয়ের পথে যে বাধা আছে, এটা লোরের অজানা নয়। কিন্তু সেই তো বীর, যে শত বিপদ বাধাকে উপেক্ষা করে বহুদূর দেশে অপেক্ষারত সৌন্দর্য প্রতিমার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। প্রেমের এই সম্পর্কে রোমান্সেরই ছায়া। আর সেই কারণেই দুরন্ত সাহসে এবং গা-ছমছমে ভীতির পরিবেশেই চন্দ্রাণীর সঙ্গে লোরের মিলন। এক্ষেত্রে রোমান্স জগতের অধিবাসী লোরের বীরমূর্তি —

'হাতে খড়্গ শোভে নেত ধরা পরিধান।
বীর মূর্তি অকাতর মাতঙ্গ সমান।।
কুমারীর অন্তঃপুরে গেলা লোরবর।
রোহিনী উদ্দেশে যেন গেলা নিশাকর।'

পুরুষের এমন বীরমূর্তিই নারীদের আরাধ্য। এদের জন্যই নারীরা মনে মনে দিবস রজনী অপেক্ষা করে। বীরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে এবং একজাতীয় রোমাঞ্চে এদের হাত ধরেই পথে বের হয়। চন্দ্রাণীও সুপুরুষ বীর লোরের সঙ্গে একদিন নিশ্চিত অবস্থান ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করে। এই পলায়নের পথেই বামনের সঙ্গে লোরের একটা বেশ গুরুগম্ভীর কিন্তু রূপকথার জগতের অবিশ্বাসমাখা যুদ্ধ বর্ণিত। এই অংশে বীর লোরই অঙ্কিত — ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ক্ষমতায় এবং কাঙ্খিত নারীকে অধিকার করার সোচ্চার ঘোষণায় বামনকে যে ভাষায় লোর আক্রমণ করেছে তাতে নারী ভোগের দুর্বার বাসনা ও কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত —

'খর্ব কাপুরুষ যেই নপুংসক ক্রিয়া।
পুরুষ উত্তম স্থানে ভেজে তার প্রিয়া।।
পুরুষ ভ্রমরা জাতি মধু যথা পায়।
সুগন্ধি কুসুম নারী রসেতে খেলায়।।'

এমন পুরুষই সুন্দরী নারীকে অধিকারে নিয়ে আসতে; যোগীবেশ ধারণ করে। যদিও এই যোগীবেশ ধারণ বেশ একটা রহস্য রোমাঞ্চের পরিবেশেই গড়ে তোলে। তা সত্ত্বেও লোরের বিশ্বাস-অবিশ্বাস মাখা রোমান্টিক বীরত্বে দুর্বল কাপুরুষত্ব ছায়াবিস্তার করে, সে ব্যক্তিত্বময়ী চন্দ্রাণীর দ্বারা পরিচালিত হয়। চন্দ্রাণী যেমনটি চেয়েছে, বীর লোর সেই সেই কাজই করে গেছে। তবে সর্পদংশে সাময়িক অচৈতন্য এবং মৃত বলে মনে হওয়া চন্দ্রাণীর জন্য লোরের বিলাপ পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে —

'উঠ উঠ চন্দ্রমুখী কত নিদ্রা যাও।
মাধুরী সাদরে কেনে আমা না বোলাও।।'

চকিত মুহূর্তে রোমান্টিক লোরের মধ্যে অন্য এক লোরের মূর্তি জেগে ওঠে। ময়না ও চন্দ্রাণী চরিত্রের গতিশীলতা না থাকলেও লোরের চরিত্র অভিনব। মন্তব্য

বামন ঃ- বিধাতার বিচিত্র পরিহাস কোন কোন চরিত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়। বাস্তবের কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই সব মানুষের অসহায় বেদনাবোধ তখন ট্র্যাজেডির হাহাকারে পর্যবসিত হয়। 'সতীময়না' কাব্যের এইরকম এক পুরুষ চরিত্র চন্দ্রাণীর স্বামী বামন। আবির্ভাবে এই চরিত্রের অসাধারণ বীরমূর্তি কবি অঙ্কন করেছেন —

'দুর্জয় বামন বীর বিখ্যাত ভুবন।
সমর ভূমিতে যেন সিংহের গমন।।
খর্বরূপ হই বীর দীর্ঘ করে নাশ।
বামন বিক্রম যেন বলির উদাস।।'

গোহরি দেশের রাজা মোহরা এমন বীরের সঙ্গে অসাধারণ রূপবতী কন্যা চন্দ্রামীর বিয়ে দেন। বিবাহ পরবর্তী অবস্থাই বামনের জীবনে এবং বামন-চন্দ্রাণীর সম্পর্কে মহাসঙ্কট তৈরী করে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে এমন বীরই দাম্পত্য জীবনে এক অসহায় ব্যর্থতায় বিড়ম্বিত জীবনের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়। বামন নারী সহবাসে অক্ষম, একজন নপুংসক —

'রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল।'

পুরুষের পৌরুষত্বের এমন অমর্যাদা, এমন অপমানিত রূপ ট্র্যাজেডির হাহাকার ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অসহায় ব্যর্থতার জন্য বামন তো দায়ী নয়। অথচ সারাটা জীবন এর জন্য সে কুণ্ঠিত, লজ্জিত, অপরের উপেক্ষা ও করুণার পাত্র —

'কামভাবে নারী প্রিয় না হয় বামন।।
মহাবীর বামন সৃজিলা প্রজাপতি।
নারী সঙ্গে রতিরসহীন মূঢ়মতি।।'

বামনের জীবনের নপুংসকতা এক চূড়ান্ত অভিশাপ। অপ্রত্যাশিত এই অভিশাপের আঘাতে তার জীবন তছনছ হয়ে গেছে। কবি বামনের এই বাহ্য বিপর্যয়ের ছবি আঁকেন নি। কিন্তু তার অন্তরের ধ্বংসলীলা — সুন্দরী স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার অনীহা এবং ক্রমাগত পলায়নপর মানসিকতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। নারী সহবাসে অক্ষমতা যে পুরুষের জীবনে কত বড় পরাজয়, কত বড় বেদনাভোগ বামন চরিত্রের হাহাকারের মুখোমুখি না হলে আমরা এমন করে অনুধাবন করতে পারতাম না। বিবাহিত নারী হিসেবে স্বামী মিলনের যে স্বপ্ন নারী চোখে মায়াঞ্জন পরিয়ে রাখে, সেই স্বপ্ন যদি নিষ্ঠুর ভাবে ভেঙ্গে যায় তবে চাপা ক্রন্দন দোষাবহ নয়। কিন্তু সেই সীমাহীন পরাজয়ের মুখোমুখি পুরুষের আত্মযন্ত্রণার কোন তুলনা চলে না। পৃথিবীর সব রঙ এক নিমেষে তার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যায়, গ্লানির দহনে সমস্ত আকাশটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। চন্দ্রাণীর এবং অন্যান্য মানুষজনের কাছে অসঙ্গত ঠেকে তখন বামনের আচরণ —

'শার্দুল মহিষ মৃগ আনেন্ত মারিয়া।।
বন ভ্রম আইসে যদি দুর্জয় বামন।
প্রতিদিন রাজদ্বারে বাহিরে শয়ন।।'

মিলনে অক্ষম বামনের এতো ভিখারীর অবস্থা। সচেতন মানুষ হিসেবে বামনের অজানা নয় যে, দেহই প্রেমের আধার। সেই দেহ যদি অতৃপ্ত থাকে তবে সেই অপরিতৃপ্ত কাম রহস্যময় করে তোলে প্রেমের প্রাসাদকে। দেহগত মিলনেই দাম্পত্য জীবন ও প্রেমের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। তাই নিজের অক্ষমতা জেনেও চন্দ্রাণীর সখীদের কথায় সংশয় সন্দেহের মধ্যেই চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সম্মতি জানায়। কারণ সুকৌশলে সখীরা জগতের একটি সার সত্য বামনের সামনে উপস্থিত করেছে —

'যোবন কালেতে কন্যা বড় চিন্তা পায়।
অনঙ্গ-ভুজঙ্গ-বিষ সবর্বাঙ্গে বেড়ায়।।
সে বিষ নামাইতে নাহি ওঝার শকতি।
স্বামী সে চিকিৎসা-হেতু, ঔষধি সুরতি।।'

এক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই যে বামনের এই সম্মতি প্রদান, তা একেবারে স্পষ্ট। পরবর্তী ক্ষেত্রে স্ত্রী চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলন কালে বামনের শারীরিক অক্ষমতার অসহায় রূপ করুণ হয়ে ওঠে। চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হতে না চেয়ে বামন 'পশুপ্রায় নিদ্রা যায়' এবং পরদিন —

'নিদ্রা হন্তে উঠি বীরে লৈল ধনুশার।
পশুবধে সিংহ যেন যায় বনান্তর।।'

মন্তব্য

কবি চিত্রিত বামনের এই বীর পশু শিকার মূর্তির আসলে নারী সহবাসের অক্ষমতা জনিত ব্যর্থতা থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়ার উপায় মাত্র। আত্মধিক্কার এবং গ্লানির বোঝা নিয়ে এমন অবস্থায় কোন পুরুষেরই স্ত্রীর সামনে সহজ স্বাভাবিক হওয়ার উপায় নেই।

প্রেমের আলোকে শারীরিক অক্ষমতার এই অসহায় রূপ হয়তো বামনের পক্ষে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হোত। কিন্তু বামনের মধ্যে এই সূক্ষ্ম প্রেমবোধেরও ভীষণ অভাব। শারীরিক খর্বতাই তাকে বামন করেনি, মানসিক অসংস্কৃতিও তার এই নামকে অর্থবহ করে তুলেছে। সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং প্রেমের আলো বামনের মধ্যে না থাকায় চরিত্রটির মধ্যে একজাতীয় পশু-জনোচিত আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। স্ত্রী চন্দ্রাণীকে বামনের এই আচরণও ভীষণভাবে পীড়িত করে —

'পশু সঙ্গে মনুষ্যের কোন্ অভিলাষ।।
মূর্খ স্বামী সঙ্গে ক্রিয়া সহস্র জঞ্জাল।'

বামনের একমুখী চরিত্র বৈশিষ্ট্যে ভিন্নাত্মক মাত্রা — এই চরিত্রের সাহস ও বীরত্বে। স্ত্রী মিলনে সে অক্ষম, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে নিয়ে পলায়নকারী পুরুষের কাছে তার যাত্রা, ঐ পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া পরিপূর্ণভাবে বীরত্বেরই প্রকাশ। বামনের বক্তব্যে যেমন লোরের সঙ্গে যুদ্ধ ক্রিয়াতেও সেই এক বীরত্ব ও সাহস প্রকাশিত —

'তেজময় তীক্ষম বাণে বামন লোরকে হানে
মর্ম ভেদি প্রবেশে হৃদয়।।
বামনের তীক্ষমবাণে লোররাজ মর্মস্থানে
রক্তে হবে চারু কলেবর।'

বামন চরিত্র দৌলতকাজীর বিস্ময়করণ সৃষ্টি। নারী মিলনে অক্ষমতাজনিত বেদনা ও মনস্তাত্বিক দ্বন্দ্ব, তৎসহ বীরত্ব ও ঔদার্যের প্রকাশে বামন চরিত্রের বহুমাত্রিক রূপ প্রকাশিত।

অন্যান্য চরিত্র ঃ- দৌলতকাজীর 'সতীময়না' আখ্যানকাব্য। নানান চরিত্রের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক না হলেও প্রত্যাশিত। তাই মূল চারটি চরিত্র ছাড়াও অসংখ্য ছোট বড় চরিত্র এই কাব্যের বিন্যাস গতিতে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কবি প্রতিভার ছায়া সব চরিত্রের উপর প্রতিফলিত না হলেও, কয়েকটি চরিত্র আকর্ষণীয় এবং সার্থক হয়ে উঠেছে।

আখ্যানকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে মধ্যযুগীয় রোমান্স নির্ভর আখ্যানকাব্যের প্রেক্ষাপটে; রাজা লোরের সামনে উপস্থিত যোগীর চরিত্রটি সুন্দর এবং বিশেষ উদ্দেশ্যবাহী। যোগী চরিত্রের বর্ণনায় কবি দৌলতকাজী ক্ল্যাসিক গাম্ভীর্যের উপস্থাপনা ঘটিয়েছে —

'জটাধারী ব্যাঘ্র-চর্ম বিভূতি ভূষণ।
কণ্ঠে রুদ্রমালা মূর্তি যেন ত্রিনয়ন।।
জলন্ত প্রদীপ দীপ্তি দিব্য কলেবর।
যোগাসনে দহিছে সকল অভ্যন্তর।।'

যোগী সন্ন্যাসী চরিত্রগুলি রহস্যময় অলৌকিকতায়; একাধারে শ্রদ্ধাবোধ এবং অঘটন সংঘটনকারী চরিত্র হিসেবে প্রায়ই জনমানসে গৃহীত হয়। 'সতীময়না' কাব্যের যোগীর মধ্যে তন্ত্রমন্ত্র নির্ভর রহস্যময়তা দারুণভাবে জড়িয়ে আছে। এই জাতীয় রোমাঞ্চকর পরিবেশের মধ্যে এই যোগীর আবির্ভাব ঘটে। ক্ল্যাসিক গাম্ভীর্য সমৃদ্ধ এই যোগীর উদ্দেশ্যটি কিন্তু লঘুতরল। তবে রোমান্সধর্মী আখ্যানকাব্যে এইরকম নানা চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে। যোগী তার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলে গোহরা রাজ্যের রাজা মোহরার অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী চন্দ্রাণীর স্বামী বীর বামন, কিন্তু সে নিপুংসক, মিলন কামনা প্রতিহত হওয়ার দুঃখে-অভিমানে চন্দ্রাণী স্বামী বর্জিত সখী পরিবৃত অন্য এক স্থানে বাস করে। সুন্দরী রমনীর এমন অবস্থায় কামনালুব্ধ অনেক পুরুষের স্বাভাবিক আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু চন্দ্রাণী নিজেকে ভোগের রাজ্যে বিলিয়ে না দিয়ে সংযত জীবনই যাপন করে। আর 'বৎসরেত দুই বার যায় দেবস্থান।' এমন মুহূর্তেই একদিন যোগীর চন্দ্রাণী দর্শন। এই অবসরে যোগীর সমাধি এবং সমাধিদর্শন বর্ণিত। সুফী ধর্মের সহজিয়া সাধনই এই বিষয়ে প্রতিফলিত। বর্ণনাটি অপূর্ব সুন্দর —

'নয়ন মুদিয়া পাতাল ভেদিয়া
দৃষ্টি চন্দ্র মূলে করে।
স্থলে ডিম্ব রাখি জলে কুর্ম থাকি
কুর্মে ডিম্বে দৃষ্টি ধরে।।'

এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য যোগী চরিত্রের স্বভাবানুসারী হওয়ায় উদ্দেশ্যের সঙ্গে একটা ভারসাম্যে অন্বিত হয়েছে। তবে যোগী চরিত্রে যতই তন্ত্রমন্ত্র তন্ত্রাচার দর্শন কাজ করুক না কেন, যোগীর আসল চরিত্র

বৈশিষ্ট্য সংযোগ সাধনকারীর। এই বিশেষ ভূমিকায় চরিত্রটিকে মানিয়েছেও বেশ ভাল। চন্দ্রাণীর রূপের বর্ণনায় সে যে পুরোপুরি সফল, তার প্রমাণ — যোগীর এই অসাধারণ বর্ণনায় সূত্র ধরেই লোরের গোহারি দেশে যাত্রা। রাজা লোরের সামনে সে বলেছে —

'স্ত্রী মধ্যে চন্দ্ররাণী শচী কলাবতী।।
চন্দ্রাণীর তোমার মিলন মনোরম।
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম।।'

যোগীর মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও চরিত্রটি রোমান্স জগতের জন্য আমদানীকৃত প্রয়োজন সাধনকারী চরিত্র।

ধাত্রী বা ধাইদের সঙ্গে নবজাতক-জাতিকাদের একসময় প্রায় নাড়ীর সম্পর্ক ছিল। পেশাগত নাড়ী ছেদন থেকে শুরু করে মাতৃ ও বন্ধুভাবে শিশুদের লালন-পালনে ধাইদের ছিল এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা। 'সতীময়না' কাব্যে ধাই বুদ্ধি শিখা চরিত্রে দৌলতকাজী এছাড়াও বিশেষ কিছু গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন —

'বুদ্ধি শিখা নামে ধাই মধুর ভাষিণী।
লোকপ্রিয়া সুতা জন চতুর সন্ধানী।।
নির্জনে কুমারী সঙ্গে করি এক কেলি।
সময় গোয়ান্ত নানা কাব্য রস খেলি।।'

মধুর বাক্যের সঙ্গে বুদ্ধির চাতুর্য্য, বন্ধুকৃত্যের সঙ্গে কাব্যরসাদির প্রতি অনুরাগ ধাই বুদ্ধি শিখা চরিত্রটিকে শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নয়, এক পূর্ণাঙ্গ চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। এইসব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মাতৃসম স্নেহ এবং বন্ধুর মত ব্যবহারে চন্দ্রাণীর মনোদুঃখ জানার কারণে সে বলতে পারে —

'শিশু হন্তে তোকে মুই করিলুঁ পালনা।
মোকে কেনে গুপ্ত মর্ম অন্তরে বেদনা।।
প্রথমে জার্মিলা যবে এই মহীতলে।
নাভি ছেদ তোমার করিলুঁ কুতুহলে।।'

চন্দ্রাণীর কাছে শুধু ভালোবাসার দাবি জানায়নি বুদ্ধি শিখা, আরো এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার বক্তব্যে প্রকাশিত —

'সত্য কহ কাহাকে মজিল মন তোর।
যদি হয় সিদ্ধা, বিদ্যাধর, সুরাসুর।।
মহামন্ত্র আহুতিমু আকর্ষণ বলে।'

অলৌকিক মন্ত্রশক্তির কথাই বলেছে ধাই বুদ্ধি শিখা। ধাই, বিন, ধোপানি, নাপিতানী প্রভৃতি শ্রেণীর নারী চরিত্রগুলির মধ্যে মধ্যযুগে বহুল পরিমাণে এই সব অতিপ্রাকৃত পরাবিদ্যার চর্চা চালু ছিল। বুদ্ধি শিখার চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত। রোমান্টিক রহস্যময়তার উপাদান বলা যেতে পারে এই মন্ত্রশক্তিকে। তবে মন্ত্রশক্তির অলৌকিকতায় নয়, বুদ্ধির চাতুর্য্যেই শেষপর্যন্ত বুদ্ধিশিখা রাজা লোরের সঙ্গে চন্দ্রাণীর মিলন সংঘটিত করেছে। উদ্দেশ্যের সঙ্গে আচরণের সঙ্গতি সাধনের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিশিখা চরিত্রটি যথার্থই উজ্জ্বল।

'সতীময়না' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে রাণী ময়নার দুঃখবোধের মধ্যে ইতর চরিত্রের রতনা মালিনীর প্রবেশ। জাগতিক চাহিদায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত, এক তিল সুখের জন্য লালায়িত এই রমনীরা আদ্যন্তে স্থূল রুচির। প্রেমের কিংবা কাজের মধ্যস্থতার কারণেই প্রাচীনকালে দূতি, কুট্টিনী অথবা মালিনীদের আবির্ভাব ঘটত। দৌলতকাজী মালিনীর এমন চরিত্রকে একেবারে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কন করেছেন —

'মালিনীর লাস ভেশ কি কহিমু সবিশেষ
কুলটা বিখ্যাত প্রবঞ্চক।
মধুরস স্থূল তুণ্ড হৃদয় গরল কুণ্ড
কপট মন্ত্রণা দমনক।"

কামনাকাতর এক অসভ্য চরিত্র ছাতনকুমারের দৌত্যের ভূমিকায় যে তার আবির্ভাব, ময়নার বিরহ দশার মধ্যেও তা সে জানাতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। মালিনী ইতর, রুচিতায় স্থূল একথা যথার্থ, কিন্তু দেহবাদী এক বিশেষ দর্শন এই রমণীকে প্রাজ্ঞ দৃষ্টি দান করেছে —

'ধন নষ্ট হৈলে পুনি উপার্জনে পায়।
অগ্নি শেষ হৈলে পুনি পাথরে জন্মায়।।
চন্দ্র সূর্য অস্তংগতে পুনি উগি যায়।
যৌবন চলিয়া গেলে পলটি না পায়।।
কৃপণের ধন যেন মুখের যৌবন।
কালের না খাইলে হয় শোকের ভাজন।।'

ছলাকলা এদের সহজাত, দেহবাদী দর্শনে এদের পুরোপুরি বিশ্বাস। মালিনী সম্পর্কে কবির উক্তি তাই —

'বেশ্যা-গুরু কূটনী প্রধান।'

সমগ্র বারমাস্যা জুড়ে সতী ময়নাকে কামনার পাঁকে টেনে নামানোর যে আপ্রাণ চেষ্টা মালিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে তাতে একের পর এক সুকৌশলী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার অগ্রগতি ঘটেছে। প্রথমে সে ময়নার দুঃখে সহানুভূতি জানিয়েছে, অনুকূল প্রকৃতিতে শরীরের উত্তেজনাকে প্রশমিত না করে তাকে পথ ছেড়ে দেওয়া উচিত —এমন ইঙ্গিত ময়নার মধ্যে মোহ বিস্তারের চেষ্টা করেছে। আর এসব করতে গিয়ে ময়নার বক্তব্যে উঠে এসেছে, একমুখী কিন্তু অসাধারণ সমাজ জীবন দর্শন। সেগুলি প্রত্যেকটি যেন এক একটি মূল্যবান রত্ন —

'মোক্ষপদ কাম বর্গ ভূবন নিদান।
কামরসে মজিয়াছে পুরুষ প্রধান।।
ধর্মশাস্ত্র বহির্ভূত নহে কাম কেলি।
রাধা সনে নিকুঞ্জ খেলায় বনমালী।।'

এই দর্শন ছাড়াও প্রকৃতির অপূর্ব বর্ণনা, নারী মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর চেতনা মালিনী চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

রাজা লোরের সারথী মিত্রকণ্ঠের নামেই প্রমাণ, সে শুধু রাজার সারথী নয়, তার বন্ধুও বটে। চন্দ্রাণীর উদ্দেশ্যে রোমান্টিক যাত্রায়ও সে সঙ্গী, আবার চন্দ্রাণীর সঙ্গে গোপন লিনরে সময়েও তার ভূমিকা বন্ধুর সাহায্যকারীর —

'মিত্রকণ্ঠ-বচন শুনিয়া নৃপবর।
ক্ষেপিল বরশি পুনি ছানির উপর।।
ছানি ভেদ রহে বর্শি বলের প্রহারে।
সখীগণ বলে বর্শি খসাইতে নারে।।'

রাজদ্বারে, শ্মশানে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে বন্ধুর যে ভূমিকা সেই একই অনুপ্রেরণায় মিত্রকণ্ঠ সারথী বামনের সঙ্গে রাজা লোরে যুদ্ধে সারথীর অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার সর্পদংশনে মৃতা চন্দ্রাণীর জন্য জীবনদায়ী বানৌষধি সংগ্রহে অসমর্থ হয়ে মনে মনে যে সংকল্প করেছে সমব্যথী উদার হৃদয়, বন্ধু না হলে তা কখনই সম্ভব হয় না —

'মিত্রকণ্ঠ সারথিহ ভাবে মনে মনে।
অবশ্য মরিব লোর কুমারী কারণে।।
লোররাজ বিনু আমি ত্যজিব জীবন।
দৈববলে এক বিষে তিনের নিধন।।'

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে চন্দ্রাণীর পিতা সাধারণ পিতার মতই সন্তানের সুখে দুঃখে অনুভূতিপ্রবণ সমব্যথী। দৈবপুরুষ সম্পূর্ণ অর্থেই অলৌকিক জগতের অধিবাসী। মুনিবর নারদ ও অঙ্গিরা চরিত্র একটু স্বতন্ত্র। মুনি হয়েও সুন্দরের মোহ যেভাবে তাঁদের পীড়িত করেছে, তাতে কামনা জর্জর বাস্তব মানুষ বলেই মনে হয়েছে। রাজকন্যা সম্পর্কে অঙ্গিরার ভাবনায় সেই দৃষ্টির ছায়াপাত —

'রূপ দেখি কল্পয় অঙ্গিরা বনবাসী।
পত্ররস চর্বে যেন দরিদ্র উপাসী।।'

ছাতনকুমার ইতর কামুক প্রকৃতির চরিত্রের যোগ্য প্রতিনিধি। রাজপুত্র স্বর্ণষ্ঠীব একেবারেই অলৌকিকতা মাখা রোমান্স জগতের অধিবাসী। গা দিয়ে সোনা ঝরে পড়া —বাস্তব জগত থেকে তাকে বহুদূরে নিয়ে গেছে। আলাওল রূপকথার আমেজে মাখা সে উপকাহিনী বর্ণনা করেছেন, তার অন্তর্বর্তী চরিত্রগুলির মধ্যে সেই ভাবনারই ছায়াপাত। রাজা উপেন্দ্রদেব এবং রাণী রতনকলিকা ভাগ্য কেন্দ্রিক বিশেষ ভাবনার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা চরিত্র। রতকলিকার আচরণে এবং চরিত্র বৈশিষ্ট্যে

রোমান্টিক রহস্যময়তার পুরোপুরি ছায়াপাত। আনন্দধর্মের চরিত্রেও রক্ত-মাংসের বাস্তবতা নেই বললেই চলে, আচার-আচরণও রূপকথার রাজপুত্রের মত। মদনমঞ্জরীর চরিত্রের বিবর্তনেও রূপকথারই প্রভাব। তবে চকিত মুহূর্তে তার মধ্যে বাস্তবতার ইঙ্গিত জেগে উঠেছে। সদাগর কামুক এবং ভিলেন প্রকৃতির চরিত্র। রাক্ষস রাক্ষসের মতন। ব্রাহ্মণ, রাজপুত্র, প্রচণ্ডতপন, চন্দ্রপ্রভা প্রমুখ চরিত্রেরও তেমন কোন ভূমিকা এবং চরিত্রবৈশিষ্ট্য নেই। মন্তব্য

১১.১১ ঃ লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়নার কাব্যমূল্য

চন্দ্রাণীর বঞ্চিত যৌবনের হাহাকার এবং লোরের প্রতি আসক্তি দৌলত মনস্তাত্ত্বিক কুশলতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। গবাক্ষ পথে চন্দ্রাণীর উদ্দেশ্যে লোরের গোপন অভিসার বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রভাবজাত। সে প্রভাব স্বীকার করেছেন দৌলত। নিভৃত শয়নমন্দিরে লোরচন্দ্রাণীর সুরত বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন —

'বিদ্যার সকাশে যেন বসিল সুন্দর।'

রতি-বর্ণনার ক্ষেত্রে জয়দেব, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্রের কুশলী শৃঙ্গার রস বর্ণনার অনুসরণ আছে।

মধ্যযুগীয় দরবারি রোমান্স কাহিনি রচয়িতা দৌলত রতিবর্ণনার পাশাপাশি যুদ্ধবর্ণনার ক্ষেত্রেও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। পত্নীকে নিয়ে লোর পালিয়ে যাচ্ছেন জেনে সৈন্যদের নিযে বামন যেভাবে লোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন এবং পরে যেভাবে দ্বৈরথ যুদ্ধে বামন ও লোর লিপ্ত হয়েছেন — তা মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণনাকে মনে করিয়ে দেয়। লোরের সারথি যে ভূমিকা পালন করেছে তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পার্থসারথি কৃষ্ণের ভূমিকা।

দৌলতকাজীর কাব্যের প্রথমাংশে ময়নার রূপবর্ণনা ও বিরহ বর্ণনার মধ্যে আমরা গতানুগতিক, প্রথাগত এবং সংস্কৃত সাহিত্যের আলংকারিক বর্ণনার আনুগত্য পাই। কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ময়নার সর্বংসহ সতীত্বের পরিচয়। কবির মনের মধ্যে সীতার আদর্শ সঞ্জীবিত ছিল। অন্যদিকে চন্দ্রাণীকে কবি প্রণয়চঞ্চলা, কামাতুরা, রক্তমাংসের জীবন্ত নারী হিসাবে এঁকেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'র রাধার সঙ্গেও আংশিক মিল আছে চন্দ্রাণীর। দুই খণ্ডের কাহিনিতে নারীর দুটি বিপরীত জীবনাদর্শ চিত্রিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে আছে পরকীয়া প্রেমের সমর্থন ও ভোগের বিচিত্র আয়োজন। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে প্রতীক্ষা ও ত্যাগের বিবরণ এবং পরকীয়া প্রেমকে অস্বীকার করে জন্ম-জন্মান্তরের একনিষ্ঠার জয়গান। জীবনমুখী ও আদর্শমুখী — দুই জীবনাদর্শেও কথাই ক্ষেত্রবিশেষে স্বীকৃত হয়েছে। জীবনরসিক কবি ভোগাদর্শের প্রতীক চন্দ্রাণীকে ও তিতিক্ষার আদর্শ ময়নাকে মিলিয়েছেন। মেলাবার ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন আর আলাওল তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

প্রবাদের ব্যবহার এই কাব্যের বিশিষ্টতার পরিচয় দেয়। যেমন — 'মিত্রবশ করিবার প্রীতি বড় সন্ধি'; 'তস্করেতে ধর্মকথা' ইত্যাদি।

১১.১২ ঃ দরবারী সাহিত্য হিসাবে 'লোরচন্দ্রাণী'র গুরুত্ব

'সতীময়না' কাব্যটি দৌলতকাজীর মৌলিক সৃষ্টি নয়। মিয়া সাধনের ঠেট্ গোহরী ভাষায় রচিত লোককথা নির্ভর কাব্য 'মৈনাসৎ' অবলম্বনে কবি 'সতীময়না' কাব্যটির পরিকল্পনা করেন। তাছাড়া এই কাব্যপরিকল্পনায় কবির নিজের প্রেরণা নয়, আরকান রাজ শ্রীসুধর্মার সমর সচিব মহামতি অমাত্যের নির্দেশই কাব্যটির উৎসস্থল। স্বভাবতই একটি বিশেষ প্রভাব কাব্যটির উপর সূত্রপাতেই প্রভাববিস্তারকারী। রাজসভার প্রভাবই হল সেই বিশেষ প্রভাব। অর্থাৎ রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায়, আদেশে, সর্বোপরি বিশেষ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিপুষ্ট সভাসদদের কথা স্মরণে রেখে যে প্রভাবানুসারী, সাহিত্য গড়ে ওঠে, সাহিত্য বিচারে তাকেই দরবারী সাহিত্য বলে। এই শ্রেণীর সাহিত্যের পাঠক একশ্রেণীর পাঠক। তাসত্ত্বেও যে রাজার কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তাঁদের শিল্পরুচি, রসবোধ, পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ কবিদের সামনে সাহিত্য চর্চার দুয়ার খুলে দিত। রাজাদের এই ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসার।

পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা নিয়ে এককালে রাজারাজড়ারা যদি এগিয়ে না আসতেন, তাহলে নানা কারণে অনেক প্রতিভাধর কবির অনেক অসাধারণ সৃষ্টি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের দিকে তাকালেই দেখা যাবে একটা বৃহৎ অংশের সাহিত্য দরবারী সাহিত্য। রাজদরবারের

মন্তব্য

সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এই কবিদের কাব্য থাঁদের স্রষ্টাদের অস্তিত্বকে কিন্তু কলঙ্কিত না করে, প্রকৃত সাহিত্য স্রষ্টার ভূমিকাকেই প্রকাশিত করেছে। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা, জয়দেব, ধোয়ী পবনদূত সমৃদ্ধ সেন রাজসভা, পাল রাজসভার কবি অভিনন্দ, সন্ধ্যাকর নন্দী যেমন স্বয়ং কবি পরিচয়ে বিখ্যাত; একইভাবে মিথিলা রাজদরবারের কবি বিদ্যাপতি, নদীয়া-কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কবি প্রতিবাকে অস্বীকারের উপায় নেই। তবে রুচিশীল সূক্ষম ও মার্জিত রসের যে অমর কাব্যধারা, পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে এক অলৌকিক শান্তির প্রবাহ বয়ে নিয়ে আসে — দরবারী সাহিত্যের প্রভাবধর্মী সচেতন শিল্পকলা সেই ধারা থেকে অনেক দূরের বিষয়। পাণ্ডিত্যের ঔজ্জ্বল্য, শব্দের চাকচিক্য, রুচির বিকৃতি, আদিরসের অবাধ অনাবৃত প্রকাশ — রাজদরবারের পাণ্ডিত্য ও শৃঙ্গার রসের চরিত্র বৈশিষ্ট্যকেই উজ্জ্বল করে তোলে। এই ধর্মের সঙ্গে স্বাভাবকিভাবে যুক্ত হয় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের তিক্তরূপ, হাসির তরঙ্গ, কবিধর্মের আনুগত্য প্রকাশক মানসিকতা। অজস্র ঝাড়বাতির আলোক জ্বলে ওঠে দরবারী সাহিত্যে।

দৌলতকাজী ও আলাওল এই ধারার প্রতিনিধিস্থানীয় সার্থক কবি। 'সতীময়না' কাব্যে দরবারী ঢঙে রাজপ্রশস্তি ও ভণিতা রচনা করে দৌলতকাজী ও আলাওল, দরবারী সাহিত্যের ধারাকেই পুষ্ট করেছেন। কাম এবং আদিরসের অবাধ উল্লাস এই শ্রেণীর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রেমচেতনার আধারে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় কবিরা আসলে দেহকেন্দ্রিক কামকলার নগ্নরূপ উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন। দৌলতকাজী চন্দ্রাণীর রূপ বর্ণনায় যৌনতাই ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। শুধু চন্দ্রাণী কেন ময়নার সৌন্দর্য চিত্রণেও এই আদিরসের সীমাহীন প্রাবল্য। পৃষ্ঠপোষক রাজারা পণ্ডিত ও শিল্পরসিক ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁরাও কবিদের আদিরসের বর্ণনাকে সমর্থন করতেন। তার ওপরে ছিল সভাসদদের প্রবল প্রভাব। প্রেমধর্মী বিষয়কেও কবিরা কামনার ফেনিল উচ্ছ্বাসে একেবারে বর্ণময় করে তুলতেন। 'সতীময়না' কাব্যে দৌলতকাজীর বৈদগ্ধ্য ও মার্জিত রুচির প্রকাশ পাওয়া গেলেও সমগ্র কাব্যটি দরবারী সাহিত্যের উপাদানে ঠাসা। তাই লোর-চন্দ্রাণীর মিলনেও দেহবর্ণনার একেবারে অনাবৃত রূপ —

'প্রথমে মদন কোল ঘন আলিহগন।
কাম-যুদ্ধে ভয় লজ্জা ধর্ম পলায়ন।।
দন্তে দন্তে ঘরষণ বদনে বদন
পুলকে পুরয় তনু সঘন চুম্বন।।
পয়োধর গ্রীবা ধরি ঘন বাহু তাড়ি।
রতি যুদ্ধে যেন দুই মত্তে গড়াগড়ি।।'

অশ্লীলতার প্রবল ঘূর্ণাবর্তে শ্লীলতার সীমা সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে। স্রষ্টারা নিজের আনন্দেই সৃষ্টি করেন। কিন্তু যেখানে একটা স্থূল বিকৃতি রুচির আরোপ কবির সৃষ্টিধর্মে প্রভাব বিস্তার করে, তখন বাধ্য হয়ে কবিও শিল্প সংযমের সীমারেখা অতিক্রম করে যান। কবির পক্ষে পুরুষের এই সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতাকে উপেক্ষা করার কোন উপায় ছিল না। কারণ নারী অধিকাংশটাই ছিল তখন ভোগের সামগ্রী। রাজদরবার আদিরসের বর্ণনা চাইত কবিদের কাছে। দৌলতকাজী ও আলাওল সেই ধারাকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন 'সতীময়না' কাব্যে।

দরবারী সাহিত্য মানেই আদিরস আর দেহ কামনার ফেনিল উচ্ছ্বাস নয়। শিক্ষা, বৈদগ্ধ্য কামনার অনাবৃত রূপকে কখনো সংযমে, কখনো স্বাভাবানুসারে প্রবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ভিত্তি রূপে কাজ করে। 'সতীময়না' াকব্যে দৌলতকাজীর পাণ্ডিত্য পুরোপুরি প্রতিফলিত। এই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবি অনায়াস দক্ষতায় কাব্যবোধের সংযুক্তিকরণ ঘটিয়েছিলেন। আরবী, ফারসী, আরাকানী, সংস্কৃত, চট্টগামী প্রভৃতি শব্দকে অকাতরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন — রাজসভার বিচিত্র সভাসদদের মত। শব্দই যে কবির ভাবকে ধারণ করে এই বিষয়টি কবি জানতেন বলেই 'ময়নার ভারতী'কে 'রসের পাঁচালী' করতে এতটুকু কার্পণ্য করেন নি।

আলোচকেরা বলেন, রাজসভা বুদ্ধিমানের মিলন কেন্দ্র, হৃদয়হীনদের ক্রীড়াকেন্দ্র। এখানে হৃদয়ের কারবার অপেক্ষা বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের চাকচিক্যটাই প্রধান। তাই দৌলতকাজী যে বাক্যবন্ধগুলি গড়ে তুললেন তা উজ্জ্বল অলংকারের নিদর্শন রূপে রাজসভার পাণ্ডিত্য ও উজ্জ্বলতাকেই ধারণ করল। উপমা, উৎপেক্ষা, অনুপ্রাসের প্রসাদ নির্মাণ করে কবি আলো জ্বেলে দিলেন রাজসভাগৃহে। উপমা অলংকারের প্রয়োগে কবির দক্ষতা প্রশংসনীয় —

'বিদ্যার সম্পাশে যেন বসিল সুন্দর।
দূরে গেল বদনের লজ্জার অম্বর।।'

সুরাত্মক, ধীর গতির পয়ার ত্রিপদী ছন্দেও কবি যে দোলা সৃষ্টি করেছেন, শিল্পকুশলতা

সেখানেও প্রতিফলিত হয়েছে এবং দরবারের ধর্মকেই তা উদ্‌ঘাটিত করেছে।

দরবারী সাহিত্যে কৃত্রিম শিল্পকলার একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় বলেই ভাষা ও শব্দের সৌধ নির্মাণ চোধ ধাঁধিয়ে যায়। 'সতীময়না'র যে অংশটুকু আলাওল রচনা করেছেন, সেখানেও দরবারী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ঝলমল করে উঠেছে। 'শবদে শবদে বিয়া' দেওয়ার একটি উদ্দেশ্যমুখী প্রয়াস পাণ্ডিত্য বুদ্ধির চমৎকারিত্বকেই প্রকাশ করে। কামকলার সাধনা সরস্বতীর আরাধনায় মুখ্য স্থান অধিকার করে। দৌলতকাজী ও আলাওল উভয় কবি মিলে 'সতীময়না' কাব্যে দরবারী সাহিত্যের প্রাণলক্ষণকে সার্থকভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১১.১৩ ঃ লোরচন্দ্রাণীতে অন্যান্য সাহিত্যের প্রভাব

লোক উৎস ও লোক প্রভাব ঃ- দৌলতকাজীর 'সতীময়না' কাব্য আরাকান রাজসভার প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত। কাব্যটি কবির সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি নয়। যে কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব 'সতীময়না' পরিকল্পিত, হিন্দী কবি সাধনের সেই কাব্যটির নাম 'মৈনাসৎ'। বিহার অঞ্চলে প্রচলিত লোকগাথার উপর ভিত্তি করে সাধন তাঁর কাব্যটি গড়ে তোলেন। নিজ কাব্যের শুরুতে দৌলতকাজী এ প্রসঙ্গে নিজেই জানিয়েছেন —

'ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে।।'

গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় রচিত এই কাহিনি শ্রী আশরাফ খানের নির্দেশে সহজবোধ্য বাংলায় রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কবি দৌলতকাজী —

'দেশীভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে।।
তবে কাজি দৌলৎ বুঝিয়া সে আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী।'

সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্যটি ক্ষুদ্রাকৃতি এবং এর বিষয় প্রচলিত লোক প্রেম গাথা। লোর-চন্দ্রাণীর প্রেম আখ্যান বিহার এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কিংবদন্তীর মতো নানাভাবে একটুখানি পরিবর্তিত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কবি সাধন প্রচলিত এইরকম কোন কাহিনিকে স্বল্প পরিসরে কিন্তু কাব্যের আকৃতিতে পরিবেশন করেন। নিজের বক্তব্যে দৌলতকাজী সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এবং তার কাব্য রচনার কথা জানালেও আধুনিক গবেষকরা এতেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন 'সতী ময়না' ও লোর চন্দ্রাণী-র উপাখ্যান লৌক ঐতিহ্যের প্রসারিত ক্ষেত্রে বর্তমান। পণ্ডিত গবেষকদের শ্রমলব্ধ গবেষণায় লোর-চন্দ্রাণীর লোক প্রেম গাথার নানামুখী উৎস বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সাহিত্যের ইতিহাসকার ডঃ সুকুমার সেনের মনে হয়েছে, ''মিয়াঁ সাধনের রচনার বাহিরেও লোর-চন্দ্রার কাহিনি সেকালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অজ্ঞাত ছিল না।" অজ্ঞাত তো ছিলই না বরং বিচিত্র মাধ্যমে বহুল জনপ্রিয়তায় এই লোক কাহিনিটি জনসাধারণের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। গবেষকদের আবিষ্কৃত তথ্য অনুসারে বলা যেতে পারে আকর হিসেবে লোর-চন্দ্রাণীর প্রেম উপাখ্যান মাধ্যম ভিন্ন হলেও স্বীকৃত। এইরকম জনপ্রিয় একটি লোককথাই কবি শিল্পীদের উৎসাহিত করেছে নানা শিল্পমাধ্যমে একে রূপায়িত করতে। শুরুতেই যে উৎসটি নজরে আসে তা লোকনৃত্য। চতুর্দশ শতাব্দীর বিহারে মৈথিল ভাষায় রচিত জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণনরত্নাকরে' — 'লোরিকনাচ'-এর উল্লেখ মেলে। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'গ্রীয়র্সন সাহেব শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় দক্ষিণ বিহারের গোয়লাদের (আহীর) সমাজে প্রচলিত লোরিক মল্লের গান সংগ্রহ করেন। .... লাহোর মিউজিয়ামে 'লোরচন্দ্রাণী'র কাহিনি বিষয়ক যে চিত্রগুলি আছে, তাহা লোরচন্দ্রাণীর কাহিনিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ তৃতীয় ঃ প্রথম পর্ব)।

'লোর-চন্দ্রাণী'র প্রেম কাহিনি নির্ভর যে লোকধর্মী গ্রন্থটির প্রভাব দৌলতকাজীর নিজের বক্তব্যে স্বীকৃত, গ্রাম্য হিন্দি ভাষায় রচিত অতি ক্ষুদ্রাকৃতি সেই কাব্যটি মিয়া সাধনের 'মৈনাসৎ'। মিয়া সাধনের এই গ্রন্থটির সঙ্গে পাঠক সাধারণের পরিচয় Tessitori রচিত ''A Descriptive Catalogue of Bardic and Historical Manuscripts" গ্রন্থ থেকে, কয়েক বছর আগে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হিন্দি বিদ্যাপীঠ-গ্রন্থ-বীথিকায়' মৈনাসৎ' কাব্যটি মুদ্রিত হয়েছে। এই মুদ্রিত কাব্যে বারমাস্যা সহ ছাতনের দূতী মালিনীর ময়নাকে ছলনা করার অংশটুকুই শুধু মেলে। তবে এই কাব্যেরও দুটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। উদয়শঙ্কর শাস্ত্রীয় কাছে আছে 'মৈনাসৎ'-এর একটি পাণ্ডুলিপি যা হিন্দি

মন্তব্য

কাইথি অক্ষরে রচিত। অপর পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন অধ্যাপক হাসান আসকরী। ফরাসী হরফে লেখা এই পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কৃত হয়েছে পাটনার মানের শরীফের দরগাহ থেকে। এইসব থেকে একটি কথাই প্রমাণ হয়, 'সতীময়না' লোককাহিনি নির্ভর কাব্য। সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্যটির প্রভাব দৌলতকাজী কাব্যমধ্যে স্বীকার করলেও নানানভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে লোর-চন্দ্রাণীর লোকপ্রেম গাথাও 'সতীময়না' কাব্য গঠনে সাহায্য করে থাকবে। লোককাহিনি বলেই জনশ্রুতিতে এইসব কাহিনি দৌলতকাজী শুনে থাকলেও থাকতে পারেন।

কাব্যরচনার ক্ষেত্রে দৌলতকাজীর উপর রাজদরবারের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতায় প্রেম, নারী পুরুষের সম্পর্ক বিচার্য হত বলেই আদিরসের অবাধ উচ্ছ্বাস দোষণীয় বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হত না। কিন্তু প্রতিভাধর সচেতন কবি শুধু দরবারের নন, তিনি জনসাধারণেরও। লোর-চন্দ্রাণীর লোকপ্রচলিত কাহিনি হাতে নিয়ে রোমান্টিক প্রেমের দুর্বার গতি বর্ণনা করে বস্তুত উভয় ভাবনার সমন্বয় কবি সাধন করলেন। লোর চন্দ্রাণীর লোকপ্রচলিত সে কাহিনি কবি গ্রহণ করলেন, রোমাঞ্চ রসে তা পরিপূর্ণ। ইউরোপে রোমান্স জাতীয় রচনায় থাকে মূলত সববাধাজয়ী প্রেমের ছবি তাছাড়া বীরত্বধর্ম, প্রচণ্ড আবেগ, সংঘর্ষ ও সংগ্রাম, বিপদসম্ভাবনা ও বিপদমুক্তি-র কথাও রোমান্টিক উপাদান হিসেবে পরিগণিত। এইসব কিছুই রোমাঞ্চ ও রহস্যময়তা গড়ে তুলে মানুষের কল্পনা ও ভাবনাকে প্রসারিত করে দেয়। ঠিক এইখানে রোমান্টিকতার জগৎ রূপকথার বর্ণময় অচেনাজগতের ছায়াবিস্তার ঘটে।

'সতীময়না' কাব্যে দৌলতকাজী দু'ধরণের প্রেমচিত্র উপহার দিয়েছেন। রাজা লোরের পত্নী সতীত্ব ধর্মে অবিচল থেকে গৃহাভিমুখী প্রেমকেই উজ্জ্বল করে তুলেছে। রোমাঞ্চ ধর্মের সূক্ষ্মতম স্তর এই প্রেমেও বর্তমান। কিন্তু সৌন্দর্য প্রতিমা চন্দ্রাণীকে ঘিরে প্রেমের যে রোমান্টিক জগত গড়ে ওঠে, মানুষের মধ্যে এই প্রেমের জন্য চির ব্যাকুলতা। আমাদের মানস প্রতিমা চির অধরা — আমাদের দৈনন্দিন চিরপ্রচলিত জগতের বহুদূর তীরে অবস্থান করে। উধাও মনের পাখায় ভর করে মানুষ প্রতিনিয়ত এই চিরঅপ্রাপনীয়ার জন্য ঘর ছেড়ে পথে বের হয়। যাবতীয় বাধা-বিপত্তি তার কাছে তখন তুচ্ছ মনে হয় 'সতীময়না' কাব্যে অধরা মানস প্রতিমা মূর্তি পরিগ্রহ করেছে চন্দ্রাণীর মধ্যে। এই strong sense of Beauty-র অপ্রতিরোধ্য তাড়নাতেই ভালোমানুষ সতী নারী ময়নাকে ত্যাগ করে রাজা লোরের এমন করে পরিচিত পথ ছেড়ে অপরিচয়ের জগতে ঝাঁপিয়ে পড়া। অসাধারণ শিল্পকুশল কবি ঠিক এই ধারণার অনুকূলে তাঁর কাব্যপরিকল্পনা করেছেন। যেখানে লোককথার ঢঙের পরিপূর্ণ উপস্থাপনা ঘটেছে —

'পশ্চিমেত এক রাজ্য আছয় গোহারি।
তাহাতে মোহরা নামে রাজা অধিকারী।।'

এই জাতীয় বর্ণনা লোরকথার বর্ণনাকেই মনে করায়। ''অনেক প্রাচীনকালে এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তার ছিল তিন রাণী'' — ইত্যাদি। সংস্কৃত সাহিত্যেও গল্পের শুরু হোত এইভাবে 'অস্তি গোদাবরী তীরে' অথবা 'বিদিশা নগরে' — এই ভঙ্গীতে। ইংরাজী সাহিত্যেও তাই — 'Once upon a time there was a king' ইত্যাদি। এই রীতিই ''লৌকিক রীতি'' ('সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী সম্পাদনা, ডঃ মযহারুল ইসলাম, ডঃ দুলাল চৌধুরী)। শুধু কি তাই, অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রতীক চন্দ্রাণীর অন্বেষণে লোরের রোমান্টিক প্রেম যাত্রায় রূপকথার রাজপুত্রকেও খুঁজে পাওয়া যায়। চন্দ্রাণীকে কেন্দ্র করে লোরের অন্যান্য দুঃসাহসিক কর্মেও রোমাঞ্চকর রূপকথার জগত প্রতিবিম্বিত হয়। দড়ি বেয়ে চন্দ্রাণীর কক্ষে গোপন মিলন প্রত্যাশী লোরের অভিযান 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' পেরিয়ে আকাঙ্খিত রূপসী রাজকন্যার সঙ্গে রূপকথার রাজপুত্রের মিলনের চিত্রই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে —

'তবে রাজা দড়ি অবলম্বন করিয়া
উঠিলেন দড়ি কাষ্ঠে পদভর দিয়া।
হাতে খড়্গ শোভে নেত ধরা পরিধান।
বীর মূর্তি অকাতর মাতঙ্গ সমান।।'

গোপন মিলনেই এই দুঃসাহসিক অভিযানের শেষ নয়। অনেক বাধা বিপত্তি, অনেক ভয়ানক পরিস্থিতিকে সবলে দলিত করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে হবে। বামনের মত দুর্জয় রাক্ষসের হাত থেকে চন্দ্রাণীকে উদ্ধার করতে চেয়ে লোরের যে রোমাঞ্চকর পলায়ন যাত্রা, তাতে রূপকথার রাজপুত্রের প্রসঙ্গ দানা বেঁধে উঠেছে। এই যাত্রাকে পলায়ন যাত্রা না বলে হরণ যাত্রা বলাই ভালো —

'বহুমূল্য দ্রব্য রত্ন লই বহুতর
কুমার কুমারী দোহ যায় দেশান্তর।।
এক রথে আরোহিলা লোরক চন্দ্রাণী।

রজনীতে চলে যান চন্দ্রামা রোহিনী।।'

রোমান্টিক প্রেমকে কেন্দ্র করে রূপকথাধর্মী আবহ তৈরীর মধ্য দিয়ে লোকভাবনার যে উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন দৌলতকাজী, কাব্যের মূল সূরের সঙ্গে প্রেক্ষাপটের মত গড়ে উঠে তা অচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত হয়ে গেছে। কেননা 'সতীময়না' কাব্য রূপকথাধর্মী রোমান্টিক প্রেম আখ্যান। রূপকথার অনিবার্য উপস্থিতি এই ধরণের কাব্যে স্বাভাবিক। কিন্তু লোকভাবনার জগত এত সংক্ষিপ্ত নয়। সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রমকারী অনেক বিষয়, যেখানে অতিপ্রাকৃতের রহস্যময়তা, বিশ্বাস সংস্কারের বিচারহীনতা — স্বভাবজাত সংস্কারের মত স্থায়ী রূপ পায়, 'folk motif' রূপে সেইগুলিই কাহিনিকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিশেষ দিনে বিশেষ কাজের বিশ্বাস, অলৌকিকতায় বিশ্বাস, গূঢ়াচারী তন্ত্রমন্ত্র, ঝাঁড়ফুক, মন্ত্রপড়া, জাদু বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস, ধাঁধা-হেয়ালির সাঙ্কেতিকতা এবং প্রবাদ-প্রবচনে বিশ্বাস — লোকজগতে বিশেষ বিশেষ motif রূপে স্বীকৃত। কাহিনির উপকরণ হিসেবে এই জাতীয় Folk motif 'সতীময়না' কাব্যের অপূর্ব কাব্যদেহ গড়ে তুলেছে।

তন্ত্রমন্ত্র লোকচর্চার একটি অন্যতম উপাদান, যা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই রাজ্যে গৃহীত। মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ magic power-এর সাহায্যে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। চন্দ্রাণীর দুঃখে সমব্যথী ধাইয়ের বক্তব্যে এই অলৌকিক মন্ত্রশক্তির উপস্থাপনা ঘটে —

'মহামন্ত্র আহুতিমু আকর্ষণ বলে।
সুরাসুর গন্ধর্ব আনিমু ক্ষিতি তলে।।
গন্ধর্ব কি পিশাচ কিন্নর জৈক্ষ ভূত।
ঘন্টা মধ্যে বন্ধি দিমু দেখিবা অদ্‌ভুত।।'

ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ — চোখে দেখা যায় না এইসব বিষয়ের সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্রের যোগ। আসলে অশিক্ষিত গ্রামীণ মনে এই সব ধারণা এক ধরণের স্বাভাবিক বিশ্বাসের জোরে লোকমনে বাসা বেঁধে থাকে। লোকসাহিত্যের motif গুলির সঙ্গে অলৌকিকতা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। লোর বামনের যুদ্ধে অগ্নিবাণ, বায়ুবাণ প্রভৃতি অস্ত্রে পুরাণ প্রসঙ্গের উল্লেখ অলৌকিকতা জড়িত —

'ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে লোর যেন অগ্নিসম শর
ব্যস্ত হৈল কুমার বামন।।'

অন্যদিকে —

'সংশয় ভাবয় লোর জিনিতে বামন শূর
ব্রহ্ম অস্ত্র সন্ধানে সত্বরে।
যত কৈলা জন্মান্তরে সে সকল পুণ্য ফলে
বিজয় লভৌক এই শরে।।'

বামনের মৃত্যুতে দৈবশক্তির প্রভাব লোক motif।

লোকসাহিত্যের জগতে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য বলে কিছু নেই। এরাজ্যে সব সম্ভব এমন অলৌকিক ধারণা লোকসাধারণ যুক্তিহীন বিচারহীনভাবে বিশ্বাস করে। মৃতের পুনর্জীবন লাভের motif — এই বিশ্বাস থেকেই গড়ে ওঠে। লোকসাহিত্যে এই জাতীয় অলৌকিকতাকে supernatural power motif বলে। 'সতীময়না' কাব্যে সৃঞ্জয় রাজার একটি উপকাহিনী আছে। যেখানে অলৌকিক ক্ষমতাবলে মৃত মানুষের বেঁচে ওঠার কাহিনি আছে। প্রহৃত হলে সৃঞ্জয় রাজার পুত্র স্বর্ণষ্ঠীবীর গা দিয়ে সোনা ঝরে পড়ে বলে চোরেদের হাতে বেদম প্রহারে সে মারা যায়। কিন্তু নারদের মন্ত্রশক্তিতে সে পুনরায় বেঁচে ওঠে —

'এ বলিয়া মহামুনি পাতিল আসন।।
তপ জপ মুনিবর করিলেন্ত ধ্যান।
মৃত স্বর্ণষ্ঠীবে পুনি পাইল পরাণ।'

এই বৃত্তান্তের অনুষঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণ। বামনকে হত্যার পর ক্লান্ত অবস্থার মধ্যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে —

'হেন কালে দুর্বিপাকে কোথা হন্তে এক নাগে
দংশিল নিদ্রাতে চন্দ্ররাণী।।'

চন্দ্রাণী মৃত — এই অবস্থায় এক দৈবপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। তক্ষক নাগের প্রতি তাঁর আদেশে চন্দ্রাণী বেঁচে ওঠে —

'নাগের মহিমে জীব পাইল চন্দ্রাণী।
ঋষিহ হুঙ্কারি দিল মৃতসঞ্জিবণী।।'

মন্তব্য

পুনর্জীবন প্রাপ্তা চন্দ্রাণী সহ রাজা লোরের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ইচ্ছার মধ্যে দৈবপুরুষের অন্তর্ধান ঘটে। এ যেন জাদুবিদ্যা। লোকসাহিত্যে এই জাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগ। আখ্যানকাব্যে বিশেষ করে রোমান্টিক প্রেম আখ্যানকাব্যে এই জাতীয় অলৌকিক জাদুবিদ্যার প্রয়োগে লোকসাহিত্যের সুর বেজে ওঠে।

বাস্তবে মানুষের জীবনে পরিপূর্ণভাবে সব মেলে না, চাইলেই তৎক্ষণাৎ সব কিছু হয়ে যায়, এমন নয়। বুদ্ধি বিচেনায় অসম্য এবং অসাধ্য বস্তু ও শুধু মন ও কল্পনার জোরে সে আয়ত্ব করতে চায়। ভোজবাজির মত চোখ বন্ধ করলে কিংবা অলৌকিক কোন কিছুর প্রভাব স্মরণ করে তার উদ্দেশে মন্ত্র পড়লেই সব পাওয়া যায়, সব হয়ে যায়। মিলন কক্ষে লোরের বর্শা নিক্ষেপজনিত ব্যর্থতায় চন্দ্রাণীর মন্ত্রতন্ত্র আওড়ানোর মধ্যে এই বার্তাই প্রতিষ্ঠিত —

'তুমি রুদ্র তুমি ইন্দ্র অষ্টলোক পাল।
নবরূপে নরেশ্বর মায়ার জঞ্জাল।।
এক সেবা এক দেবা সেবয় কুমারী।
লোর সংঘটন হেতু বর মাগে নারী।।'

মধ্যযুগের আখ্যানকাব্যে লোকপ্রভাবজনিত এইসব অলৌকিকতার আমদানি দোষণীয় ছিল না, নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত মানুষের দৈবী বিশ্বাসকে কবিরা গুরুত্ব দিতেন। তাছাড়া কবিরাতো সেই সমাজেরই একজন। তাই রোমান্টিক প্রেমের বাস্তব আখ্যান রচনা করতে বসেও কবিরা এইসব দুর্জ্ঞেয় দৈব অলৌকিকতায় এবং রহস্যময় পরিমণ্ডলকে কাব্যের অঙ্গীভূত উপাদান করে লোকসাহিত্যের ধর্মকেই কাব্যে আমদানি করতেন। ধাঁধা-হেয়ালি, প্রবাদ প্রবচন কবিমানসজাত এই ভাবনা সূত্রেই কাব্যে পরিবেশিত হত। ধাঁধা হেয়াঁলির মধ্যে একটা ঐন্দ্রজালিক ধর্ম বর্তমান। দৌলতকাজী দক্ষ শিল্পবোধে এই বিষয়টি কাব্যে উপস্থিত করেছেন। সদৃশ শয্যা রচনা করে প্রকৃত চন্দ্রাণীর শয্যা নির্বাচনে লোরের সামনে বুদ্ধি-নির্ভর ধাঁধাঁর পরিবেশ গড়ে উঠেছে —

'চারি খাট পরে চারি নারীর শয়ন।
চারি মধ্যে চিন নাহি শ্রেষ্ঠ কোন জন।।
কৃত্যা রূপে চারি শয্যা রচিল কুমারী।
লোরের চাতুরীপনা বুঝিবারে নারী।।'

দৌলতকাজীর লোকসাহিত্যের প্রভাব-পরিবেশ গড়ে তোলার পথে আলাওলও স্বচ্ছন্দ যাত্রা করেছেন। 'সতীময়না' কাব্যের আলাওল কৃত অংশে দৌলতকাজীর অসাধারণ শিল্পবোধের প্রতিফলন নেই। এই দুর্বলতাজনিত ত্রুটিকে অতিক্রম করে যাওয়ার কারণেই হয়তো আলাওল রতনকলিকার কাহিনিতে রূপকথার ধর্ম প্রায় পুরোপুরি সঞ্চারিত করে লোকসাহিত্যের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন। দৌলতকাজীর অলৌকিক শক্তি প্রভাবজনিত বর্ণনায় লোকধর্মই প্রতিফলিত। কিন্তু তা শিল্প পরিণতিবোধে যথেষ্ট সার্থক ও সুন্দর। আলাওল এই ধর্মে যোগ্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান বর্ণনার পরিপূরক হিসেবে লোককথা-রূপকথা দৌলতকাজীর রচনায় একটা অসাধারণ আবহ গড়ে তুলেছে। আলাওল রচনাংশে এই সঙ্গতিবোধের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে চিরপরিচিত রূপকথার জগতকে তার উপাদান সমেত আমদানি করেছেন। লোকবিশ্বাসের বিভিন্ন দিক যা লোকসাহিত্যে motif রূপে পরিগণিত, আলাওলের রচনাংশে তার অগাধ প্রাচুর্য। অবিশ্বাস্য অলৌকিকতায় কবি কাব্যে তার অবাধ প্রবেশ ঘটিয়েছেন। রতনকলিকা উপাখ্যানের পুরো পরিকল্পনাটাই রূপকথার জগতের। আখ্যানের সূত্রপাতটিও ঐ ধর্ম থেকে বিচ্যুত নয় —

'নৃপতি আদেশে নৌকা মাঞ্জসে বান্ধিয়া।
ভাসাইয়া দিনক্ষণ নির্দেশ করিয়া।।
কন্যাকে লৈয়া যদি নৌকা পাল দিল।
অক্ষেমা করিয়া কন্যা কান্দিতে লাগিল।।'

রাজকন্যা ও রাজরাণী হয়েও দুর্ভাগ্যবশত অশেষ দুর্ভোগ বহনের যে গল্প রূপকথার জগতে পাওয়া যায়, এখানে সেই ধর্ম পুরোপুরি বর্তমান। তারপর অন্ত সমুদ্রে ভেসে যাওয়ার কষ্ট, তপ্ত শিলাতে দাঁনাতে না পারার যন্ত্রণা, বন্যজন্তুর মুখোমুখি হওয়ার ভয়াবহতা, মানুষের কণ্ঠ পেয়ে গর্ভবতী হওয়া সত্ত্বেও গাছে উঠে সেই আওয়াজ অনুসরণের উদ্যোগ ইত্যাদি রতনকালিকার রোমাঞ্চকর কর্মগুলির সঙ্গে রূপকথার অনুসঙ্গ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

অলৌকিকতার সূত্রে রূপকথায় প্রবেশ সমুদ্রে শিলা ভাসমানের মধ্যে, জলের নীচে রাজপ্রাসাদে একমাত্র তরুণী রাজকন্যার উপস্থিতিতে —

'মদন মঞ্জুরী নাম মুঞি অনাথিনী
শিশুকালে বিয়োগিত জনক জননী।।

হস্তিকর্ণ নামে এক রাক্ষস দুর্বার।
আচম্বিতে আইল এহি দেশের মাঝার।।'

রূপকথা জগতের একটি প্রধানতম বিষয় রাক্ষসের উপস্থিতি। এই রাক্ষসের অস্তিত্ব, বাসস্থান, আচার-আচরণ, সর্বোপরি রাক্ষসের মৃত্যু সম্পর্কিত গল্পে আলাওল স্পষ্টতই রূপকথার জগতে উপস্থিত হয়েছেন। কন্যা মদন মঞ্জুরীর কাছে বর্ণিত রাক্ষসের নিজের মৃত্যুপ্রসঙ্গে এ কথাই প্রমাণিত —

'যদি কেহ মোর দাড়ি এক গুচ্ছ পাত্র।
কদাচিত আন যদি শিলাত ছোয়ত্র।।
খণ্ড খণ্ড হই শিলা ভাঙ্গিয়া পড়িব।
প্রকাশ দেখিয়া অলি উড়িয়া উঠিব।।
যদি সেই অলি ধরি মারে একজন।
সেইক্ষণে হৈব মাত্র আক্ষার মরণ।।'

অন্য আরো বহু প্রসঙ্গে, প্রচুর আরো উপাদানের উপস্থিতিতে আলাওল রূপকথার রস পুরোপুরি বজায় রেখেছেন। দৌলতকাজী ও আলাওল উভয় কবি মিলেই 'সতীময়না' কাব্যে লোকধর্মের বৈশিষ্ট্য ও লোকপ্রভাবের সুর পুরোপুরি বজায় রেখেছেন। রোমান্টিক প্রেমের প্রকৃতির অনুষঙ্গক্রমে 'সতীময়না' কাব্যে লোকসাহিত্যের প্রভাব — কাহিনির লোকধর্ম এবং উভয় কবির দক্ষতাই প্রমাণ করে।

অন্যান্য প্রভাব ঃ মঙ্গলকাব্যের প্রভাব ঃ- মধ্যযুগের প্রথাসর্বস্ব আখ্যান কাব্যধারায় দৌলতকাজীর 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্যটি নবীনত্বের স্বাদে একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। কাব্যবিষয় হিসেবে গৃহীত তাঁর গল্পটি মৌলিক নয়। প্রচলিত লোকগাথা নির্ভর একটি রোমান্টিক কাহিনিকে শিল্পসম্মত সাহিত্যকৃতি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। কবির অমরত্ব ভক্তিবাদের অবাধ স্বীকৃতির মাঝে নরনারী বাস্তব প্রেমকে কোনরকম আবরণ ছাড়াই যথাযথ চিত্রণে। কাহিনিটি প্রচলিত হওয়ায় এবং রোমান্টিক প্রেমের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রূপকথার গুণগত মিল থাকায়, কবি কাব্যদেহে এবং কাব্যআত্মায় লোকপ্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। রূপকথার ধর্মে অলৌকিক অবাস্তবতা থাকায় 'সতীময়না' কাব্যে দৌলতকাজী, আলাওল উভয় কবির রচনায় অবিশ্বাস্য অবাস্তবতার আমদানি ঘটেছে। দৌলতকাজীর ক্ষেতে এটা হানিকর হয়ে ওঠেনি, আলাওলের মূল সুর এতে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাব্যটির পরিকল্পনায় লোকপ্রভাবই একমাত্র প্রভাব নয়, কবির পূর্ববর্তী আখ্যানকাব্য বিশেষত মঙ্গলকাব্যের প্রভাবও তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। রাজসভার সঙ্গে প্রত্যক্ষবাবে যুক্ত থেকে মুক্ত প্রণয়ের ছবি আঁকলেও কবিরা কোনভাবেই ধর্মবিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন না, ঈশ্বর বিশ্বাসের মূলেও ফাঁকি ছিল না। তাছাড়া মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম তাঁদের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী দান করেছিল। পূর্ববর্তী আখ্যানকাব্য বিশেষত মঙ্গলকাব্যের সূত্রপাতের ইঙ্গিত দৌলতকাজী ও আলাওল উভয়কেই প্রভাবিত করেছিল। গতানুগতিক অথচ দীর্ঘসময় চর্চিত মঙ্গলকাব্যের রীতি তাই তাঁদের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

'সতীময়না' কাব্যের গোড়ার দিকের অংশে মঙ্গলকাব্যের রীতি ও প্রভাব মেনে দৌলতকাজী কাব্যবিন্যাসে মনোযোগী হয়েছেন। পরিকল্পনাটি এইরূপ — (ক) আল্লা বন্দনা, (খ) ঈশ্বর প্রেরিত দেবপুরুষ বা রসুল প্রশস্তি, (গ) রাজপ্রশস্তি, (ঘ) সভাসদ প্রশস্তি, (ঙ) গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ, (চ) কাহিনি ও উপকাহিনি বর্ণন। পাঁচালির ঢঙে দৌলতকাজীর আরাধ্য দেব বন্দনাটি চমৎকার —

'বিস্‌মিল্লার নাম জান ত্রিভূবন সার।
আদি অন্ত নাহি তান দোসর প্রকার।
প্রথমে বলিয়ে বিস্‌মিল্লাহ্ অর্ রহমান।
সর্বস্থানে কল্যাণ পুরয়ে মনস্কাম।'

মঙ্গলকাব্যের কবি কিংবা 'সতীময়না'র কবি কারোরই ঈশ্বর প্রসঙ্গে কোনরকম দোলাচলচিত্ততা ছিল না। ঈশ্বরের কৃপায় সবকিছু মঙ্গল, যে কোন কর্মই জয়যুক্ত হয় এমন বিশ্বাস সংস্কার থেকে দেববন্দনার প্রথাযুক্ত ধারাটি গড়ে উঠেছে।

অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের পৃষ্ঠপোষক রাজারই প্রশস্তি রচনা করেছেন কবি। তবে রাজদরবারের প্রভাব বিস্তারকারী এবং কবির কাব্য রচনার প্রেরণাদাতা হিসেবে কোন কোন সুধী ব্যক্তি কবিদের প্রশস্তি লাভ করেছেন। আরকান রাজসভার পরিবেশ স্বতন্ত্র। এই রাজ্যের রাজারা ধর্ম বিশ্বাসে ছিলেন বৌদ্ধ। তাই বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় তাঁরা অদম্য উৎসাহ বোধ করবেন এমনটা নয়। তবে পৃষ্ঠপোষকতার বিস্তৃত অর্থ ধরলে এই বৌদ্ধ রাজারাই পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া বৌদ্ধরাজারা যথেষ্ট উদার ছিলেন। তা নাহলে দেব বন্দনার পর রাজবন্দনা না

মন্তব্য

থেকে রসুল প্রশস্তি কাব্য পরিকল্পনা হিসেবে গৃহীত হচ্ছে, এটা কখনোই সম্ভব হোত না। রাজঅপমানজনিত অপরাধে কবিরা রাজরোষে পড়তেন সুনিশ্চিত। আনুমানিক এই বিচার সত্য না হলেও একটা কথা সত্য যে বৌদ্ধরাজারা বাংলা ভাষা বুঝতেন না। তাঁদের নিয়োজিত গুণী ও গুণের সমাদরকারী বাংলা ভাষী অমাত্যেরা বাংলা ভাষা বুঝতেন এবং কাব্যরসিক হিসেবে কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণা দান করতেন। দৌলতকাজীর 'সতীময়না' কাব্যের সেই পৃষ্ঠপোষকতা অনুপ্রেরণাদাতা ব্যক্তিটি ছিলেন বৌদ্ধ রাজা থিরি-থু-ধর্ম্মার সময় সচিব অমাত্য শ্রীযুক্ত আশরফ খান। ধরে নিতে বাধা নেই এই ব্যক্তি বাঙালী মুসলমান ছিলেন। এই সুধী অমাত্য আশরফ খানের প্রতি স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা বশে এবং মঙ্গলকাব্যের রীতি মেনে দৌলতকাজী রসুল প্রশস্তি রচনা করেছিলেন —

'শ্রী আশরফ খান ধর্মশীল গুণবান
মুসলমান সবার প্রদীপ।
সে রসুলপরসাদে গুরুজন আশীর্বাদে
রাজসখা হউক চিরজীব।।'

রসলু উল্লেখেই আশরফ খানের প্রশস্তি কবিকে সন্তুষ্ট করেনি। সমর সচিবের বিবিধ গুণপনার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন কবি।

প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক রাজা, রাজ অমাত্য নয়। ব্যক্তিগতভাবে রাজ অমাত্য পৃষ্ঠপোষক হতে পারতেন। কিন্তু 'সতীময়না' দরবারী কাব্য। এক অরণ্য দরবারে রাজার উপস্থিতি এবং অনুমতিক্রমে আশরফ খান দৌলতকাজীকে বাংলা ভাষায় সরল পাঁচালী রীতিতে 'মৈনাসৎ' কাব্যের অনুবাদের আদেশ দেন। স্বভাবতই দৌলতকাজী কাব্যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতাই স্বীকৃত এবং মঙ্গলকাব্যের প্রথা শিরোধার্য করে কবির রাজপ্রশস্তি রচনা —

'নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।।
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন।।'

পৃষ্ঠপোষক রাজারা যথার্থই গুণের সমাদার করতেন। নাহলে প্রশস্তি রচনা করতে বসলেও সত্যদ্রষ্টা কবিরা এতটা উচ্ছ্বসিত হতেন না, পৃষ্ঠপোষক রাজা সম্বন্ধে। মঙ্গলকাব্যের অপর এক স্বাভাবিক কাব্যরীতি অতিবর্ণনা। তাই পল্লবাচারী হিসেবে অপ্রাসঙ্গিক অনেক বর্ণনাই কাব্যের স্বাভাবিক রসধারার প্রতিবন্ধক। তবে একথাও ভুললে চলবে না, ব্যক্তিনিষ্ঠ কাব্যের চর্চা তখনও এমন স্তরে উন্নীত হয়নি যে আখ্যানকাব্যের কবিরা সমাজ, পৃষ্ঠপোষক, রাজদরবার, সভাসদকে উপেক্ষা করবেন। আখ্যানকাব্যের ক্ষেত্রে এসবের প্রভাব অনিবার্য এবং কবির বর্ণনায় অতিরেকভাবও সময়ে বিচারে স্বাভাবিক। তাই রাজ্যপ্রশস্তি লিখতে গিয়ে কবি সভাসদদের প্রশস্তি সুকৌশলে বর্ণনা করেছেন —

'চতুর্দিকে পাত্রগণ মাঝে নৃপবর।
তারকা বেষ্টিত যেন চন্দ্রমা সুন্দর।।'

এই অংশে যথার্থ সভাসদ বর্ণনা নয়, সভাগৃহ প্রশস্তিই রচিত। তাছাড়া মঙ্গলকাব্যের নানাবিধ বর্ণনার মাঝে সমাজ প্রসঙ্গ অনিবার্য প্রভাব হিসেবে স্বীকৃত। দৌলতকাজীও কাব্য বর্ণনায় সমাজ, সামাজিক রীতি-নীতি বিশেষত জাতি বিশিষ্ট মানুষকে উপেক্ষা করেননি —

'সৈয়দ সেখ আদি মোগল পাঠান।
স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।
সারি সারি বসিলেন্ত যেন মহেশ্বর।।'

দৌলতকাজীর কাব্যে মঙ্গলকাব্যের কাব্যরীতি অনুযায়ী স্পষ্টভাবে দেবখণ্ড নরখণ্ড নেই। অভিশপ্ত কোন দেবতা বা স্বর্গবাসী মর্ত্যে মানবরূপ ধারণ করে কোন দেবতার পূজাতে নিয়োজিত হ'ত। ঐ ভ্রষ্ট চরিত্রটির মধ্য দিয়ে মঙ্গলকাব্যে দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের মধ্যে সংযোগ সাধিত হ'ত। 'সতীময়না' কাব্যে এইরকম গ্রন্থবিভাজন নেই, গ্রন্থ পরিকল্পনাও নেই। আল্লার বন্দনা-অংশটিকে মঙ্গলকাব্যের রীতির মত দেবখণ্ড ধরে নেওয়া যায়, বাকি অংশ বিশুদ্ধ অর্থেই নরখণ্ড।

'সতীময়না' কাব্যে মঙ্গলকাব্যের প্রত্যক্ষপ্রভাবে 'বারমাস্যা' বর্ণনায়। মঙ্গলকাব্যের একটি পরিচিত কাব্যবিষয় বারমাস্যা। বিশেষত মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' এর অসাধারণ প্রয়োগ দৃষ্টান্ত বর্তমান। সেখানে কালকেতু পত্নী ফুল্লরার দুঃখের বর্ণনায় বারমাস্যা অর্থাৎ বারমাসের দীর্ঘসময় পূর্ণ। মুকুন্দরাম যেখানে আরম্ভ মাস বৈশাখের দুঃখ বর্ণনার মধ্য দিয়ে বারমাস্যার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন, দৌলতকাজী সেখানে মৌলিকত্ব দাবী করতেই পারেন। কবি ঘন বর্ষার প্রেক্ষাপটে স্বামী সঙ্গ বঞ্চিতা

বিরহ কাতরা ময়নার দুঃখসময় জীবনকে একেবারে জীবন্ত করে তুলেছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের উল্লেখে বারমাস্যার বর্ণনা অপূর্ণ থাকলেও বাকী এগারো মাসের বর্ণনায় দৌলতকাজী প্রশংসনীয় শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাছাড়া একক বিবৃতিমূলক বারমাস্যা বর্ণনার পরিবর্তে দৌলতকাজী মালিনীর সঙ্গে ময়নার উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক বর্ণনা ভঙ্গীতে নাট্যরস জমিয়ে তুলেছেন। কার্তিক মাসের বারমাস্যা বর্ণনায় ময়নার দুঃখবোধ অসহনীয় —

'কি মোর কার্তিক মাসে পরব দেওয়ালি রসে
কিবা সুখ সুচিত্র আকাশে
যাহার নাহিক কান্ত দিবসে না দেখে পন্থ
কি করি নিশি অলিাযে।।'

দূতী রতনা মালিনীর প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দূতী প্রসঙ্গ ও প্রভাবের কথা মনে হয় —

'মালিনীর লাস ভেশ কি কহিমু সবিশেষ
ফুলটা বিখ্যাত প্রবঞ্চক।'

মঙ্গলকাব্যের অপর এক পরিচিত রীতি, কাহিনির মধ্যে শাখাকাহিনি ও উপকাহিনি বর্ণন। 'সতীময়না' কাব্যে দৌলতকাজী ও আলাওল উভয়েই উপকাহিনি বর্ণনা করেছেন। কবি আলাওলের রচনাংশেও মঙ্গলকাব্যের প্রথামাফিক দেববন্দনার প্রভাব আছে —

'প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
যেঁই প্রাণী মর্ত সর্ব করল সৃজন।।'

দৌলতকাজীর মত আলাওলও পৃষ্ঠপোষক রাজা ও রাজঅমাত্যের বন্দনা করেছেন। অমাত্য সোলেমানের আদেশে আলাওলের 'সতীময়না'র অসমাপ্ত অংশ সমাপ্তির উদ্যোগ প্রসঙ্গে কবি —

'এতেক ভাবিয়া সোলেমান মহামতি।
হরষিতে আদেশ করিলা আক্ষাপতি।।
এহি খণ্ড পুস্তক পুরাএ মোর নামে।
সরূপ কি কথা লিখি পাও এক ধামে।।'

এছাড়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধবর্ণনায়, মনসামঙ্গলের প্রভাবে চন্দ্রাণীর সর্পদংশন প্রসঙ্গে, অতিপ্রাকৃতের উল্লেখে 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্যে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব স্বীকৃত।

সুফী প্রভাব ঃ- মুসলমানদের সুফি ধর্ম-সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম আউল বাউল ধর্ম ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়। মানবধর্ম ঈশ্বরধর্ম এক অদ্ভুত সমন্বয় সূত্রে এই ধর্মে বিরাজমান। সুফীরা সাধক, মুসলমান সাধক। এদের পরিচয় সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসকার জানিয়েছেন ''সমাজের পীর-ফকির-মুরশিদ ও সুফী সাধকদের আনাগোনা পাঠান আমলেই শুরু হইয়াছিলে; মুগলযুগে যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধির ফলে এই সময়ে উত্তর-ভারত হইতে আউলিয়া, সিয়া ও সুফী মতাবলম্বী মুসলমানগণ দলে বাংলায় আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পর্ব, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

সুফী ধর্মের উৎস উত্তরভারতের সুফী খান্দান। আলাওলের মত দৌলতকাজী সুফী ধর্মাবলম্বী কবি। এই ধর্মের উদার ভাবধারা একটু রহস্যাচারী হওয়া সত্ত্বেও আরাকান রাজসভার দৌলতকাজী ও আলাওলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সুফী প্রভাব 'সতীময়না' কাব্যে বর্তমান। সুফী ধর্মে প্রেম, বিরহ ও গুরুবাদ এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি এই ধর্মের প্রধান কথা। এখানে গুরু মোল্লা-পুরুত নয়, এর অর্থ আরো ব্যাপক। সুফী ধর্মের গুরু উদার প্রেমের বোধে, সম্প্রদায় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে মানুষকে ঈশ্বরপ্রেমের জন্য ব্যাকুল করে তোলেন, উন্মুক্ত করে দেন মানবিকতার পথ। সুফীবাদী কবি দৌলতকাজী কাব্যে এই গুরুরই বন্দনা গান গেয়েছেন —

'গুরুভক্ত হয় সে সাধক শুদ্ধ মতি।
তাহাকে দেয়ন্তস্বর্গ কৃপাময় পতি।।'

বিধাতা অন্তরঙ্গ অনুভূতিগম্য সত্য। এই সত্য উপলব্ধির জন্য মানুষ মাত্রেরই শিক্ষা করা উচিত। ''এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের আশ্রয় লইতে হয়। .... এ পথের গাইড-গুরু ব্যতীত পথ চলা সাধারণত অসম্ভব'' ('পথ ও পাথেয়' গ্রন্থের অবতরণিকা, শেখ ফজলুল করিম)। গুরু সাধন পথের আলো, প্রেমের দিশারী।

সুফী ধর্মের গূহ্য সাধনপ্রণালীতে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে স্বীকৃত যে দেহের মধ্যেই দেহাতীতকে সন্ধান করতে হবে। এই দেহাতীত জ্যোতির্ময় ঈশ্বর প্রেম। আমাদের পরিচিত সংসার প্রেমেরই

মন্তব্য

আধারেই বৃত। যদি দেখতে পারি, চোখ খোলা থাকে তাহলে সংসার প্রেমময়ও বটে। সুফী ধর্মে দেহধারী মানবপ্রেমেই ঈশ্বরপ্রেমের উপলব্ধির সাধনা। সুফী কবি দৌলতকাজী 'সতীময়না' কাব্যে এই মানবকে, মানব প্রেমকে মহিমান্বিত করেছেন —

'নিরঞ্জন সৃষ্টি নয় অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহান সমান।।
নর চিন চিন নাহি কিতাব কোরান।
নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান।।'

কবি মানব জীবনকে এক অপূর্ব গৌরবে উদ্ভাসিত করেছেন। দেহকে ভিত্তি করে সুফী সাধকের সাধনা বলে, মানুষের মধ্যে এক মহত্ত্বের সন্ধান লাভ করেন এই কবিরা। দৌলতকাজী 'সতীময়না' কাব্যে মানুষের এই মহত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

সুফী সাধকদের এই সর্বব্যাপী প্রেম ও মানবিকতার কাছে আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তুচ্ছ হয়ে গিয়ে সর্বধর্মের মূলতত্ত্ব ও সর্বমানবের মূলগত ঐক্যের বৃহৎ সমন্বয়বাদী আদর্শ গড়ে উঠেছে। সুফী ধর্মের আধ্যাত্মবাদ তাই মানব প্রেমবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মানুষকে ভালোবাসলে প্রেমময় ঈশ্বরকে ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ পন্থাটি আবিষ্কৃত হয়। দৌলতকাজী সুফী ধর্মাবলম্বী, কিন্তু কবি, জীবনরসিক কবি। তাই ভারতীয় সুফী ধর্মের গুরুবাদ, লীলাবাদ, মানবপ্রেম এবং সমন্বয়বাদী দৃষ্টি তাঁর জীবন দর্শন হিসেবে গড়ে উঠেছে। মানুষ যে মানুষই, তার মধ্যে যে কোন ভেদ নেই — 'সতীময়না' কাব্যে এটাই সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে। মুসলমান কবি হয়েও উদার প্রেমের বোধে কাব্যপরিকল্পনায় বিশেষত কাব্যবিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন হিন্দুধর্মের বিষয়। মুসলমানের আল্লার মত সমান শ্রদ্ধায় তিনি হিন্দুর দেবতাদের ভক্তিবন্দনা রচনা করেছেন। বৃহত্তর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব না থাকলে চন্দ্রাণীর মধ্য দিয়ে তিনি যে হিন্দু দেবস্তুতি রচনা করেছেন, তা সম্ভব হতো না —

'তুমি হরি হর তুমি কমল লোচন।
তুমি দেব নৃপ তুমি শ্রীমধুসূদন।।
তুমি রাহু শিব গ্রহ তুমি কেতু ছায়া।
দুখ সুখ তোমা লীলা গৃহ সব মায়া।।'

ঈশ্বর সৃষ্ট নর যে 'অমূল্য রতন' সেখানে যে কোন ভেদ নেই, সুফী ধর্মের এই প্রভাব কবি সর্বান্তকরণে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলেই শ্রীসুধর্মার রাজসভায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উপস্থিতি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন —

'সৈয়দ সেখ আদি মোগল পাঠান।
স্বদেসী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।
সারি সারি বসিলেন্ত যেন মহেশ্বর।।'

অনিত্য সংসার নয়, নিত্যলোকই যে মানুষের সারসত্য আরও উল্লেখ কাব্যে দিয়েছেন কবি। সুফী ধর্মে ভাবধারার সঙ্গে মিলে যায় এমন প্রসঙ্গও যেমন — যোগী বা যুগী, বাউল ইত্যাদিও দেহবাদী প্রেমের সূত্রে কাব্যে জায়গা করে নিয়েছে। সব মিলিয়ে পার্থিব প্রেমের মধ্যেই যে ঈশ্বর প্রেমের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় — নর-নারীর প্রেমকে কাব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে সে সম্বন্ধে কবি স্পষ্ট ধারণা পোষন করেছেন।

সুফী ধর্মে পরিপূর্ণ আশ্বাস ছিল কবি আলাওলের দৌলতকাজীর মত তিনিও সুফী ধর্মানুযায়ী গুরুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। যে গুরু মানবের মনে ঈশ্বরের জন্যে প্রেম এং ব্যাকুলতা তৈরী করে পরিপূর্ণ প্রেমময় করে তোলেন, সেই গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কবি —

'শশধর ধরিতে বলে কেহ স্তুতি তালে।
অসাধ্য সাধনে মাত্র গুরু কৃপা বলে।'

প্রেমময় ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেন; স্বভাবতই কাব্যস্রষ্টা প্রেমের দিশারী। সুফীভাবপুষ্ট কবি আলাওলের দৃষ্টিতে এই প্রেম মানবপ্রেম। হিন্দুপ্রেমের কাহিনীকে বিষয় করে কবি সেই ভুবনজয়ী প্রেমকেই জয়যুক্ত করেছেন। সর্ব ঈশ্বর প্রসঙ্গ এবং লীলাবাদ সুফী ধর্মের বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বর আলো স্রষ্টা, তাঁর অনুগ্রহেই এ জগৎ সংসারের সৃষ্টি। আলাওলের দৃষ্টি এ প্রসঙ্গে সুফী ধর্মনুসারী —

'প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
যেঁই প্রাণী মর্ত সর্ব করল সৃজন।।
সৃজয়ে অবনী রূপ সৃজে সূর্য পানি।

ক্রমে ক্রমে সৃজ এ করিয়া পুণ্যকামী।।'

কবি আলাওলের মধ্যে সর্বধর্ম সমন্বয়বাদ পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান। সুফী ধর্মের প্রভাবের ফলে কবি তাই ঈশ্বর সৃষ্ট মানবের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ কামনা করেননি। বৃহত্তর মানবপ্রেমই কবিকে সুফী ধর্মের এই দর্শনে বিশ্বাসী করে তুলেছিল বলেই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সর্বব্যাপী মানবিকতার গৌরবময় স্তুতি কবি উচ্চারণ করেছেন, 'সতীময়না'র অল্প পরিসরেও, যে অংশ তিনি স্বয়ং রচনা করেছিলেন। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক আলাওলের মধ্যে সুফী ধর্মের যে দর্শন গড়ে তুলেছিল, বৈষ্ণবীয় লীলাবাদে সেই দর্শনই প্রতিষ্ঠিত। লোরের সঙ্গে মিলনের জন্য ময়নার অসহনীয় দুঃখযন্ত্রণাভোগ প্রেমের এই দিকটিকেই উজ্জ্বল করে তোলে। আলাওল যেমন দৌলতকাজীও একইভাবে সুফী ধর্মমতে অনুসারী সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিহীন এক উদার মানব প্রেমকেই জয়যুক্ত করছেন। যেখানে জাতপাতের সঙ্কীর্ণ বেড়াজাল নেই, আচারধর্মের তুচ্ছতা নেই, ঈশ্বরধর্ম মানবধর্ম পরিপূরকতার ইঙ্গিত বহন করে, সংস্কৃত দেহসাধনার মধ্যে, দেহপ্রেমের মধ্যে দেহাতীতের আস্বাদ গড়ে ওঠে — উদার সুফী ধর্মের এই মহৎ আদর্শই 'সতীময়না' কাব্যে উজ্জ্বল।

বৈষ্ণব পদাবলী, সংস্কৃত সাহিত্য এবং অন্যান্য কাব্যের প্রভাব ঃ- দৌলতকাজীর পাণ্ডিত্য, তাঁর সাহিত্যানুরাগ এবং বহু বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব ও আস্বাদনের ক্ষমতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। হিন্দি কবি সাধনের 'মৈনাসৎ' যা গ্রাম্য হিন্দি ভাষায় রচিত, তেমন দুর্বোধ্য বিষয়কে অনুবাদ দানের ক্ষমতায় কবির হিন্দি ভাষার সঙ্গে সম্যক পরিচিতিকেই তুলে ধরে। ফারসী সাহিত্যের সঙ্গেও কবির সুসম্পর্ক ছিল। এছাড়া সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভারতীয় পুরাণ শাস্ত্র এবং কাব্যাদি কবি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছিলেন। দৌলতকাজী সুফী ধর্মাবলম্বী কবি। সুফীতত্ত্বের নরতত্ত্ব বা নরবাদ সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার কথাই মনে করিয়ে দেয়। ঈশ্বর প্রেমকে সামনে রেখে এই জীবনরস সম্ভুত মানবতাবাদ সুফী কবির ভাবনায় বৈষ্ণব পদাবলীর বিস্তৃত ক্ষেত্রে মধু আহরণে অনুকূল করে তোলে। ভাবে, ব্রজবুলি ভাষায়, ছন্দপ্রকরণে এমন সব পদ রচনা করেছেন কবি যেগুলিকে বৈষ্ণব পদ বলতে কোনোভাবেই আপত্তি হবে না। শ্রাবণের বারমাস্যা বর্ণনায় ময়নার দুঃখবর্ণনা বৈষ্ণব পদ এবং বৈষ্ণব পদের প্রভাবকেই মনে করায় —

'শ্রাবণেতে গগনের সঘন ঝরে নীর।
তবু মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর।।
মদন ঐষিক জিনি বিজলীর রেহা।
তর্কয় যামিনী কণ্ঠায় মোর দেহা।।'

বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজবুলি ভাষার ধ্বনিস্পন্দনে প্রভাবিত হয়ে দৌলতকাজী কয়েকটি উন্নতমানের ব্রজবুলির পদ উপহার দিয়েছেন। সেইরকম একটি —

'মোহর সুনায়ক গুণের পালক
মধুর মুরতি মুখ ভেশং।
সো মধু তেজিয়ে করাওসি বিষ পান
ভাল ধাই কহ উপাদেশং।।'

কবি জয়দেবের সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'গীতগোবিন্দে'র স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয় 'সতীময়না' কাব্যে। 'গীতগোবিন্দে'র ধ্বনিস্পন্দক্রমে কবি সংস্কৃত ভাষাতেই বিরহিনী ময়নার অনুপম বর্ণনা করেছেন —

'বসতি তিমিরে অতি ঘোরং
নিচোল চকোর আঁখি সোরং
বক ফুল মঞ্জরী কিমতি অতি সীদতি
মলিন অঞ্জন মুখ বেশং।'

কবি দৌলতকাজী রামায়ণ, মহাভারতের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। লোর বামনের যুদ্ধ বর্ণনায় রামায়ণের প্রভাব কবি অস্বীকার করতে পারেননি —

'এ বলিয়া মহাশর এড়ে লোর ধনুর্ধর
বামনের নিধন কারণ।
চর্ম মর্ম ভেদি শর প্রবেশিল কলেবর
সংজ্ঞাহীন পড়িল বামন।'

'বিদ্যাসুন্দর'এর কাহিনিও কবির জানা ছিল। দুই এক জায়গায় কবি এর উল্লেখ করে বিদ্যাসুন্দরের

মন্তব্য

প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। চন্দ্রাণীর সঙ্গে লোরের গোপন মিলনের প্রসঙ্গে এর উল্লেখ আছে —

'বিদ্যার সম্পাশে যেন বসিল সুন্দর।
দূরে গেল বদনের লজ্জার অম্বর।।'

কবি শুধু উল্লেখমাত্রেই এই প্রভাবকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। সমাজ অননুমোদিত গোপন মিলনে বিদ্যাসুন্দর যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, লোর-চন্দ্রাণীর গোপন মিলনে ঐ দুঃসাহসই প্রতিফলিত। এই প্রভাবগুলি দৌলতকাজীর হাতে আর বাহ্যিক প্রভাব হিসেবে না থেকে অন্তর্বর্তী ভাবসংগতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কাব্যপরিকল্পনায় কবির মৌলিকতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এইকথা বলা যায় জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাবের কথাতেও। ময়নার বারমাস্যা বর্ণনায় দৌলতে কাজী লিখেছেন —

'কেতকী চম্পক কদম্ব কুরুবক
বকুল মুকুল কুল রঙ্গে।
হেরইতি মধুর মধু পানে মধুকর
মালিনী-মান এবে ভঙ্গে।।'

মালিনীমুখের এই বর্ণনায় যে ছন্দধ্বনি তা স্পষ্টতই 'গীতগোবিন্দে'র 'রতিসুখসারে গতিসভিসারে মদনমনোহরবেশম' পদের ছন্দধ্বনির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

'সতীময়না' কাব্যে ভাবসমৃদ্ধ সুক্তি-প্রৌঢ়োক্তির অসাধারণ প্রয়োগে সংস্কৃত কবিদের প্রভাবের কথাই মনে হয়। 'রায়বংশ' কাব্যে কালিদাস 'তিতীর্যুদুস্তরং মোহদুডুপেনাস্মি সাগরম্' — এইরকম বর্ণনা করেছেন। 'পিপীলিকা যেন সিন্ধুতরঙ্গ সন্তরে' বাক্যটিতে দৌলতকাজী কালিদাসের ঐ বর্ণনার প্রভাব অনুভব করেছেন। 'সতীময়না' কাব্যের এক জায়গায় দৌলতকাজী বর্ণনা করেছেন 'তুলারাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ।' এই বাক্যটিতে কালিদাসের 'তুলারাশাবিগ্নিঃ' পংক্তির অনিবার্য প্রভাব। দৌলতকাজী লিখেছেন 'ষোলকলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান'। 'রঘুবংশ' কাব্যে কালিদাসের বর্ণনায় মেলে 'উপরূঢ় সামগ্রামিব চন্দ্রমাঃ'। দৌলতকাজীর উপর যার অনিবার্য প্রভাব। এ থেকে দৌলতকাজীর গভীর কালিদাস প্রীতিই প্রমাণিত। তাছাড়া দৌলতকাজীর আরও অনেক উক্তিতে প্রাচীন কাব্যের অনুসৃতি ধরা পড়ে। একইরকম ভাবে 'সতীময়না' কাব্যে এমন অনেক প্রবাদ প্রবচনমূলক উক্তি আছে যা সমসাময়িক কবি ভারতচন্দ্রের কথাই স্মরণ করায়। শুধু ভারতচন্দ্র নয়, অনেক প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যিকের প্রভাবও এই উক্তিগুলির মধ্যে বর্তমান। সেইরকম কয়েকটি —

"(ক) যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা।
তস্করেতে ধর্মকথা, বেশ্যাকে ভর্ৎসনা।।
(খ) যুবক পুরুষজাতি নিঠুর দুরন্ত।
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত।
(গ) কাণ্ডারী বিহীন নৌকা শ্রোতে ভঙ্গ হয়।
পুরুষ বিহনে নারী জীবন সংশয়।
রাত-রণস্থলে শয্যা অতি অনুষ্কাম।।"

পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বের অনন্য মিশ্রণে গঠিত এই পংক্তিগুলি কবি দৌলতকাজীর আহরণশক্তি এবং মৌলিক উপস্থাপনার পরিচায়ক।

১১.১৪ ঃ অনুশীলনী

১। 'সতীময়না' ও লোরচন্দ্রাণী' অনুবাদ কাব্য হলেও দৌলতকাজীর মৌলিকতার পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। রোমান্টিক কাব্য হিসেবে 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী' কাব্যটি রোমান্টিকতা আলোচনা করুন।

৩। সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী কাব্যটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

৪। সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী কাব্যে দৌলতকাজীর চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা বিচার করুন।

৫। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী' কাব্যটির রোমান্টিকতা আলোচনা করুন।

৬। দরবারী সাহিত্য হিসেবে 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী'-র সার্থকতা বিচার করুন।

৭। দৌলতকাজীর মৌলিকতার পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮। সতীময়না কাব্যে অন্যান্য সাহিত্যধারার প্রভাব আলোচনা করুন।

মন্তব্য

১১.১৫ ঃ গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) — সুকুমার সেন।

২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম — সুখময় মুখোপাধ্যায়।

মন্তব্য

একক ১২ - সৈয়দ আলাওল

বিন্যাসক্রম

১২.১ ঃ উদ্দেশ্য।

১২.২ ঃ কবি সৈয়দ আলাওলের পরিচয়।

১২.৩ ঃ দৌলতকাজীর 'সতীময়না' কাব্যের সমাপ্তিদান।

১২.৪ ঃ রচনাসমূহের পরিচয়।

১২.৫ ঃ পদ্মাবতী কাব্যের পরিচয়।

১২.৬ ঃ জায়সীর 'পদ্মাবত' ও আলাওলের 'পদ্মাবতী'-র তুলনা

১২.৭ ঃ আলাওলের কবি কৃতিত্ব।

১২.৮ ঃ সপ্তদশ শতকের অন্যান্য মুসলমান কবিগণ।

১২.৯ ঃ অনুশীলনী।

১২.১০ ঃ গ্রন্থপঞ্জি।

১২.১ ঃ উদ্দেশ্য

মধ্যযুগের দেববাদ নির্ভর সাহিত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার সাহিত্যকীর্তি হল সৈয়দ আলওলের 'পদ্মাবতী'। 'পদ্মাবতী' অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আলোচনার বিষয়। কারণ দেবতা নির্ভর দেব প্রশস্তিমূলক মনুষ্যত্ববোধকে রাতারাতি দূরে সরিয়ে নতুন মন্ত্রে মানব প্রেমের বন্দনা গান গাইলেন আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিগণ। তাই সপ্তদশ শতকের কবিদের মধ্যে সেই ভাব বিহ্বলতাময় আবেশ আরও গতিশীল হয়ে উঠল। তবে এর আগে অর্থাৎ চর্যাপদে, মঙ্গলকাব্যে, বিশেষভাবে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে রোমান্টিকতার শুভ সূচনার বিকাশ ঘটতে চলেছিল, কিন্তু তেমন সাহসী প্রতিভাধর কবির কাব্যে তার রূপ পাচ্ছিল না। সে প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের কাব্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। রোমান্টিক প্রেমের জোয়ারে ভেসে গেল দেবতার উদ্দেশ্য, পৃষ্ঠপোষণকারী রাজা ও রাজ অমাত্যের উদ্দেশ্যে প্রশস্তিবন্দনা। নদীর মতো সাহিত্যও তার গতি পরিবর্তন করে নতুন প্রাণের আবেদন নিয়ে আসে। সাহিত্যও নতুন ধারার আবেদনে মানুষকে কাব্যের নায়ক করে তুলতে লাগল। শত বাধা, শত চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষই প্রেমের জয়গানে, রোমান্টিকতায় মজে রইল। সেই রোমান্টিক প্রণয়াখ্যানের টাল-মাটালে দেবতা নির্ভর মধ্যযুগের দেবনির্ভরতা কিছুটা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বিশেষকরে রক্তমাংসে গড়া মানুষই রোমান্টিক আদিরস নিয়ে দরবারি সাহিত্যের জমিকে উর্বর করেছিল। এই রোমান্টিক আদিরসের প্লাবন ধারায় আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতিকে নিবৃষ্ট করেছিল। তাই এই সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্যমূলকতা অবশ্যই জরুরি।

১২.২ ঃ কবি সৈয়দ আলাওলের পরিচয়

আরাকান রাজসভার অপর এক বিখ্যাত কবি সৈয়দ আলাওল। আধুনিক পূর্ব কবিরূপে এবং বিভিন্ন কাব্য মধ্যে উল্লিখিত নিজের বক্তব্যের কারণে আলাওলের পরিচয়ও সংশয়াচ্ছন্ন নানামত উদ্রেককারী। নিজের জন্মস্থান সম্বন্ধে কবি নিজেরই উক্তি এইরকম —

'গৌড়মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদভূম।
বৈসে সাধু সৎলোক হর্ষ মনোরম।।
ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্যে রাজ্য।।
রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়।
আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্যত নয়।।'

(পদ্মাবতী, ড. শহীদুল্লাহ সম্পাদিত)

'সতীময়না' কাব্যের সে অংশ আলাওল রচিত, সেই অংশেও কবি 'গৌরমধ্যে মুলুক ফতেহাবাদ শ্রেষ্ঠ' কিংবা 'মধ্যে ভাগীরথী ধারা বহে অনুমান' — জাতীয় মন্তব্য করেছেন। এইসব বিচার করে ড. সুকুমার সেন মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, ''তাঁহার পৈতৃক নিবাস ''মল্লুক ফতেহাবাদ''-এর অন্তর্গত জালালপুর। অনেকের মতে এই স্থান চাটিগাঁয়ের মধ্যে ছিল। কিন্তু কবি লিখিয়াছেন, 'মল্লুক ফতেহাবাদ' গৌড়েতে প্রধান এবং ''ভাগীরথী গঙ্গাধার কহে মধ্যে রাজ্য'', সুতরাং ইহা পশ্চিম অথবা মধ্য বঙ্গ হওয়াই স্বাভাবিক'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ড. সুকুমার সেন)। এইসময় ফতেহাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন মজলিস কুতুব এবং কবির পিতা ছিলেন ''রাজ্যেশ্বর'' মজলিস কুতুবেরই একজন অমাত্য। কবির জন্মকাল সম্পর্কে ড. শহীদুল্লাহের বিবেচনা অনুসারে বলা যায় কবির জন্ম হয় ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে এবং দীর্ঘজীবী কবি মৃতুবরণ করেন ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৮১ বছর বয়সে।

বিচিত্র জীবন কবি আলাওলের। জলপথে নৌকাযোগে যাওয়ার সময় হার্মাদ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে পিতার মৃত্যু ঘটে এবং কবি আরাকান রাজসভায় অতিকষ্টে উপস্থিত হন। অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে নিযুক্ত হয়েও সঙ্গীত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের জোরে তাঁকে 'তালিব আলিম' — সম্মানীয় উপাধি দিয়ে রাজসভার সভাসদ হিসেবে বরণ করে নেওয়া হয়। এই উদ্যোগে রাজমন্ত্রী সোলেমানের ভূমিকাই প্রধান। দৌলত উজীর এই সোলেমানের নির্দেশেই আলাওল কবি দৌলতকাজীর অসমাপ্ত কাব্য 'লোর-চন্দ্রাণী' সম্পূর্ণ করেন আনুমানিক ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তীক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কবি মাগন ঠাকুরের সাহচর্য্যে কবি বিখ্যাত 'পদ্মাবতী' ও 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল' গ্রন্থগুলি রচনা করেন। এই সময় শাহশুজার আরাকানে আগমন এবং আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণে, শাহশুজার বন্ধুস্থানীয় আলাওল সন্দেহপরবশ পঞ্চাশ দিন কারাবাসে বাধ্য হন। শেষপর্যন্ত বিচারপতি মাসুদ শাহার আনুকূল্যে

মন্তব্য

কবির কারাবাস পর্ব সমাপ্ত হয় এবং তিনি আরাকানরাজ শ্রী চন্দ্রসুধর্মার নির্দেশে 'সেকেন্দার নামা'— অনুবাদ করেন। বিচিত্র জীবনের অধিকারী কবি আলাওল বহু গ্রন্থ প্রণেতা মধ্যযুগের একজন বিখ্যাত কবি।

১২.৩ ঃ দৌলতকাজীর 'সতীময়না' কাব্যের সমাপ্তিদান

দৌলতকাজীর 'সতীময়না' কাব্যের অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করেন সৈয়দ আলাওল। আরাকান রাজ সান্দ-থু-ধম্মা বা চন্দ্রসুধর্মার (১৬৫২ - ৮৪ খ্রীঃ) রাজত্বকালে মুখ্য অমাত্য ছিলেন সুলেমান। এই সুলেমানের নির্দেশেই কবি 'সতীময়না' কাব্য সমাপ্ত করেন এবং প্রহেলিকাময় পয়ারে সমাপ্তিকাল নির্দেশ করেন —

'মুসলমানী শকসংখ্যা শুন দিআ মন।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন।।
সিন্ধু শূন্য দেখিআ আপনা দুই দিগে।
সুত কলানিধিরে রাখিলা বাম ভাগে।।
মগদের সনের শুনহ বিবরণ।
যুগ শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাঙ্কন।।'

সাংকেতিক স্তবকটি থেকে পাওয়া যাচ্ছে, সিন্ধু অর্থে সমুদ্র অর্থাৎ সংখ্যা ৭, কলানিধি অর্থে চন্দ্র অর্থাৎ ১, গণনাটি সম্পূর্ণ করলে দাঁড়ায় মুসলমানী শক অর্থাৎ ১০৭০ হিজরী। আবার ১০৭০ হিজরী সমান ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। আবার মগী সনের বিচারে দেখা যাচ্ছে — এক জোড়া শূন্যের মধ্যে যুগ অর্থাৎ ২ এবং মৃগাঙ্ক অর্থাৎ চন্দ্র, সংখ্যা হল ১, স্বভাবতই যথার্থ মগী সনটি হল ১০২০। মগী সনের সূত্রপাত ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। অতএব আলাওল রচিত সংকেতটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 'লোরচন্দ্রাণী'র সমাপ্তিকাল ১০২০ + ৬৩৮ = ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং 'সতীময়না' কাব্যটি দৌলতকাজী আরম্ভ করেন আনুমানিক ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এবং আলাওলের হাতে কাব্যটি সমাপ্ত হয় মোটামুটি ১৬৫৮ - ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

১২.৪ ঃ রচনাসমূহের পরিচয়

আরাকানরাজ সুধর্মা ও রাজমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের নির্দেশে তিনি অনেকগুলি কাব্যরচনা করেন। তবে এগুলি সবই অনুবাদমূলক, মৌলিক সৃষ্টি হয়।

কবি রচিত 'সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল' (১৬৫৮ - ৭০) ইসলামীয় রোমান্টিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এর নায়ক সয়ফুলমূলক ও নায়িকা বদিউজ্জামাল। মানব নায়কের সঙ্গে পরী প্রেমিকার মিলন কাহিনি রচিত হয়ে বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নলোকের এক মায়াময় জগৎ তৈরী হয়েছে এই কাব্যে। এটি রচনার সময়ের কবি দুর্ভাগ্যবশতঃ কারারুদ্ধ হন। এই কাব্যের 'আত্মপরিচয়' অংশে সেই নিগ্রহের কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে। ১৬৬০ সালে রচিত 'হপ্তপয়করে' আরবের রাজকুমার বাহরামের যুদ্ধ জয়ের কাহিনি বর্ণিত। এখানেও সপ্তপরীর প্রসঙ্গ আছে। ইরাণীয় কবি নেজামি সমরকন্দের 'সপ্তপয়কর' গ্রন্থ অবলম্বনে আলাওল 'হপ্তপয়কর' রচনা করেন।

১৬৬৩ - ৬৪তে আলাওল তোহফা রচনা করেন। এটি রচনাকালে কবি নিজের বার্দ্ধক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এটি ফার্সীনীতি কাব্য 'তুহফাতুন্নেসা' গ্রন্থের অনুবাদ। তাঁর সর্বশেষ কাব্য 'সেকেন্দারনামা' আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার নির্দেশে ১৬৭২-এ রচিত হয়। এই গ্রন্থটি নেতাজি সমরকন্দের ফার্সীকাব্য 'ইসকান্দার নামা'র সরস অনুবাদ। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সমরাভিযান ইস্‌লামীয় কায়দায় বর্ণিত হয়েছে এখানে। ফলে প্রচুর যুদ্ধ বিগ্রহ ও রূপকথাধর্মী অনেক গল্পে গ্রন্থটি পূর্ণ। নেজামির ভাষা কিছু কর্কশ বলে মুসলমান সমাজে গ্রন্থটির তেমন প্রচার ছিল না। কিন্তু আলাওল জানতেন — ''ভাঙ্গিয়া কহিলে তাতে আছে বহু রস।'' কবি চেষ্টাও করেছিলেন রসগ্রাহীরূপে কাব্যটি পরিবেশন করতে। কিন্তু বাদ্ধর্ক্যের কারণে উৎকৃষ্ট কাব্যগুণে তা ভূষিত হতে পারে নি।

আলাওলের উল্লেখিত কাব্যগুলি ইসলাম সমাজ ও ধর্মের নিজস্ব সম্পদ। তাই তা হিন্দু সমাজে প্রচারিত হয়নি। তবে যে কাব্যটির জন্য আলাওলের খ্যাতি সুবিদিত, সেটি হলো অযোধ্যার জায়স গ্রামের অধিবাসী মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে রচিত কাব্য 'পদ্মাবতী' (১৬৪৬), অর্থাৎ 'পদুমাবৎ' (১৫৪০) রচনার প্রায় একশত বছর পরে 'পদ্মাবতী' অনুদিত হয়। মাহাঅমাত্য মাগন ঠাকুর কবিকে বলেন যে, জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্য হিসেবে চমৎকার, কিন্তু আরাকানের লোক

হিন্দুস্থানী ভাষা বুঝতে পারে না। সুতরাং আলাওল যদি বাংলা ছন্দে ঐ কাব্য রূপান্তরিত করতে পারেন তাহলে তা সকলের রসাস্বাদন যোগ্য হয়। আলাওল নানা বিদ্যা ও ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তবু মাগনের নির্দেশে কাব্য রচনাকালে তিনি বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন — ''নিজ বুদ্ধি বলে নাহি এতেক শকতি।'' হিন্দী চৌপাই ছন্দ ভেঙে বাংলা পয়ার ত্রিপদীতে 'পদ্মাবতী' রচিত হলো। মন্তব্য

'পদ্মাবতী' কাব্যটির মূল আবেদন এর মানবপ্রেম। এছাড়া রূপকথাধর্মিতাও এর স্থানে স্থানে আছে। তথাপি সুফী মতাবলম্বী আলাওল কাব্যের বহু স্থলে আধ্যাত্মিক কথাও বলেছেন। প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যায় কবি যখন বলেন — ''প্রেমভাবে সংসার সৃজিল করতার।'' — তখন তা নিছক মর্ত্যপ্রেমের বাণীময় প্রকাশ হয়েই থাকে না। কিম্বা সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিগুলি

'প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখে প্রেম হস্তে বশ।।
যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর।।'

— এই প্রেমতত্ত্ব সুফী আদর্শকেই স্মরণ করায়। যোগদর্শনে অধিকারী কবিও অনেকস্থলে সহজ ভাষায় যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

১২.৫ ঃ পদ্মাবতী কাব্যের পরিচয়

'পদ্মাবতী' অনুবাদ গ্রন্থ হলেও অনুবাদজনিত আড়ষ্টতার থেকে তা মুক্ত। গ্রন্থটি হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই জনপ্রিয়। সিংহল রাজকন্যা ও মেবারের রাণী পদ্মাবতী ও পদ্মিনীর রূপেগুণে মুগ্ধ হয়ে আলাউদ্দীন তাঁকে বাহুবলে অধিকার করার জন্য চিতোর আক্রমণ করেন এবং স্বীয় সতীত্বধর্ম রক্ষার জন্য পদ্মিনী জহরব্রতে আত্মত্যাগ করেন — এই হলো পরিচিত কাহিনি। আলাওল এর মধ্যে আরও নতুন কিছু কাহিনি বা ঘটনা ও চরিত্র সংযুক্ত করেন। যেমন চিতোরের রাণা রত্নসেনের প্রথমাপত্নী নাগমতী থাকা সত্ত্বেও হিমামন তোতা পাখির কাছে পদ্মাবতীর অনুপম রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে রাণা বহু প্রতিকূলকতার মধ্য দিয়ে সিংহলে উপস্থিত হন এবং প্রচুর শ্রমসাধ্য প্রয়াসে পদ্মাবতীকে লাভ করেন। তারপর সামুদ্রিক বাধা-বিপদ অতিক্রম করে সিংহল থেকে চিতোরে প্রত্যাবর্তন করে তিনি নাগমতীর বিরহ বেদনার অবসান ঘটান। ইতিমধ্যে রাঘবচেতন নামক এক যাদুকরকে রত্নসেন শাস্তি দিলে সে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মিনীর রূপ-গুণ ব্যাখ্যা করে রত্নসেনকে বিপদে ফেলতে সচেষ্ট হন। আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করেন এবং কৌশলে রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লীতে অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে গোরা ও বাদল নামে দুই রাজভক্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে রাণাকে গোপনে উদ্ধার করে চিতোরে নিয়ে আসেন। কিন্তু গোরা বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দেন। পরে বাদলের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে আহত রাজা প্রাণত্যাগ করেন। নাগমতী ও পদ্মাবতী সহমৃতা হন। লক্ষণীয় যে, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মানুষের প্রেম ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের যে কাহিনি লিখেছেন আলাওল তাতে ঐতিহাসিক উপাদান যেমন আছে, তেমনি আছে রূপকথাধর্মিতা, — যা হিরামন পাখি, রাঘবচেতন, দেবপাল প্রভৃতি চরিত্র ও কাহিনির দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্যে লোককথার আদর্শও আছে। বহু ভাষাবিদ ও শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত কবি আলাওলের বহুমুখী প্রতিভার নিদর্শন ধারণ করে আছে এই কাব্য। অলংকার, ছন্দ, ভাষা ও শব্দ প্রয়োগেও তিনি ছিলেন সচেতন শিল্পী। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ সুভাষিতাবলী ও প্রবাদবাক্যেরও প্রচুর ব্যবহার তিনি করেছেন। রাজসভার ঐশ্বর্য, ঘোড়দৌড়, শিকার, যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়কেও তিনি কাব্যের অঙ্গীভুত করেছেন। মধ্যযুগীয় ধর্মনির্ভর বাংলাসাহিত্যে মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় যে রোমান্টিক প্রণয় কাহিনি উপহার দিয়েছেন কবি তা পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষ প্রণয় কাহিনি রচনার প্রেরণাস্বরূপ হয়েছে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ''আলাওলের যে পরিমাণ বিদ্যা ছিল, সেই পরিমাণ কবিত্ব ছিল না।'' তুলনামূলক বিচারে তাই আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে দৌলতকাজীই আলাওল অপেক্ষা শক্তিশালী কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাই দৌলতের লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়নার শেষাংশ রচনায় আলাওল দৌলতের মতো পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেননি।

১২.৬ ঃ জায়সীর 'পদুমাবত' ও আলাওলের 'পদ্মাবতী'-র তুলনা

জায়সীর 'পদুমাবতে'র সঙ্গে আলাওলের 'পদ্মাবতী'র তুলনামূলক আলোচনায় স্বাতন্ত্র্যের

মন্তব্য

সূত্রগুলি সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে —

(১) উভয়ের কাহিনির মধ্যে অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে।

(২) জায়সীর কাব্য বিষাদান্তক, আলাওলের কাব্য ততটা বিষাদান্তক নয়।

(৩) জায়সী অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য রত্নসেন-পদ্মাবতীর রূপক গ্রহণ করেছিলেন, আলাওল তা করেননি। তিনি মানব-প্রেমের কাহিনি হিসেবেই মূলতঃ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

(৪) আলাওল জায়সীর কাব্য অনুবাদকালে প্রায়ই আক্ষরিক অনুবাদ করলেও ঘটনা, চরিত্র ও বর্ণনায় দু-এক স্থলে নিজস্ব কবিকল্পনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবি নিজেই বলেছেন — ''স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি।''

(৫) জায়সী মূলতঃ অধ্যাত্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। আলাওল সুফী মার্গের কবি হলেও নিছক ধর্মীয় রূপক হিসেবে কাব্যটি রচনা করেননি।

(৬) জায়সী চৌপাই ও দোহা ছন্দ ব্যবহার করেছেন, আলাওল পয়ার, ত্রিপদী ও অন্যান্য ছন্দ অবলম্বন করেছেন।

(৭) আলাওল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করেছেন, জায়সী তা একেবারেই করেননি।

(৮) জায়সী মুসলমান হলেও কাব্যের কোথাও নিজ সম্প্রদায়ের কথা বলেননি। কিন্তু আলাওল সংস্কৃত সাহিত্য, পুরাণ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হলেও মাঝে মাঝেই মুসলমান সমাজের কথা বলেছেন। জায়সীর উল্লেখিত পুরাণ, আলাওলে কোরাণ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। তাই উদারতার দিক থেকে জায়সী-ই শ্রেষ্ঠ।

(৯) জায়সী আলাউদ্দীনের সঙ্গে রত্নসেনের যুদ্ধে আলাউদ্দীনের হিন্দু সেনাপতিরা তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে হিন্দু রত্নসেনের পক্ষে গ্রহণের অনুমতি চাইলে আলাউদ্দীন তাতে সম্মতি জানিয়েছিলেন বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আলাওল লিখেছেন আলাউদ্দীন হিন্দু জাতিকে মুসলমানের বিশ্বাস করা কর্তব্য নয় বলেই হিন্দু সেনাপতির কথায় সম্মত হন।

(১০) জায়সীর কাব্যে আলাউদ্দীনের দূত একজন 'তুরুক' মুসলমান, আলাওলের কাব্যে সেই দূত একজন ব্রাহ্মণ।

(১১) জায়সীর কাব্য তত্ত্ব-প্রধান, আলাওলের কাব্য জীবনরসসমৃদ্ধ।

(১২) বিবাহ বর্ণনায় জায়সী উত্তর ভারতের রীতি অনুসরণ করেছেন, আলাওল বাংলার হিন্দু সমাজের আচার-পন্থা বর্ণনা করেছেন। আলাওলের স্ত্রী চরিত্রগুলি বঙ্গললনার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে।

১২.৭ ঃ আলাওলের কবি কৃতিত্ব

কবি আলাওল বহু গ্রন্থের রচয়িতা এমন ইঙ্গিত বিভিন্ন লেখায় পাওয়া গেলেও, বাস্তবে এখনও পর্যন্ত তার রচিত অধিকাংশ পুস্তকই আবিস্কৃত হয়নি বলেই অনুমান করা হয়। এখন পর্যন্ত কবির যে ক'টি গ্রন্থের প্রকাশ এবং পরিচয় পাওয়া গেছে সেগুলো হচ্ছে ১) পদ্মাবতী, ২) সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, ৩) সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী, ৪) সপ্তপয়কর, ৫) তোহফা, ৬) সেকান্দর নাম, ৭) সঙ্গীত শাস্ত্র (রাগতাল নামা) ও ৮) রাধাকৃষ্ণ রূপকে রচিত পদাবলী। তার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য হিসেবে বিবেচিত হয় পদ্মাবতী। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর রচিত বিখ্যাত হিন্দি কাব্য 'পদুমাবত'-এর স্বাধীন অনুবাদ করে রচিত হয় 'পদ্মাবতী' কাব্য। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ সাদ উমাদার বা থদোমিন্তারের আমলে (১৬৮৫ - ৫২) কোরেশী মাগন ঠাকুরের আদেশে তিনি এ কাব্য রচনা করেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে ক'জন প্রভাবশালী কবি কাহিনী রূপায়ন, চরিত্র নির্মাণ এবং প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যপূর্ণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন আলাওল এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কৃতিত্বের দাবিদার। আধ্যাত্মরসের একটি কাব্যকে মানবিক রসপূর্ণ কাব্যে রূপায়নের ক্ষেত্রে আলাওলের দৃষ্টি এখানে নিবদ্ধ হতে দেখি আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগের দিকে। কবি তাই বলেছেন 'স্থানে স্থানে প্রকাশিলু নিজ মন উক্তি।' পদ্মাবতী কাব্যটি প্রেমমূলক ঐতিহাসিক কাব্য হলেও এতে প্রেমের স্বরূপই প্রাধান্য পেয়েছে, ইতিহাস নয়। চিতোরের রাণী পদ্মিনীর কাহিনি এ কাব্যে রূপায়িত হয়েছে। অপূর্ব সুন্দরী পদ্মাবতীর স্বামীর নাম রতন সেন। রাঘবচেতন নামের জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চিতোরের রাজসভায় একদা লাঞ্ছিত হন। সুযোগ বুঝে তারই প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দিল্লির সম্রাট আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মাবতীর অপরূপ রূপের প্রশংসা করে সম্রাটকে প্ররোচিত করেন পদ্মাবতীকে

অপহরণ করতে। রতন সেনের কাছে পদ্মাবতী সম্বন্ধে অনুরূপ প্রস্তাব দিয়ে আলাউদ্দীন প্রত্যাখ্যাত হন এবং প্রতিশোধ নিতে চিতোর আক্রমণ করেন। উভয়পক্ষের যুদ্ধে রতন সেন বন্দি হন। কিন্তু বিশ্বস্ত অনুচরদের সাহায্যে তিনি আবার মুক্ত হন। এরপর রাজ দেওপালের সাথে যুদ্ধ বাঁধে রতন সেনের। এ যুদ্ধে দেওপাল নিহত হন এবং আহত হন রতন সেন। এ সময় সুযোগ বুঝে আলাউদ্দীন পুনরায় চিতোর আক্রমণ করেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই রতন সেনের মৃত্যু হয় এবং সহমৃতা হন পদ্মাবতী। যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আলাউদ্দীন চিতোর পৌঁছে দেখতে পেলেন পদ্মাবতী-রতন সেনের জ্বলন্ত চিতা। তাই চিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি ফিরে গেলেন দিল্লি। আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের কাহিনি ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তাতে পদ্মিনী সংক্রান্ত কোন কথার উল্লেখ নেই। যৎসামান্য ইতিহাস ভর করে দেশের চারণ কবিরা রাজপুত-বীরদের যে গল্প কাহিনি গেয়ে বেড়াতেন কবি জায়সী হয়তো বা তারই রূপ বর্ণনা করে রচনা করেছিলেন পদুমাবত কাব্য। এ কারণে জায়সীর কাব্যে সবসময় ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্মমতে সুফী সাধক এবং কাব্যকলা বিচারে রোমান্টিক আখ্যান লেখক ছিলেন কবি জায়সী। মূলতঃ তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই রূপক প্রকরণ গ্রহণ করেছিলেন।

রূপক কাব্য হিসেবেই রচিত হয়েছিল কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদুমাবত। অতি অল্প সময়েই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল প্রতিভাবান এই লেখকের হাতে ঠেট ভাষায় রচিত অতি সহজ বুলি, গল্পরসপূর্ণ ও সুক্ষম তত্ত্বসমন্বিত কাম-প্রেমকথা সম্বলিত কাব্য। আর তাই পদুমাবত হয়ে উঠেছিল প্রেমিকের কাছে প্রেম ও কামতত্ত্ব, ভাবুকের কাছে জীবাত্মা-পরমাত্মা বিষয়ক তত্ত্বের আকর, আর সাধারণ বইপ্রেমী পাঠকের কাছে বাস্তব ঘটনামিশ্রিত রসকাব্য হিসেবে পরিচিত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন 'পদ্মাবতী উপাখ্যান মালিক মুহম্মদ জায়সীর নানা সময়ের নানা ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক বৃত্তান্তে জোড়া দেওয়া একটি কাব্যমাত্র। তিনি ইতিহাস লিখিতে বসেন নাই। তিনি তাঁহার কাব্যে সুফী মতের ব্যাখ্যার জন্য আদি রসের আবরণে এক আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য রচনা করিয়েছেন।' এই জায়সীকেই অনুসরণ করেছেন কবি আলাওল। এ কারণে পদ্মাবতী কাব্যে ইতিহাসের ছায়া লক্ষ্য করা গেলেও ইতিহাস নির্ভর নয়, বরং কবির লক্ষ্য ছিল প্রণয়োপাখ্যান রচনার দিকেই। জায়সী ছিলেন সুফী এবং প্রেমমার্গীয় অধ্যাত্ম রসের কবি। রোমান্টিক কাব্যের রূপকের অন্তরালে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাত্ম তত্ত্বের স্বরূপ। কবি জায়সীর রূপক অর্থে চিতোর হচ্ছে দেহ, মন রাজা, সিংহল হৃদয়, পদ্মিনী বুদ্ধি, শুক পাখি গুরু, নাগমতী জগতের রূপ বর্ণনা আর আলাউদ্দীন হচ্ছে মায়াবদ্ধ জীব। প্রেম নিষ্ঠা ছিল বলেই রতন সেন পদ্মাবতী লাভ করতে পেরেছেন, কিন্তু দেওপালের প্রেমে ছিল পার্থিব বাসনা, তাই তার পক্ষে পদ্মাবতী লাভ সম্ভব হয়নি। এ বৈশিষ্ট্য স্রষ্টা লাভের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। কবি হিসেবে আলাওল সুফী মতানুসারী হলেও তার রচিত 'পদ্মাবতী' হচ্ছে প্রকৃত মানবপ্রেমের কাহিনী। জায়সী ও আলাওলের রচনাদর্শ সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেছেন 'জায়সীর অভিজ্ঞতা ও আলাওলের অভিজ্ঞতা এক নয়। জায়সীর মানস পরিমণ্ডল গঠনে ধ্যান ছিল, সাধনা ছিল। তিনি আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাকে অঙ্গীকার করে কাহিনি পরিকল্পনা করেছেন। আলাওল জায়সীর কাব্যের রূপকতত্ত্ব বুঝতে পারেননি এমন নয়, তিনি অনুবাদে তা রক্ষা করতে পারেন নি। এমনও হতে পারে রাজসভার বিলাসী, বর্ণাঢ্য রঙ্গপ্রিয় পাঠকেরা গল্পের আনন্দ চেয়েছিলেন, তত্ত্বের গরিমা চাননি। আলাওল কাহিনির গ্রহণ-বর্জন করে পাঠকের মানসিক সে চাহিদা পূরণ করেছেন।'

আলাওল পদ্মাবতী রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে জায়সীর উপর নির্ভরশীল হয়েও বর্ণনা পদ্ধতিতে বিশিষ্টতা এনে এবং বিশেষ কিছু সংযোজনের মাধ্যমে স্বকীয়তার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। উভয়ের কাহিনীতেও লক্ষ্য করা যায় পার্থক্য। আলাওল কোন কোন ক্ষেত্রে হেঁটেছেন মূল ছেড়ে ভিন্ন পথে, আবার কোথাওবা সংযোজন করেছেন নতুন অধ্যায়, পরিবর্তিত হয়েছে বর্ণনার ধারাও। রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অনুসরণ করেছেন অনুবাদের পথরেখা, তবে সেখানেও তিনি নিজস্ব ভাব কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন যথেষ্ট পরিমাণে। তার কাব্যের সর্বত্রই পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিচয় সুস্পষ্ট, কারণ তার অনুবাদের প্রায় সবটাই হচ্ছে ভাবানুবাদ। কবি আলাওল হচ্ছেন পণ্ডিত কবি। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে তার কাব্যে। কবি আলাওল রতন সেন সম্পর্কে যা লিখেছেন তা তার পাণ্ডিত্য সম্পর্কেও বিবেচিত হতে পারে সত্য রূপে ঃ

'শাস্ত্র ছন্দ পঞ্জিকা ব্যাকরণ অবিধান।
একে একে রতন সেন করিল বাখান।।
সঙ্গীত পুরাণ বেদ তর্ক অলঙ্কার।
নানাবিধ কাব্যরস আগম বিচার।।
নিজে কাব্য যতেক করিল নানা ছন্দ।
শুনিয়া পণ্ডিতগণ পড়ি গেল ধন্দ।।
সবে বলে তান কণ্ঠে ভারতী নিবাস।

কিবা বররুচি ভবভূতি কালিদাস।।'

এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত এই যে 'বাস্তবিক তাহার সমান নানা বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত সে যুগে আর কেহই ছিল না।' আলাওলের পাণ্ডিত্যের বিচিত্র প্রকাশ তার পদ্মাবতী কাব্যে লক্ষণীয় বিষয়। তিনি সর্বক্ষেত্রে জায়সীর উত্তরাধিকার নন। তার নিজস্ব জ্ঞান ভাণ্ডারের বিচার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। বিশেষ করে চিকিৎসাশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, চৌগান খেলা, অষ্টনায়িকাভেদ শাস্ত্র, অশ্বচালনা বিদ্যা, বিবাহাচার, সঙ্গীত শাস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে আলাওলের মৌলিক জ্ঞানের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। বিভিন্ন বিষয়ে রচিত কাব্যের পংক্তিতে পংক্তিতে প্রকাশ ঘটেছে আলাওলের পাণ্ডিত্য। প্রেম, রূপ, জ্যোতিষশাস্ত্র মতে যাত্রার শুভ-অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে পদ্মাবতী কাব্যে তার নিজস্ব কবিত্ব শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনার একটি স্তবক উদ্ধৃত করা হলো —

'প্রভারুণ বর্ণ-আখি সুচারু নির্মল।
লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলোৎপল।।
কাননে কুরঙ্গ জলে সফরী লুকিত।
খঞ্জন গঞ্জন নেত্র অঞ্জন রঞ্জিত।।
আঁখিত পুত্তলি শোভে রক্ত স্বেতান্তর।
তুলিতে কমল রসে নিচল ভ্রমর।।
কিঞ্চিত লুকিত মাত্র উথলে তরঙ্গ।
অপাঙ্গে ইঙ্গিতে হএ মুনিমন ভঙ্গ।।'

পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনায় কবির স্বকীয় কবিত্ব শক্তির বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে তাকে মধ্যযুগের অপরাপর সকল কবির ঊর্ধ্বে স্থান করে দেয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবি প্রতিভার তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেছেন 'অন্যান্য কবির গুণগুলো কমবেশি আলাওলের মধ্যে আছে, কিন্তু আলাওলের সব গুণ একত্রে কোন কবির মধ্যে নেই। আলাওল গীতিকবি, আখ্যানকবি, তাত্ত্বিক কবি। তিনি সাধক ও গায়ক। তিনি বহুভাষাবিদ, বহুশাস্ত্রবিদ। এক কথায় তিনি রাজসভার পণ্ডিত কবি। কবিত্বের সামগ্রিক বিচারে আলাওল 'মহাকবি' আখ্যায় ভূষিত হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য।'

ড. দীনেশচন্দ্র সেন আলাওলের কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন 'কবি পিঙ্গলাচার্যের মগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্ট মহাগণের তত্ত্ববিচার করিয়াছেন, খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা ও কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্ট নায়িকাভেদ ও বিরহের দশ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজি কথা শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লগ্নাচার্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, একজন প্রবীণা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশান্তি বন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া ধরিয়াছেন।' তবে কোথাও কোথাও কবি পাণ্ডিত্যের গভীরতায় নিমজ্জিত হয়ে কাব্যকলার দাবি গৌণ করে দেখায় কেউ কেউ তাকে পাণ্ডিত্যভারে পীড়িত বলেও মন্তব্য করেছেন।

আরাকান রাজার প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় ১৬৫৮ ক্রীষ্টাব্দে কবি আলাওল 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান' রচনা আরম্ভ করে মাগন ঠাকুরের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে রচনা বন্ধ করে দেন। পরে আনুমানিক ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ মুসার অনুরোধে তা সমাপ্ত করেন। এটি তার দ্বিতীয় কাব্য। দৌলতকাজীর অসমাপ্ত গ্রন্থ 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী'র অবশিষ্টাংশ আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার অমাত্য সোলেমানের উৎসাহে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন আলাওল। এটি তার তৃতীয় রচনা। তবে এতে তার নিজস্ব সংযোজন হিসেবে 'রতনকলিকা আনন্দবর্মার উপাখ্যান' খ্যাত। পারস্য কবি নিজামী গঞ্জভীর 'হপ্তপয়কর' কাব্যের অনুবাদ করেন আলাওল। অন্যান্য কাব্যের মত এটিও তার ভাবানুবাদ। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজার সমরমন্ত্রী সৈয়দ মুহম্মদের অনুরোধে 'সপ্তপয়কর' নামে এ কাব্য রচনা করেন। এটি আলাওলের চতুর্থ কাব্য।

বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ ইউসুফ গদা দেহলভীর 'তোহফাতুন নেসায়েহ' নামক ফাকসি গ্রন্থের অনুবাদ 'তোহফা' আলাওলের পঞ্চম গ্রন্থ। ১৬৬৪ সালে তিনি এ কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যে কবি নিজের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন —

'মুই আলাওল হীন দৈববশ অনুদিন
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকাল।'

শ্রীমন্ত সোলেমানের অনুরোধে রচিত এ গ্রন্থটি ইসলাম ধর্মের তত্ত্বোপদেশপূর্ণ। কাব্যাকারে রচিত হলেও মূলতঃ ধর্মীয় নীতি কথাই এতে প্রাধান্য পেয়েছে। পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে মুসলমানদের ধর্ম-আচার-আচরণ কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়।

মন্তব্য

এরপর তিনি রচনা করেন নিজামী গঞ্জভীর ফারসি 'সেকান্দর নামা' অনুবাদের মাধ্যমে 'সেকান্দর নামা' কাব্যটি। এটি তার ষষ্ঠ গ্রন্থ। আরাকানরাজ চন্দ্র সুধর্মার নবরাজ উপাধিধারী মজলিস নামক জনৈক অমাত্যের ইচ্ছায় এটি রচিত হয়। সম্ভবত ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে কবির অতি বৃদ্ধ বয়সের রচনা এটি। কবি তখন শোকতাপ ও অর্থকষ্টে বিপর্যস্ত। সেকান্দর বা আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় এ কাব্যের মূল কাহিনি। আলেকজাণ্ডারের পিতা ফিলিপ, শিক্ষাগুরু ও মন্ত্রী আরস্ততালিশ (আরিস্টটল), পারস্যরাজ দারা বা দরায়ুস প্রভৃতির কাহিনি এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া একজন সঙ্গীতবিদ হিসেবে তিনি সঙ্গীত শিক্ষাদানের প্রয়োজনের তাগিদে রচনা করেন রাগতালের ধ্যান ও ব্যাখ্যা। এসময় তিনি কতিপয় গানও রচনা করেন। এগুলো তার মৌলিক রচনা। এছাড়া তিনি বাংলা ও ব্রজবুলিতে বৈষ্ণব পদও রচনা করেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় কবি আলাওলের কাব্য সাধনা ছিল মূলতঃ অনুবাদমূলক। তবে অনুবাদে তিনি মূলের হুবহু অনুকরণ কিংবা আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। করেছেন ভাবানুবাদ। প্রয়োজন মতো তাতে তিনি সংযোজন ও বর্জন করেছেন দক্ষতার সাথে। তাই তার অনুবাদেও মৌলিক রচনার অহংকারের স্ফূরণ ঘটেছে। তার কাব্যসমূহের পর্যালোচনা ও পণ্ডিতদের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায় কি জ্ঞানের প্রাচুর্যে, কি ভাষা জ্ঞানের দক্ষতায়, কি শব্দ সম্ভারের ব্যাপকতায়, কি শিল্পকুশলতায় সমৃদ্ধ আলাওলের রচনা সম্ভার তার শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচয় বহন করে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কবিকূলের শিরোমণি আলাওল।

পদ্মাবতী কাব্যটি আলাওলের সর্বপ্রণিধান্য সাহিত্যকৃতি। পদ্মাবতী কাব্যটি মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি পদুমাবৎ কাব্যের ভাবমূলক। অনুবাদধর্মী হলেও পদ্মাবতীর ভাষা, নাগরিক রুচি-শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানবিকতা অনন্যসাধারণ হয়ে ফুটে উঠেছে সর্বত্র; ফলে মৌলিকতার মর্যাদায় সমাসীন। এ কাব্যে বিধৃত জ্ঞান-গভীরতায় অনেকে আলাওলকে পণ্ডিতকবি হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যটি ইতিহাস-আশ্রিত ও সুফিতত্ত্বভিত্তিক। ভগবত পুরাণকেন্দ্রিক বাঙালি জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলি ধারায় বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের উত্থান, যা পরবর্তী চৈতন্যদেবের মধ্যে দিয়ে বাঙালির কাছে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। সম্ভবত জয়দেবকালীন বৈদিক তত্ত্বের নব-রূপায়ণে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের প্রচার ও প্রসারের বিপরীতে জায়সী সুফিতত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সুফিতত্ত্ব, বৈদিক আত্মা-পরমাত্মাবাদ বা ভগবত ও নব্য বৈষ্ণববাদের মধ্যে ভাষা-রূপক ছাড়া মূল এক ও অভিন্ন। জায়সীর কাব্যবিন্যাসে স্থান-কাল-পাত্রকে ভারতীয় প্রেক্ষাপট রেখে সুফিবাদী রূপকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। অন্যদিকে আলাওলের পদ্মাবতী মানবীয় আখ্যান; সঙ্গে সুফিবাদী ও বৈদিক ঘরানাজাত পরমাত্মিক তত্ত্বের মিশ্রণ ঘটেছে। কারণ কাব্যে মহাদেবের অবস্থান; রাধা-কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পদুমাবৎ ভারতবর্ষের খিলজি শাসনকালীন ইতিহাস-আশ্রিত। পদুমাবৎ কাব্যের ইতিহাস সত্যতা অনেকেই অস্বীকার করেন। সেজন্য সুফিবাদী রূপকতাকেই সর্বজনে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। পদুমাবৎ গ্রন্থটি সাধারণত পাওয়া যায় না, বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনির ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। যা হোক, পদুমাবৎ কাব্যের ঘটনার নির্যাস এরকম — রাজা রতন সেনের স্ত্রী পদ্মাবতী। পদ্মাবতী অপরূপ সুন্দর। একবার চিতোরের রাজা রতন সেন তাঁর পরিষদে রাঘবচেতন নামে এক ব্রাহ্মণকে অপমান করেন। অপমানের প্রতিশোধ নিতে ব্রাহ্মণ দিল্লির বাদশাহ আলাউদ্দীনকে পদ্মাবতীর রূপ-গুণের নানা প্রশংসা করে পদ্মাবতীকে হরণে অনুপ্রাণিত করে তোলেন। দিল্লির বাদশাহ আলাউদ্দীন রতন সেনকে অনুরূপ প্রস্তাব পাঠান। রতন সেন এতে খুব অপমানিত হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ফলে আলাউদ্দীন ও রতন সেনের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। যুদ্ধে রতন সেন বন্দি হলেও নানা কৌশলে মুক্তি ঘটে। পরে দেওপালের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে দেওপাল নিহত ও রতন সেন আহত হন। সে সুযোগে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করেন। আলাউদ্দীন বিজয়ী বেশে চিতোর রাজপ্রাসাদে পৌঁছলে দেখতে পান, রাজা রতন সেন মারা গেছেন এবং পদ্মাবতী স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় দাহ হচ্ছে। আলাউদ্দিন চিতার প্রতি সনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করে ফিরে আসেন। জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যটি সম্পূর্ণ রূপকাশ্রিত। ইতিহাসভিত্তিক হলেও ইতিহাস সত্যকে ছাপিয়ে সুফিদর্শনজাত তত্ত্বীয় জীবনবাস্তবতা বিশ্লেষিত।

১২.৮ ঃ সপ্তদশ শতকের অন্যান্য মুসলমান কবিগণ

আলাওলের নামে আরও অনেকগুলি কাব্য প্রচলিত আছে বলে মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও ড. এনামুল হক মন্তব্য করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো — 'রাগতালনামা' সপ্তদশ শতাব্দীর এই দুজন মুসলমান কবি ছাড়াও চট্টগ্রাম-আরাকান-ত্রিপুরা-নোয়াখালি অঞ্চলে আরও অনেক

মন্তব্য

বাঙালি মুসলমান কবি এই শতাব্দীতেই সাহিত্য কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বৈষ্ণব পদ রচনা করে ধর্মনিরপেক্ষ উদার মানসিকতার পরিচয় দেন। এঁদের মধ্যে সৈয়দ মর্তুজা, আলীরাজা, আলী মিঞা, নসির মামুদ, আকবর আলী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁরা কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত না হলেও চৈতন্যদেবের উদার মানবধর্মের প্রভাবে পদ রচনায় ব্রতী হন। সহজ সুরে প্রাণের আবেগ উৎসারিত হয়েছে তাঁদের সেই পদগুলিতে। আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দুর ধর্ম, শাস্ত্র সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁদের মধ্যে নসীর মামুদ অন্যতম। তাঁর 'চলত রাম সুন্দর শ্যাম' পদটির কথা অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে। সেখানে শ্যামের চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন কবি — ''চরণে শরণ দান রি।'' কিম্বা কবি সৈয়দ মর্তুজা যখন বলেন —

'নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি।।'

তখন ভক্ত মহাজনের প্রাণের আকৃতিই পরিস্ফুষ্ট হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের মধ্যে আবদুল হাকিমের 'ইউসুফ-জোলেখা', 'লালমতী সয়ফুলমুলুক', মীর মোহম্মদ সফীর 'নুরনামা', শেখ চান্দের 'রসুলবিজয়' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। শেখ চান্দের 'হরগৌরী সংবাদ' সাদেক আলির 'রামচন্দ্রের বনবাস' এবং শেখ মোহাম্মদ হোসেনের চাণক্য শ্লোকের অনুবাদ কবিদের ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার পরিচয়বাহীরূপে ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করছে। এঁদের মধ্যে কোরেসী মাগনের 'চন্দ্রাবতী' কাব্যটিও সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কারো কারো মতে এই কোরেশী মাগনই মাগন ঠাকুর। 'চন্দ্রাবতী' রূপকথাধর্মী একটি আখ্যানকাব্য। ভদ্রাবতীর রাজা চন্দ্রসেনের পুত্র বীরভানের সঙ্গে সরন্দ্বীপের (সিংহল) রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর প্রণয় কাহিনি এখানে রূপকথার আদলে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে সমাপ্তি ছিল জানা যায় না। তবে কবি যে-ই হোন না কেন কাব্যটির ভাষা, ছন্দ ও বর্ণনাকৌশল বেশ প্রশংসনীয়। যেমন একটি ঝড়ের বর্ণনা —

'দৈবগতি অলক্ষিতে তুফান হইল।
লবণসমূহ মধ্যে তরঙ্গ উঠিল।।
একে ঘোর আর নিশি হইল তুফান।
আর সমুদ্রের জন্তু উঠে তুরমান।।'

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিরা মূলতঃ ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক প্রণয়-আখ্যান রচনাতেই অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। তবে অন্য ধরণের কাব্যও তাঁরা এরই পাশাপাশি রচনা করেন। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ কীভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাধনায় বাঙালি হিন্দুর ধারা অনুসরণ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সমন্বয় পরিকল্পনা করেছিলেন তা সমাজ-ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবেই বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। এঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওে হিন্দুর ধর্ম দর্শন ও হিন্দুর দেবদেবীকে হিন্দুর মতোই শ্রদ্ধা করেছেন এবং ''সাহিত্যে তাহার স্বীকৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।''

১২.৯ ঃ অনুশীলনী

১) কবি সৈয়দ আলাওল ও তাঁর রচনা সমূহের পরিচয় দিন।

২) আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত কাব্যধারার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করুন।

৩) সপ্তদশ শতাব্দীর প্রণয়মূলক আখ্যান কাব্যগুলির রচয়িতাদের সাহিত্যানুরাগ ও জীবনবোধের পরিচয় দিয়ে তাঁদের রচিত যেকোনো একটি কাব্য অবলম্বনে পরিস্ফুট করুন।

৪) রোমান্টিক প্রণয় কাব্য রচনায় সৈয়দ আলাওলের সাফল্যের পরিচয় দিন।

৫) আলাওলের ঘাত-প্রতিঘাত পূর্ণ জীবন কিভাবে তাঁর সাহিত্যকর্মকে প্রভাবিত করেছে তা তাঁর রচিত কাব্য অবলম্বনে পরিস্ফুট করুন।

৬) সৈয়দ আলাওল রচিত পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনি ও রচনা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।

৭) জায়সীর পদুমাবত কাব্য ও আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের তুলনামূলক বিচার করুন।

৮) আলাওলের অনুদিত কাব্য অন্ধ অনুকরণ নয়, তা কবির স্বকীয়তা ও মৌলিকতায় উজ্জ্বল — আলোচনা করুন।

মন্তব্য

১২.১০ ঃ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) — সুকুমার সেন।
২) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম — সুখময় মুখোপাধ্যায়।

মন্তব্য

একক ১৩ - পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাস - সংজ্ঞা - শ্রেণিবিভাগ - উপকরণ - গঠন - লিপিকার - আদর্শ - পুঁথি

বিন্যাসক্রম

১৩.১ ঃ উদ্দেশ্য।

১৩.২ ঃ পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাস।

১৩.৩ ঃ পুঁথির সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস।

১৩.৪ ঃ পুঁথির উপকরন।

১৩.৫ ঃ পুঁথির গঠন-প্রকৃতি।

১৩.৬ ঃ পুঁথির লিপিকর ও পাঠক / গায়েন।

১৩.৭ ঃ আদর্শ পুঁথি।

১৩.৮ ঃ অনুশীলনী।

১৩.৯ ঃ গ্রন্থপঞ্জি।

মন্তব্য

১৩.১ ঃ উদ্দেশ্য

পুঁথি হল মুদ্রণ আবিষ্কৃত হবার পূর্বে মানুষের হস্তলিখিত বর্ণমালায় গাছের পাতা, বাকল, পশুচর্ম বা তুলোট কাগজের উপর (প্রাচীন কালে মাটির টালিতেও লেখা হত) লিখিত বক্তব্য। সেই বক্তব্য হতে পারে ধর্মীয় অনুশাসন, রাজা-পরিচালনা-বিধি, আইন, কৃষি-ব্যবস্থার নির্দেশ, দানপত্র, রাজপ্রশস্তি, দেব-দেবী কেন্দ্রিক আখ্যান, ধর্ম গ্রন্থ, কাব্য, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ইত্যাদি যে কোনো বিষয় কেন্দ্রিক।

মানুষ তার বক্তব্য বর্ণমালায় বিধৃত করবার আকাঙ্খা করে এবং এইভাবে তাকে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করে বলেই পুঁথির আবির্ভাব হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য মানেই পুঁথি। বাংলা সাহিত্যের অতীত ইতিহাসকে জানতে হলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুঁথির সন্ধান অবশ্যই দরকার।

ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে এই পুঁথি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বহন করে এসেছে। এগুলি থাকত ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা, মন্দির ও বৈষ্ণবদের পাটে। ব্রাহ্মণরা নিজের পুঁথি রাখতেন নিজেদের টোলে। ভদ্র মুসলমানের গৃহে, মসজিদে ও মাদ্রাসায় থাকত কোরানের পুঁথি; কখনও কখনও সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের লিখিত পুঁথি বা পীরের পুঁথি। হিন্দু সমাজের সকল স্তরে থাকত বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, চৈতন্য-জীবনী, শ্রীমদ্‌ভাগবৎ, বৈষ্ণব-পদাবলি ও শাক্তপদাবলির পুঁথি।

সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এবং গ্রামাঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নিয়মিত পুঁথি পাঠ ও কথকতার আসর বসত।

এই পুঁথি সম্পর্কে বিভিন্ন দিক জানবার আছে। পুঁথি প্রস্তুত করতে প্রয়োজন হত বিভিন্ন উপকরণ। পুঁথিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল লিপিকর-সম্প্রদায়। সামগ্রিকাবে পুঁথির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট সহ এই দিকগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করাই এই একক-এর উদ্দেশ্য।

১৩.২ ঃ পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাস

আমাদের দেশের নবজাগরণ বা রেনেসাঁস সংগঠিত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। নবজাগরণ কথাটির অর্থ অনেক বিস্তৃত ও গভীর। সমাজ ও রাষ্টজীবনের সুপ্তিভঙ্গের সঙ্গে জাতি ও জীবনের অন্যতম অঙ্গ সাহিত্য ও শিল্পের নবজাগরণ ঘটল। পুরানো ধ্যান ধারণা, অতীতের কৃষ্টি ও সভ্যতা তার আচারের খোলস বর্জন করে নবজাগরণের আলোয় নতুন করে জেগে উঠল। অতীতকে জাগানোর জন্য আমাদের অতীতের সাহিত্য ও সমাজকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন ও তাগিদ অনুভূত হল। আমাদের বর্তমানকে সমগ্রভাবে ধরতে গেলে, তার উৎস ও ঐতিহ্যকে জানা অত্যন্ত জরুরি। অতীতের সবই মন্দ বলে তাকে অনাদরে অবহেলায় দূরে ঠেলে দিলে নবজাগরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। নবজাগরণের অন্যতম উদ্দেশ্যই হল — নষ্ট কোষ্ঠীর উদ্ধার। বস্তুত অতীতের কোষ্ঠী উদ্ধার করে তাকে কেন্দ্র করে আমাদের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের প্রকৃত ঐতিহাসিক ক্রম নির্ণয় করা রেনেসাঁসের অন্যতম প্রধান শর্ত। আর এই শর্তপূরণে আমাদের নবজাগ্রত শিক্ষিত চেতনা উৎসাহী হয়ে উঠল। রাজধানী কলকাতায় স্থাপিত হল এশিয়াটিক সোসাইটি, স্থাপিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাচ্য জ্ঞানবিদ্যা চর্চার সঙ্গে যুক্ত হল পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চা। পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার সোনার পরশে বিদেশী পণ্ডিত গণের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে অতীতের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের মহৎ নেশায় স্বদেশী ও বিদেশী শিক্ষিত চেতনা ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রাচীন কৃষ্টি ও সৃষ্টির উদ্ধার কল্পে। এই উদ্ধার সংগ্রহের প্রথমেই রাখা হল — আমাদের পূর্ব-পুরুষের সৃষ্টি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহকে।

সাধনা পত্রিকার ১২৯৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 'প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন — 'অন্যান্য অনেক কিছুর মতই প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহেও বিদেশীদের ভূমিকা ছিল পথিকৃর্তের'। বস্তুত বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আগ্রহেই স্যার উইলিয়ম জোনস্ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্য সাহিত্যাদি চর্চার জন্য কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্তন করেন। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য পুঁথি নির্ভর। কেবলমাত্র সাহিত্যই নয়, ধর্মগ্রন্থ, চিকিৎসাশাস্ত্র সমস্ত কিছু জ্ঞানার্জনী বিদ্যার অন্যতম বাহক ছিল পুঁথি। বৈদিক যুগ ছিল শ্রুতি নির্ভর। লিপি যুগে এল পুঁথি। মূলতঃ এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করেই আমাদের দেশে পুঁথি সংগ্রহের উদ্যোগ পর্বের সূত্রপাত।

বাংলা প্রাচীন পুঁথির ইতিহাসের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাস। পুঁথি সংগ্রহের সচেতন উদ্যোগ পর্যায়কে কয়েকটি কাল পর্বে ভাগ করে নিতে পারি ঃ

মন্তব্য

ক) উদ্যোগ পর্ব — পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টা (১৭৮০ - ১৮৫০)।
খ) দ্বিতীয় পর্ব — বাঙালি পণ্ডিত মুন্সীগণের উদ্যোগ (১৮৫০ - ১৯০০)।
গ) তৃতীয় পর্ব — বিস্তার পর্ব (১৯০০ - ১৯৫০)।
ঘ) চতুর্থ পর্ব — ১৯৫০ থেকে আদ্যাবধি।

ক) **উদ্যোগ পর্ব (১৭৮০ - ১৮৫০) ঃ-** ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় মূলত এং মুখ্যত প্রাচ্য সাহিত্য ইতিহাসাদির সংগ্রহ ও চর্চার জন্য। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই নিষ্ঠাবান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেশের নানা স্থান থেকে অজস্র পুঁথি সংগ্রহ করেন। এইসব পুঁথিগুলি শুধুমাত্র বাংলা লিপিতেই রচিত নয়, দেশীর নানা লিপি ও নানা ভাষার পুঁথি। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাথমিক পর্বে যে সকল বিদেশী প্রাচ্যবিদ্ পুঁথি সংগ্রহের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ- (১) মার্শাল, (২) জোনস্, (৩) হ্যালহেড (প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা), (৪) উইলকিন্স, (৫) গিলক্রীষ্ট, (৬) কোল ব্রুক, (৭) ইউলসন প্রমুখ।

এঁরা সংস্কৃত, আর্বী, ফার্সী, বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, সিন্ধ্রী, গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দি প্রভৃতি নানা ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় রচিত পুঁথি সংগ্রহ করেন। এঁদের দ্বারা সংগৃহীত উল্লেখযোগ্য বাংলা প্রাচীন পুঁথিগুলি হল —

১) কৃত্তিবাসের ভণিতায় রচিত রামায়ণের নানা কাণ্ডের পুঁথি।
২) কাশীরাম দাসের ভণিতায় রচিত মহাভারত-এর নানা পর্বের পুঁথি।
৩) কবি কঙ্কন মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'।
৪) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর পুঁথি।

খ) **দ্বিতীয় পর্ব (১৮৫০ - ১৯০০) ঃ-** মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর তিন-এর দশক থেকেই দেশীয় শিক্ষিত বাঙালির এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সংযোগ ঘটে। এই সময় পর্বে অর্থাৎ প্রাগ্ রবীন্দ্রযুগে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভা ও প্রশয়ে নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারে তিনজন বাঙালী বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন — এঁরা হলেন ঃ (১) রাধাকান্ত দেব, (২) রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং (৩) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (সংবাদ প্রভাকরের চক্ষুষ্মান সম্পাদক)।

দ্বিতীয় পর্বে বাঙালির উদ্যোগ সেভাবে বিস্তৃত না হলেও এই তিনজনের সক্রিয়তার বেশ কিছু পুঁথি সংগৃহীত হয়। দেশের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় এই ব্যাপারে ছিলেন নিরাসক্ত। প্রাচীন পুঁথির উদ্ধারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে আরও কয়েক দশক লেগে গেল। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পত্রিকায় বৈষ্ণব মহাজনদের অনেক পদ উদ্ধার করে প্রকাশ করেন। কবিওলাদের অনেক কবিগানও তিনি উদ্ধার করেছিলেন। মূলতঃ ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রেরণায় এবং সংবাদ প্রভাকরের দৌলতে প্রাচীন পুঁথি উদ্ধারের গুরুত্ব প্রচার লাভ করে।

গ) **পুঁথি সংগ্রহের তৃতীয় পর্ব (১৯০০ - ১৯৫০) ঃ-** এ পর্যায়ের মূল কাণ্ডারী হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছিলেন, 'দেশকে ভালো বাসিবার প্রথম লক্ষণ ও কর্তব্য দেশকে জানা'। দেশকে জানতে গেলে, দেশের মূলীভূত আত্মাকে বুঝতে গেলে — দেশের অতীতের নষ্ট কোষ্ঠীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভাষা, সাহিত্য ইতিবৃত্ত, সমাজ ও জীবনকে খুঁজে বের করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের নানা স্থানে দেশের ইতিহাস, বাঙালীর ইতিহাসকে যেমন নিজে খুঁজেছেন তেমনি জাতিকেও খুঁজে দেখার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। কারণ এসবের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জাতীয় প্রাণসত্তাটি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ সেজন্য দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন স্বদেশবাসীর সুপ্তি ভঙ্গ করতে। 'আপনি আচরিধর্ম' পালন করে রবীন্দ্রনাথ পুঁথি উদ্ধারে সর্বতোভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বহির্বিশ্বের বিদ্যাচর্চার নতুন ঢেউ তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করে তুলেছিল। 'য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন, ... বহু চেষ্টায় ধর্মমন্দির স্থিত পুস্তকালয় হইতে অনেক প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার হয়। সেই অন্বেষণ কার্য এখনো চলিতেছে' (সাধনা, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ মাঘ সংখ্যা, 'প্রাচীন পুথি উদ্ধার' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। আরও পরিণত বয়সে বিশ্বভারতীর ছাত্র/ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রসঙ্গে তাদের পুঁথি উদ্ধার কার্যে এগিয়ে আসার, নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারের গুরু দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। অনেকেই সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও বাছাই করা ছাত্রদল তাঁরই প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পল্লীর কুটীরে কুটীরে হানা দিয়ে অজস্র পুঁথি উদ্ধার ও সংগ্রহ করলেন। প্রয়োজনে অর্থের বিনিময়েও পুঁথি ক্রয় করলেন তিনি। মূলতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় এবং পরবর্তীকালে সেই প্রচেষ্টার ধারা অব্যাহত রেখে বিশ্বভারতী গড়ে তুলল এক মহতী পুঁথি সংগ্রহশালা। কেবল সংগ্রহ করেই বিশ্বভারতী তার দায়িত্ব এড়িয়ে যায় নি। সেই সব হাজার হাজার পুঁথির পাঠোদ্ধার, উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং পুঁথিগুলির বিবরণও প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

মন্তব্য

আমাদের প্রাচীন পুঁথি 'সংরক্ষিত থাকত — ক) রাজা বা জমিদারদের গ্রন্থাগারে, খ) বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান — মঠ-মন্দির-সমাধিতে, গ) সম্ভ্রান্ত নাগরিকের নিজস্ব সংগ্রহশালায়, ঘ) প্রাচীন টোল-পাঠশালায়, ঙ) সাধারণ গৃহস্থের ঠাকুর ঘরে, চ) গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে।

পৃথিবীর বৃহৎ অংশই ছড়িয়ে ছিল আমাদের গৃহস্থ সংসারে। সেগুলি অনাদরে অবহেলায়-অশিক্ষিত অথবা অসচেতন উত্তরাধিকারে নাম-গোত্রহীন হয়ে জঞ্জালের স্তূপে নিক্ষিপ্ত পতিত হয়েছিল। সেগুলি উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সে সব অনাদৃত পুঁথির উদ্ধার (এ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে, যদিও তা সামান্য অংশমাত্র — তার সংখ্যাও কম নয়) সংগ্রহের গুরুত্ব অপরিসীম। হাজার হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এসব পুঁথির মধ্যেই ধরা আছে। সাহিত্য ইতিহাসকারগণ উদ্ধারিত পুঁথি অবলম্বনেই আজ বাংলা সাহিত্যের একটি ক্রমিক ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পুঁথি সংগ্রহের বিপুল বিস্তারও ঘটেছিল, যার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই সময় পর্বের উল্লেখযোগ্য সংগ্রাহকগণ হলেন — ১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ২) দীনেশচন্দ্র সেন, ৩) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ৪) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ৫) গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬) নগেন্দ্রনাথ ভট্টশালী, ৭) নগেন্দ্রনাথ বসু, ৮) যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৯) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ১০) ব্যোমকেশ মুস্তাফী, ১১) মুন্সী আবদুল করীম, ১২) শিবরঞ্জন মিশ্র, ১৩) দীঘাপতিয়ার রাজকুমার শরৎকুমার রায়, ১৪) বিধুশেখর শাস্ত্রী, ১৫) ক্ষিতি মোহন সেন, ১৬) রামকুমার দত্ত, ১৭, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৮, সুকুমার সেন, ১৯, পঞ্চানন কর্মকার প্রমুখ।

এই পর্বের পুথি সংগ্রহের উদ্যোগী সংস্থা ঃ- ১) এশিয়াটিক সোসাইটি, ২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪) বিশ্বভারতী, ৫) বর্ধমান সাহিত্য সভা।

উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ এইসব উদ্যোগী সংস্থার হয়ে নানা সময়ে যুক্ত হয়েছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি ও দীনেশ চন্দ্র সেন ঃ- বাংলা পুঁথি সংগ্রহের ইতিহাসে এশিয়াটিক সোসাইটির নাম যেমন সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়, তেমনি বাংলা পুঁথি অবলম্বনে প্রথম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা রূপে দীনেশচন্দ্র সেনের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছে। দীনেশচন্দ্র সেন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। জ্ঞান স্পৃহা ও কৌতূহলে তিনি প্রথমে এককভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ কিছু পুঁথি সংগ্রহ করেন। দীনেশচন্দ্র স্বয়ং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এসব অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কয়েকটি পুঁথি সংগ্রহ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত উল্লেখযোগ্য পুঁথিগুলি হল — ১) সঞ্জয় কৃত — মহাভারত, ২) গোপীনাথ দত্ত কৃত — দ্রোণপর্ব (মহাভারত), ৩) রাজেন্দ্র দাস কৃত — শকুন্তলা, ৪) দ্বিজ কংসারি কৃত — প্রহ্লাদ চরিত্র, ৫) রাজারাম দত্ত কৃত — দণ্ডী পর্ব (মহাভারত), ৬) ষষ্ঠীবর দত্ত কৃত — মহাভারতের উপাখ্যান, ৭) গঙ্গাদাস কৃত — মহাভারতের উপাখ্যান।

উৎসাহিত হয়ে দীনেশচন্দ্র যে সব অজস্র অনুচ্চারিত পুঁথি বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে আছে অবহেলা ও নিতান্তই অনাদরে, সেই সব মূল্যবান পুঁথিগুলিকে উদ্ধার সংগ্রহ তথা রক্ষা করার মানসে এশিয়াটিক সোসাইটির তৎকালীন সদস্য ডাক্তার হরনলি'র সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র লেখেন পূর্ববঙ্গ থেকে। ডঃ হরন্‌লি তাঁর প্রস্তাবে উৎসাহিত হন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এশিয়াটিক সোসাইটির অর্থসাহায্যে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সু-পরামর্শে এবং সোসাইটির দ্বারা নিয়োজিত প্রাচ্য শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বিনোদবিহারীকাব্যতীর্থ মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে দীনেশচন্দ্র বহু পুঁথি উদ্ধার করেন — সেসব পুঁথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংগৃহীত হয়। এই পরিক্রমায় যেসব পুঁথি সংগৃহীত হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল ঃ পরমেশ্বর কৃত — পরাগলী মহাভারত, শ্রীকর নন্দী কৃত – অশ্বমেধ পর্ব, আলাওল কৃত – পদ্মাবতী, রাজা রাজনারায়ণ কৃত – কাশীখণ্ড, রামেশ্বর নন্দী কৃত – মহাভারত, মধুসূদন নাপিত কৃত – নলদময়ন্তী প্রভৃতি।

পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথ বসুর অর্থসহায়তায় এবং তারই সংগ্রহশালার জন্য রাঢ়বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাত্রসায়র নিবাসী রামকুমার দত্তের সহায়তায় প্রায় ৫০০ পুঁথি সংগ্রহ করেন।

উদ্যোগী সংস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ- মূলতঃ তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাহক ও সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় আট হাজার বাংলা পুঁথি আছে।

স্যার আশুতোষ দীনেশচন্দ্রের পরিচয় অবগত হয়ে উৎসাহী হন ও অনুসন্ধানী গবেষক রূপে

মন্তব্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেন। দীনেশ চন্দ্র রাঢ়-বাংলা ঘুরে ঘুরে অজস্র পুঁথি সংগ্রহ করেন।

যে সমস্ত পুঁথি সংগ্রহ হয়েছিল সেগুলির পাঠোদ্ধার করে তার পরিচয় লিপির একটি তালিকা প্রস্তুত করার ভার দেওয়া হয় লিপি বিদ্যায় পারদর্শী বসন্ত রঞ্জন রায় মহাশয়কে। বসন্ত রঞ্জনের প্রস্তুত তালিকা অবলম্বন করে দীনেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রথমে একটি তালিকা গ্রন্থ রচনা করেন দু-খণ্ডে। তালিকা গ্রন্থটির নাম দেন তিনি 'টিপিক্যাল সিলেকশন্‌স্ ফ্রম ওলড্ বেঙ্গলী লিটারেচার'।

পরবর্তীকালে আরও নানা ব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং নানা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় বহু পুঁথি দান, কিংবা সংগ্রহ করে এনে দিয়েছেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় নানা সূত্রে বেশ কিছু পুঁথি ক্রয়ও করেছেন। এভাবেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি সংগ্রহে ও সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। যার নেপথ্যে নায়ক ছিলেন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত পুঁথির তালিকা সম্বলিত গ্রন্থ সমূহঃ

ক) বিভিন্ন বৈষ্ণব কবির পদাবলী, পুঁথি সংখ্যা ৭০টি।

খ) চৈতন্য চরিতামৃত (কৃষ্ণদাস গোস্বামীর) পুঁথি সংখ্যা ১৬টি।

গ) চৈতন্য ভাগবত (বৃন্দাবন দাস কৃত) পুঁথি সংখ্যা ৩১টি।

ঘ) চৈতন্য মঙ্গল (লোচন দাস কৃত) পুঁথি সংখ্যা ৪১টি।

ঙ) চৈতন্য মঙ্গল (জয়ানন্দকৃত) পুঁথি সংখ্যা ১২টি।

উদ্যোগী সংস্থা বিশ্বভারতীঃ- রবীন্দ্রনাথের মানস পুত্র বিশ্বভারতী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার মিলন ক্ষেত্ররূপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে গড়তে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে তুলতে তিনি দেশ বিদেশের জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের যেমন সমাদরে বিশ্বভারতীতে নিয়ে এসেছিলেন, তেমনি দেশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারেও সমান আগ্রহী হয়েছিলেন। কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার করতে না পারলে, আমাদের অতীতকে জানতে না পারলে যথার্থ দেশ-সমাজ-জাতি ও কৃষ্টি সংস্কৃতিকে জানা যাবে না। 'স্বদেশের ভাষা, সাহিত্য ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, শাস্ত্র কথা, লোক বিবরণ প্রভৃতির মধ্যেই যেহেতু দেশের প্রাণ স্পন্দন ধ্বনিত হয়ে আসছে চিরদিন। তাই তারই অন্বেষণ করতে হবে প্রথমে।" দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে তুলে ধরে, স্বদেশবাসীর সুপ্তি ভঙ্গ করতে তাই রবীন্দ্রনাথ পুঁথি সংগ্রহের জন্য বিশ্বভারতীর পরিচালনায় একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেন।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল বিশ্বভারতী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার একটি পীঠস্থান হয়ে উঠুক। তাঁর সেই ইচ্ছা ফলবতী হয়ে উঠতে লাগল — একে একে এসে বিশ্বভারতীতে যোগদান করলেন — বিধুশেখর শাস্ত্রী, পণ্ডিত ক্ষিতি মোহন সেন, শিবধন বিদ্যার্ণব, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী, কালীমোহন ঘোষ, শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথবন্ধু দে প্রমুখ প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার একনিষ্ঠ সাধক গবেষকগণ। এঁদের নাম বিশ্বভারতীর পুঁথি সংগ্রহ ও পুথিশালায় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে গৌরবের সঙ্গে।

প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা এবং প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়। উপরিউক্ত পণ্ডিতগণের উদ্যোগে এবং চালিকা শক্তি রবীন্দ্রনাথের সক্রিয়তায় — সংস্কৃত, পালি, বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি নানা ভারতীয় ভাষার পুঁথি সংগৃহীত হতে থাকল বিপুল সংখ্যায়। কেবল স্থানীয় প্রদেশেই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহে উদ্যোগী হলেন রবীন্দ্রনাথ। এমন কি বহিঃভারতের নানা স্থান থেকেও পুঁথি সংগৃহীত হতে থাকল বিদেশী পণ্ডিত শিল ভ্যাঁ লেবী, এ্যান্ড্রুজ, জাপানী পণ্ডিত প্রাচ্যবিদ্ হোরামন, স্টেনকেনো প্রভৃতি আশ্রমবাসীর উদ্যোগে। এঁরা পারস্য, জাপান, জাভা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশ থেকে নানা বিয়য়ের বিদেশী পুঁথি সংগ্রহ করেন। শুধু তাই নয়, শান্তিনিকেতনের বাছাই করা ছাত্রদেরও তিনি এই বিপুল কর্মযজ্ঞে সামিল করেন।

প্রথম পর্যায়ে বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের পুঁথি সংগ্রহ করে একটিমাত্র পুঁথি বিভাগে, কিন্তু পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী ভাষা অনুযায়ী পৃথক পৃথক পুঁথি বিভাগ গঠন করে — বাংলা পুঁথি বিভাগ, ওড়িয়া, অসমীয়া, চীনা পুঁথি, ঐসলামিক পুঁথি, সংস্কৃত পুঁথি বিভাগ রূপে স্বতন্ত্র পুঁথি বিভাগ গড়ে ওঠে। বর্তমানে বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথি বিভাগটি সবচেয়ে সমৃদ্ধ। বাংলা পুঁথি বিভাগের এই বিস্তার ও বৃদ্ধির পশ্চাতে আর একজন একনিষ্ঠ সাহিত্য সাধক এবং পুঁথিগতপ্রাণ নিষ্ঠাবান গবেষক শ্রীপঞ্চানন মণ্ডলের নাম জড়িয়ে আছে।

উদ্যোগী সংস্থা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদঃ- ১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই পরিষদের নাম আজ ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

মন্তব্য

এখন পর্যন্ত যে পুঁথিটি আমাদের বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দশন রূপে চিহ্নিত সেই চর্যাপদের পুঁথি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশ করে, সম্পাদক এবং আবিস্কারক হলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

এই প্রতিষ্ঠানের ২য় যুগান্তকারী প্রকাশনা গ্রন্থ বড়ু চণ্ডীদাস কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' পুঁথি। যার আবিষ্কারক এবং সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ। প্রকাশ কাল ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ। একই বৎসরে এমন দুটি অনাবিষ্কৃত ও দুষ্প্রাপ্য (যার ২য় কোন পুঁথি অদ্যাবধি মেলেনি) পুঁথির সম্পাদনা করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রমটিকেই বদলে দিয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আজ পাঁচ হাজারের অধিক বাংলা পুঁথিকে বুক দিয়ে রক্ষা করছে। কিন্তু একদিনেই এই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ শালা গড়ে ওঠেনি। এর পশ্চাতে আছে বহু সারস্বত সাধকের নিরলস নিষ্ঠা ও শ্রম।

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে ঠাকুরবাড়ীর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বেশ কিছু পুঁথি সাহিত্য পরিষদকে দান করেন। পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায়, মুন্‌সী আবদুল করিম, অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, নগেন্দ্রনাথ বসু, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রমুখের সক্রিয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় পরিষদে প্রচুর পুঁথি সংরক্ষিত হয়। বর্তমানে প্রায় পাঁচ হাজার পুঁথির সম্ভার এখানে আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পুঁথিটিও এখানে সংরক্ষিত আছে।

বর্ধমান সাহিত্য সভা ঃ- মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাতঃস্মরণীয় গবেষক অধ্যাপক আচার্য সুকুমার সেন-এর প্রচেষ্টায় তাঁর নিজগৃহে বর্ধমান সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাচীন পুঁথির সংরক্ষণ করার মানসে। ডঃ সেন নানা সূত্র থেকে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং গবেষক ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তায় বহু বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করেন। তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে নানা তথ্য প্রমাণে বর্ধমান সাহিত্য সভার উল্লেখযোগ্য পুঁথির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। উত্তরবঙ্গ থেকেও তিনি অনেক মহাভারত পুঁথি সংগ্রহ করেন।

১৩.৩ ঃ পুঁথির সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিন্যাস

ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে চামড়া, গাছের বাকল বা ছাল, তাল পাতা, তেরেট পাতা, তুলোট কাগজ ইত্যাদি উপাদানের উপর লিখিত এক একটি গুচ্ছকে বলা হয় পুঁথি। পুঁথি শব্দটির উৎপত্তি স্পষ্টতই পুস্তিকা বা পুস্তি শব্দ থেকে। এই দুটি শব্দই সংস্কৃত ভাষার শব্দ। যাদের অর্থ — যে কোনো রকম লিখন-পটের উপর হস্তলিখিত বর্ণমালার বিন্যাসে বক্তব্যের রূপায়ণ। পুস্তিকা এবং পুস্তি শব্দ দুটি সংস্কৃত হলেও পুস্ত শব্দটি পারসিক যার অর্থ চামড়া। পুস্তক শব্দ এখান থেকেই এসেছে বলে অনেকে অনুমান করেন। সেই সঙ্গে আমরা এটাও বুঝতে পারি — প্রাচীন পুঁথি চামড়ার উপরেও লেখা হত, বিশেষত মধ্য প্রাচ্যে। সংস্কৃত শব্দের মূলেও পারসিক শব্দ থাকার সম্ভাবনা আছে। বৈদিক আর্যভাষার সঙ্গে পারসিক ভাষার ভগ্নী-সম্পর্ক স্বীকৃত। ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে সর্বপ্রকার সাহিত্য এবং অন্যান্য জ্ঞান-চর্চার বিষয় — সবই হস্তলিখিত এবং পুঁথিবদ্ধ ছিল। ইংরেজি ভাষায় পুঁথিকে বলা হয় ম্যানস্ক্রিপট্।

গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী পুঁথির শ্রেমী বিভাগ ঃ-

গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলা পুঁথিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে —

(ক) উপকরণ অনুযায়ী ঃ- বাংলা পুঁথির পত্রউপকরণ বিচারে মূলতঃ তিন ধরণের পত্রে পুঁথি লিপিকরণ করা হত।

১) ভূর্জপত্র (বা গাছের ছাল) পুঁথি — ভূর্জ গাছের ছাল অত্যন্ত সূক্ষম সিল্কের কাপড়ের মত করে বের করা হত। এর কোন নির্দিষ্ট মাপ নেই। সাধারণতঃ ১২-১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪-৬ ইঞ্চি চওড়া মাপে কেটে নিয়ে তাতে লেখা হত। ভূর্জপত্রের পুঁথি পাওয়া যায় না। মূলতঃ কবচাদি লেখার জন্য এই পত্র ব্যবহৃত হত।

২) তালপাতার পুঁথি — তালপাতায় পুঁথি লেখার চল আমাদের দেশে সুপ্রাচীন। চর্যাপুঁথি তালপাতায় লেখা। তালপাতা আমাদের দেশে সহজলভ্য। তালপাতায় লেখা পুঁথির অধিকাংশই গীতা-চণ্ডী পূজার বিভিন্ন পদ্ধতি ও মন্ত্রাদির। এর মাপ — ১২″/৩″।

৩) তুলোট কাগজের পুঁথি — তুলোট কাগজ অনেক পরবর্তীকালের। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই তুলোট কাগজের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দশন 'চর্চাগীতি'র পুঁথি ছাড়া এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সাহিত্যিক পুঁথিগুলির প্রায় সবই তুলোট

মন্তব্য

কাগজে লেখা। পরবর্তী পর্যায়ে এই সমস্ত উপকরণাদি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এইসব উপকরণাদির উল্লেখ পুঁথির প্রকৃতি ও গঠন রূপের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হল।

(খ) প্রকৃতিগত দিক ঃ- প্রকৃতিগত দিক থেকে বাংলা পুঁথিগুলি মূলতঃ দুই শ্রেণীর। (১) মৌলিক পুঁথি, (২) নকল পুঁথি।

১) মৌলিক পুঁথি — মৌলিক পুঁথি বলতে আমরা সেইসব পুঁথিকেই বুঝি যে পুঁথিগুলি (১) স্বয়ং কবির স্বহস্ত রচিত (লিখিত), (২) কবি লিপিপটু না হলে প্রত্যক্ষভাবে লিপিকরকে দিয়ে তিনি লিপি করিয়েছেন, (৩) কবির মূল খসড়া পুঁথি দৃষ্টে তাঁর অনুমতি ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় অন্য কোন পেশাদার লিপিকর লিপি করেছেন।

এ পর্যন্ত সংগৃহীত উল্লেখযোগ্য প্রাচীন পুঁথির মধ্যে মৌলিক পুঁথির সংখ্যা নেই বললেই চলে।

২) নকল পুঁথি — মূল বা আদর্শ পুঁথি থেকে কপি করা পুঁথিকে নকল পুঁথি বলে। ছাপাখানা পূর্ব যুগে আদর্শ পুঁথি থেকে নকল, নকল পুঁথি থেকে নকল করে ঘরে ঘরে সংগ্রহ করে রাখতেন রসিক পাঠকগণ। এই নকল করার জন্য দক্ষ ও পেশাদার লিপিকর ছিলেন। লিপি নকল করাই ছিল তাঁদের পেশা। আমরা যে সমস্ত পুঁথি দেখতে পেয়েছি তার সবই নকল পুঁথি।

(গ) মিশ্র পুথি ঃ- এছাড়াও আর এক শ্রেণীর পুথির কল্পনা করেছেন পুঁথি গবেষকগণ। তাঁরা একই বিষয়ের পুঁথির মধ্যে বিপুল পাঠভেদ এবং অন্যবিষয়ের মিশ্রণ লক্ষ্য করেছেন বেশ কিছু পুঁথিতে। এইসব পুঁথিকে এঁরা মিশ্র পুথি বলতে চেয়েছেন। মিশ্র পুঁথির উদাহরণ সব শাখার পুঁথিতেই বিদ্যমান। যে কবির জনপ্রিয়তা ছিল, এবং যিনি কালের দিক থেকেও প্রাচীন তাঁর ভণিতার পুঁথিতেই এই মিশ্রকরণ ঘটেছে বহুল। গায়েন এবং স্বভাব কবি পাঠকের আবেগ উচ্ছ্বাস জাত প্রবণতাই এর জন্য দায়ী। 'যথা — দৃষ্টং তথা লিখিতং' বললেও লিপিকরগণ শ্রুতি লিখন করতেন প্রায় সর্বত্রই। পাঠক বা গায়েনের পাঠ বা আবৃত্তি গান শুনে শুনে তিনি নকল করতেন। এর ফলেই এই মিশ্রণ ঘটত।

(ঘ) পুঁথি নকলের কারণ বা উদ্দেশ্য ভিত্তিক পুঁথি ঃ- পুঁথি নকলের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। কবি তাঁর আন্তর প্রেরণায় অথবা কোন পৃষ্ঠপোষকতার প্রেরণায় বা নির্দেশে কাব্যাদি রচনা করতেন। সেই গ্রন্থ যদি প্রচারের আলো না দেখে তাহলে কবির তৃপ্তি হয় না। 'প্রকাশই সাহিত্য' এবং প্রকাশেই মুক্তি ও আনন্দ হলেও কবি প্রচার চান। প্রচার না হলে কবি যশ-খ্যাতি লাভ হয় না। কবি তাই তাঁর রচনাগ্রন্থকে প্রচারের জন্য সে যুগের প্রচারক গায়েনগণের শরণাপন্ন হতেন। এই গায়েনগণ কখনো অর্থের বিনিময়ে, কখনো আপন পেশাগত স্বার্থে নতুন কবির কাব্য আসরে আসরে গান করে করে প্রচার করতেন। এর ফলে গায়েন যেমন নতুন নতুন বিষয় উপস্থাপন করে আসর জমিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন, তেমনি নতুন কবি ও তাঁর কাব্য পাঠক-শ্রোতার কাছে পরিচিত হয়ে উঠত। কারণ গায়েন গীতি সংগ্রহের জন্য কিংবা অন্য কোন কারণে লুব্ধ হয়ে ঐ কাব্যের নকল করাতেন। এভাবেই নানা উদ্দেশ্যে পুঁথি নকল করা হত।

(ঙ) গোষ্ঠীভুক্ত পুথি ঃ- রুচি-ধর্ম-সম্প্রদায়গত পার্থক্য ভেদে পুঁথি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ থেকেছে। অবশ্য রামায়ণ-মহাভারত এবং ভাগবতের অনুসৃত পুঁথি গোষ্ঠী নির্বিশেষে জনপ্রিয়তা ও প্রচার লাভ করেছিল। তবু প্রাক্ চৈতন্য এবং উত্তর চৈতন্য যুগের বাঙালী সমাজে অঞ্চল ও গোষ্ঠী ভেদে সাহিত্য চর্চা চলত। পূর্ববঙ্গে মনসা মঙ্গলের পুথির ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল, রাঢ় বঙ্গে ধর্ম ও চণ্ডীমঙ্গল পুঁথির জনপ্রিয়তা ছিল, সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাঘ্র দেবতা রায় মঙ্গল পুঁথির জনপ্রিয়তা ছিল — অঞ্চল ভেদে সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা বিচারে এবং কবির বাসস্থান ও লিপিকরের অবস্থান পরিচয়ের নিরিখে তা বোঝা যায়। এছাড়া শিক্ষিত উচ্চবর্ণের সাহিত্য চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে। পৌরাণিক দেবদেবীর স্থলে লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যমূলক মনসা-চণ্ডী-ধর্ম ঠাকুরের পুঁথির কদর তাঁরা করতেন না। তার প্রমাণ সংস্কৃত টুলো পণ্ডিত তথা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উত্তরাধিকারে জমা দেওয়া পুঁথির সবই — সংস্কৃত সাহিত্যের পুঁথি, লিপি বাংলা হলেও ভাষা কিন্তু সংস্কৃত।

বৈষ্ণব গৃহে সংরক্ষিত বৈষ্ণব সাহিত্যের পুঁথিগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমাদের মুগ্ধ করে। সেটি হলো — অন্যান্য বিষয়ের পুঁথির মত (অর্থাৎ মঙ্গল কাব্যাদি) বৈষ্ণব পুঁথিগুলিতে বিশেষ করে তত্ত্ব ও জীবনী গ্রন্থগুলিতে মিশ্রণ দোষ নেই। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নে তাঁরা পুঁথিগুলিকে যথাযথ রক্ষা করেছেন। বানান ভুলও তাই অনেক কম, বিকৃতিও কম। এমন কি নকলকার নিজের নামটিকেও আড়াল করে রেখেছেন অধিকাংশ পুথিতেই।

শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব ইত্যাদি মতভেদে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পুঁথি সংগ্রহ করতেন বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত নাগরিকগণ।

মন্তব্য

(চ) আঙ্গিকগত ঃ- আঙ্গিকের দিক থেকে বাংলা পুঁথি (কেবল বাংলা পুঁথি কেন যে কোন ভাষা ও সাহিত্যের পুঁথিই) দু'ভাবে পাওয়া গেছে — ১) সম্পূর্ণ পুঁথি, ২) খণ্ডিত পুঁথি।

১) **সম্পূর্ণ পুথি ঃ-** মৌলিক বা নকল পুঁথির মধ্যে যে পুথিটির আদ্যন্ত প্রতিটি পৃষ্ঠা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে সেই পুথিকে আমরা সম্পূর্ণ পুথি বলি। আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ পুথির সংখ্যা খণ্ডিত পুথির তুলনায় অনেক কম। অন্তে 'পুষ্পিকা' অংশ থাকে অনেক পুথিতে। পুষ্পিকায় কবির নাম-পরিচয়-রচনা কাল গ্রন্থ রচনার কারণ (আদ্য খণ্ডেও পাওয়া যায়) লিপিকর-পাঠক পরিচয়, লিপিকাল, লিপি দক্ষিণা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ পুথি পুষ্পিকা বর্জিতও হতে পারে, কিন্তু মূল অংশ খণ্ডিত হলে চলবে না।

২) **খণ্ডিত পুথি ঃ-** যে পুথির প্রতিটি পৃষ্ঠা অক্ষত নয়, খণ্ডিত, তাকে খণ্ডিত পুথি বলে। খণ্ডিত পুথি এবং অসম্পূর্ণ পুথি সমার্থক নয়। কারণ অসম্পূর্ণ বলতে বোঝায় পুথিটি সম্পূর্ণ লেখা হয়নি। কিন্তু পুথিগুলি আদিতে প্রায় সবই সম্পূর্ণ ছিল বলেই মনে হয়। অবহেলা-অনাদর এবং নানা প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে পুথিগুলি খণ্ডিত হয়ে গেছে। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পুথিটি' খণ্ডিত পুথি।

(চ) বিষয়গত পুথির শ্রেণীর বিভাগ ঃ- অংশত শেষ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এবং পূর্ণত ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলা পুথির জয়যাত্রা শুরু। সূচনা লগ্ন থেকেই বিষয় ভেদে পুথিগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত।

১) অনুবাদ বা অনুসৃত পুথি, ২) মঙ্গল কাব্য সাহিত্যের পুথি এবং ৩) বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ক পুথি। এই বিষয়গত পুথিগুলি পরবর্তীকালে আরও শাখায়িত ও পল্লবিত হয়েছে। এই তিন বিষয়ের পুথি গঠন বা রূপ ভেদে কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত।

১) পাঁচালি বা আখ্যান ধর্মী — কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালি, কাশীরামের ভারত পাঁচালি, মঙ্গল কাব্যের নানা আখ্যান-মনসা, চণ্ডী, ধর্ম মঙ্গল ইত্যাদি।

২) সন্দর্ভ মূলক বা নিবন্ধ জাতীয় পুথি — এগুলি মূলতঃ আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব ও দর্শন ভিত্তিক। বৈষ্ণব নিবন্ধ, কড়চাদি গ্রন্থ এর উদাহরণ।

৩) জীবন গ্রন্থ — চৈতন্য চরিত গ্রন্থাদি, অদ্বৈত চরিতগ্রন্থ ইত্যাদি।

৪) উপদেশাত্মক পুথি — চর্যাগীতি কোষ।

৫) পদ সংকলন পুথি — পদকল্পতরু ইত্যাদি।

৬) মিশ্র রচনা — চাণক্যের শ্লোকগুলির পাশাপাশি-বঙ্গানুকৃতি কবিতা, অথবা জীবনী ও তত্ত্বের মেলবন্ধন (চৈতন্য চরিতামৃত)। 'ভক্তি রত্নাকর' — ইতিহাস-চরিত এবং তত্ত্ব মিশে গেছে।

১৩.৪ ঃ পুথির উপকরণ

ক) পথ/লিখনাধার ঃ- মানুষের চিন্তাধারাকে প্রকাশ করার জন্য প্রাচীন যুগ থেকেই নানা উপকরণাধার ব্যবহার করা হয়েছে। পাথর, কাঠ, ধাতুর পাত, হাতীর দাঁত, মোমের পাত, গাছের ছাল, জীবজন্তুর চামড়া ইত্যাদি। কাগজের ব্যবহার এসেছে অনেক পরবর্তীকালে। এ পর্যন্ত জানা তথ্যানুযায়ী খৃষ্টীয় ২য় শতকে চীন দেশেই প্রথম কাগজের ব্যবহার শুরু হয়েছে। কাঁচা বাঁশকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে জলে ভিজিয়ে পেষণ করে মণ্ডের মত করা হত। সেই মণ্ড থেকে পাতলা চাদর তৈর করে তাতে লেখার কাজ চালনো হত।

বাংলা পুথির ক্ষেত্রেই শুধু নয় যে কোন ভাষার পুথির ক্ষেত্রে লিখনাধার রূপে প্রধানত তিন ধরণের পত্র ব্যবহার করা হতো — ১) ভূর্জ পত্র, ২) তালপত্র, ৩) তুলোট কাগজ।

১) ভূর্জ পত্র — ভূর্জ বৃক্ষের ছাল অতি সূক্ষ্মভাবে চেঁচে (পাতলা সিল্কের কাপড়ের মত) ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করা হয়। হিমালয়ের ২$^{১}/_{২}$ থেকে ৩ হাজার মিটার উচ্চে নিবিড় ভূর্জ বৃক্ষের বন দেখা যায়। একে 'ভোজ'ও বলা হয়। ভূর্জ বৃক্ষের ছাল অতি নরম। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে অর্থাৎ সংস্কৃতের যুগ থেকে এই ভূর্জ ছাল ব্যবহার করা হয়ে আসছে। ভূর্জ পত্রে বর্ণ তুলিকার লিখনই নিরাপদ ছিল। কারণ লৌহ শলাকা বা সর-কঞ্চির লেখনী চালনা করতে গেলে এই পত্র ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী।

বর্তমানে সাধারণত এই পত্রে তাবিজ-কবচাদি লাল কালিতে লিখে মাদুলিতে তা সহজেই ভরে দেওয়া হয়। কারণ এই পত্র এত মিহি যে ছোট মাদুলিতে তা সহজেই ভরে দেওয়া যায়। ভূর্জ পত্রের পুথি কদাচিৎ মেলে।

মন্তব্য

২) তালপত্র — কচি তালপাতা সংগ্রহ করে প্রথমে বিশেষ আকারে কেটে নিতে হয় এবং মধ্যের শিরাকে লম্বভাবে চিঁড়ে তা থেকে দুটো পাতা বের করা হয়। কচি তাল পাতা পরিণত তাল পাতার থেকে চওড়া ও মসৃণ হয়। (লোহার খন্তার লেখনী দিয়ে ওড়িয়া পুথি রচনা এই কাঁচা অবস্থাতেই লেখা / খোদাই করা হত। হাল্কা রোদে শুকিয়ে নিলে তাতে স্পষ্ট লিপিফুটে উঠত।)

কচি তালপাতা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট মাপের পত্রগুলিকে জলে দু'তিন দিন ডুবিয়ে রেখে ছায়ায় শুকিয়ে নেওয়া হত। লেখার সুবিধার জন্য শুকনো বস্ত্রখণ্ড দিয়ে লেখার দিকের অংশে হাল্কা করে ঘয়ে নিয়ে এর তেল তেলে পিচ্ছিলতাকে দূর করা হত। পাতার ঠিক মধ্যস্থলে গরম লোহার শলাকা দিয়ে ছিদ্র করা হত সূত্র দিয়ে বন্ধন করার জন্য।

তালপাতার পুথি সাধারণত ১৮″ থেকে ২০″ পর্যন্ত লম্বা হয় এবং প্রস্থে ২১/২″ থেকে ৩″ পর্যন্ত হয়।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আদি নিদর্শন চর্যাপদের পুথিটি তালপাতার হলেও মূলতঃ সংস্কৃত টীকা পুথি। তন্ত্র-মন্ত্র-পূজা পদ্ধতি, গীতা চণ্ডী ইত্যাদি তালপাতার পুথিতে লেখা হত।

এছাড়া — তেরেট, তুঁতে, নোনা, বট ইত্যাদি গাছের পাতাও লেখার পত্র রূপে ব্যবহার করার রীতি ছিল।

৩) তুলোট কাগজ — আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি লেখার জন্য প্রথম কাগজের ব্যবহার চীন দেশে খৃষ্টীয় ২য় শতকে শুরু হয়েছে। তখন এই কাগজের একমাত্র উপাদান ছিল কচি বাঁশ। তারপর দীর্ঘ পরিক্রমায় কাগজের রূপ ও রূপান্তরে আজ থেকে পাঁচ/ছশো বৎসর পূর্বে তুলোট কাগজের জন্ম। 'তুলোট' শব্দের মধ্যেই তুলো বা তুলো নির্মিত বস্ত্রকে এই কাগজ প্রস্তুতির প্রধান উপকরণ রূপে চিহ্নিত করা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ- প্রথমে তুলো বা ছেঁড়া বস্ত্র খণ্ড, ঘাস, পাতা, বাঁশের ছোট ছোট খণ্ড কলিচুণের জলে ডুবিয়ে একটি পাত্রে কয়েকদিন ধরে পচানো হয়। তারপর সেটিকে লৌহ বা শকত্ দণ্ড দিয়ে মন্থন করে কাদা কাদা মণ্ডে পরিণত করা হয়। সেই মণ্ডটিকে কাপড়ের ছাকনি দিয়ে ছেঁকে নিয়ে বার বার ধুয়ে নিতে হয়। এতে চুণের ভাগ কমে যায়। এরপর শিল-নোড়ায় সেই খণ্ডের সঙ্গে হরিতকী-অভ্র-হলুদ-গদ মিশিয়ে মশলা বাঁটার মতো করে পিষে নিয়ে কাপড়ে রেখে চাপ দিয়ে সব জল বের করতে হয়। (অনেকটা ছানার জল বের করার মত)। এরপর ঐ মণ্ডটি রুটি তৈরীর আটার মতো মেখে ছোট ছোট লেচি করে চাকি-বেলনা দিয়ে পাতলা পাতলা চাদর করে রোদে শুকিয়ে নিয়ে প্রয়োজন মত মাপে কেটে কেটে কাগজ তৈরী করা হয়।

হরিতকী-অভ্র এবং হলুদ মেশানো হয় পোকা-মাকড় থেকে কাগজকে রক্ষা করার জন্য। তাছাড়া হলুদ প্রস্তুত কাগজকে উজ্জ্বল করে। গদ মণ্ডটিকে শক্ত ও মজবুত করতে ব্যবহার করা হয়। বেলনা চালিয়ে একে মসৃণ করা হয়। যেদিকে লেখা হয় সেদিকটা বিশেষ করে। প্রয়োজন মত মাপের পত্রকে দুভাঁজ করে লেখার দিকটা ঘাসে মসৃণ করা হত। উপরের দিকে লেখা হয়। ভিতরের দিকে লেখা হয় না। দুভাঁজের দুটি দিক নিয়ে একটি পৃষ্ঠা রূপে ধরা হয়। অনেক সময় ভাঁজ অংশ কেটে দু'পিঠেই লেখা হয়। সেক্ষেত্রে একটি পত্রের এপিঠ-ওপিঠ মিলে ১ পৃষ্ঠা হিসাবেই ধরা হয়।

(খ) পুথির কালি ঃ- পুথিতে লাল ও কালো দুই বর্ণের কালির ব্যবহার দেখা যায়। এই কালিগুলি প্রস্তুত করা হত গৃহে।

কালি প্রস্তুত প্রণালী — সাধারণ কাজ চালানোর জন্য সস্তা/সহজলভ্য কালিরূপে প্রদীপ শিখার ভুষো জলে গুলে কালি করা হত। অথবা চাল পুড়িয়ে তাকে জলে গুলে কালি প্রস্তুত করা হত। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কালি প্রস্তুতিতেও ছিল কাগজ প্রস্তুতির মতই শ্রম ও ধৈর্যের। এখানে বিশেষ বিশেষ উপাদান ব্যবহার করা হত। একটি প্রাচীন পুথিতে কালি প্রস্তুতির প্রণালী সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

লোধ লোহা লোহার গুঁড়ি — অর্কাঙ্গার জবার কুঁড়ি।
গাবের ফল হরিতকী — ভুঙ্গার্জুন আমলকী।
বাবলা ছাল জাঁটির রস — ডালিম ছেঁচে করিবে কষ।
ভেলায় কর্য্য এক আলি — চারি যুগলা উঠবে কালি।।

— লোধ ফুল অথবা গাছের ছাল লোহার গুঁড়ো (চূর্ণ) জলে ভিজিয়ে কালো রঙ ধারণ করে। সেই জলের সঙ্গে অর্ক (আকন্দ) গাছের কাঠ কয়লা ঘসে মিশিয়ে অর্জুন-আমলকী ও বাবলা গাছের ছাল ও আঠা জলে ভিজিয়ে তার কষ মেশাতে হবে। তার সঙ্গে 'জাঁটির রস' অর্থাৎ চাল ভেজে বা পুড়িয়ে তার থেকে যে আঠালো রস বের হয় তা মেশাতে হবে। আর তাতে যদি ডালিম ফলের

ছালের কষ মেশানো হয় তাহলে তা খুবই টেকসই হবে। (ভেলা-পাত্র, আলি-মাপ) চারি যুগলা অর্থাৎ চার দোয়াত কালি তৈরী হবে এভাবে, এই কালির রঙ কালো। কালো রঙ থেকেই কালি নামের উৎপত্তি। মন্তব্য

কালি প্রস্তুতির ২য় ছড়া —

কাজল গোমূত্র লায়ের জল/ভৃঙ্গ ভেলা দিয়ে তোল।
পীত কাষ্ঠ দিয়ে বসি/তোটে পত্র না তোটে মসি।।

— কাজল গোমূত্র লোহার গুঁড়ো মেশানো জলে ভৃঙ্গ অর্জুন ছালের কষ মিশিয়ে তৈরী কালি কখনো নষ্ট হবে না। পুথির পত্র নষ্ট হলেও কালি নষ্ট হবে না।

কালি প্রস্তুতির ৩য় ছড়া —

ত্রিফলা শিমূল ছালা ছাগ দুগ্ধে দিয়া তেলা।
লোহা দিয়া লাহাই ঘষি মসী বলে আকাট বসি।।

— আমলকী-হরিতকী-বয়ড়া ভেজানো জলে শিমূল গাছের ছালের কষ মিশিয়ে ছাগলের দুধ যুক্ত করে লোহা ঘসে ঘসে যে কালি তৈরী হবে তা খুব স্থায়ী হবে 'আকাট বসি' — কালি উঠবে না।

লাল কালি - লোহার গুঁড়ো, কাঠ-কয়লা বাদ দিয়ে উক্ত প্রক্রিয়ায় কুমকুম মিশিয়ে লাল কালি প্রস্তুত করা হত। বাংলা পুথিতে লাল কালির ব্যবহার দেখা যায় সাধারণত পুষ্প অলংকরণে, ভণিতাংশে, পরিচ্ছেদ সূচনা ও শেষাংশে এবং সংস্কৃত উদ্ধৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে, পৃথক করে পাঠকের নজর কাড়ার জন্য।

মধ্যযুগের খৃষ্টান সাধু-সন্তরা ওক গাছের অস্বাভাবিক স্ফীত অংশ কেটে নিয়ে তার ভিতরের জমা তরলে লৌহজাত লবণ মিশিয়ে কালি তৈরী করতেন।

কাগজের মতই কালিও প্রথম চীন দেশেই ব্যবহার শুরু হয় বলে পণ্ডিতগণের অনুমান।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত যুগে কালির ব্যবহার ছিল — লাল কালি। কুমকুম, বলির পশুর রক্ত কালি রূপে ব্যবহৃত হত।

গ) লেখনী বা কলম ঃ- পুথির লেখনী রূপে প্রাচীনকাল থেকে নল, খাগ, কঞ্চি, শর, পাখির পালক, লৌহ শলাকার ব্যবহার হত। বাংলা পুথির লেখনী রূপে নল, খাগ, শর কঞ্চি এবং পাখির পালক ব্যবহার করা হত। লৌহ শলাকা উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হত। বাংলা দেশে লৌহ শলাকা ব্যবহারের রীতি ছিল না। কারণ বাংলা লিপি কুটিল লিপি, কোনাকার — তালপাতার পুথিতে লৌহ শলাকা ব্যবহার সেক্ষেত্রে অসুবিধাজনক।

পাকা খাগের ডাঁটা, শর ও কঞ্চির অগ্রভাগ ছুঁচালো করে দোয়াতের কালিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লেখা হত। বাংলা পুথিতে খাগের লেখনী ব্যবহার বেশী হত। কারণ খাগের লেখনীর ধারণ ক্ষমতা অন্যগুলির তুলনায় বেশী। একবার কালিতে ডুবিয়ে একটি গোটা চরণ লিপি করা যেত। তাছাড়া এর অগ্রভাগের সূক্ষ্মতাও তুলনায় তীক্ষ্ণ ও শক্ত।

লিপির বিবর্তনেও পত্র কালি ও লেখনীর একটি গুরুতর ভূমিকা বর্তমান। বিশেষ করে পত্র ও লেখনীর সাবলীলতা লিপি ছাঁদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। লেখনীর অগ্রভাগ যদি সূক্ষ্ম ও সাবলীল না হয়, পত্র যদি মসৃণ না হয় তবে লিপিকরের লেখনী চালনায় তা বাধার সৃষ্টি করে পদে পদে।

খ) বাংলা পুথির আনুষঙ্গিক বহিরঙ্গ উপকরণ ঃ

১) গ্রন্থ পাটা ঃ- পাটা পুট অর্থ আবরণ। পুথির আবরণ বা ঢাকনা হল গ্রন্থ পাটা। পুথিকে দু'দিক থেকে শক্ত কাঠের পাটা দিয়ে সজোরে বন্ধন করতে হত — বাতাস প্রবেশ রদ করার জন্যে। এতে পুথি দীর্ঘদিন অবিকৃত থাকতে পারত।

তুলোট কাগজের পুথির পাটা রূপে নিমকাঠ, কাঁঠাল কাঠ, সেগুন কাঠ, বেল কাঠের খণ্ড তক্তা (প্রয়োজন মত মাপের) পুথির আয়তনের মাপের থেকে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সামান্য বড়ো করে কেটে দিয়ে দু'পিঠ র‍্যাঁদা দিয়ে মসৃণ করে নিয়ে পুথির বহিঃআবরণী রূপে ব্যবহার করা হত। এই পাটাগুলির কোন নির্দিষ্ট মাপ নেই — পুথির মাপের উপর নির্ভর করত পাটার মাপ। এই পাটাগুলিকে কীটনাশক দ্রবণ দিয়ে রঙ করা হত।

এর বেধ সাধারণত ১/২"। এই পাটায় অনেক রুচিশীল পাঠক/প্রয়োজক সুন্দর নক্সা করাতেন

মন্তব্য

যা সে যুগের শিল্পকলা ও শিল্পরুচির পরিচয় বহন করে।

তালপাতার পুথির পাটা রূপে পাকা বাঁশের আবরণ ব্যবহার করা হতো। এমন অনেক তালপাতার পুথি পাওয়া গেছে যার আবরণ রূপে দু'তিনটি তালপাতাকে সূত্র দিয়ে গ্রন্থন করে মলাটের মত করে ব্যবহার করা হয়েছে।

ভূর্জ পত্রের পুথিতে পাতলা কাঠের পাটা ব্যবহার করা হত।

পুথিকে সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী করে রাখতে এই গ্রন্থ পাটাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। পাতাগুলি গুটিয়ে বা কুঁচেকে যায় না — একই রকমভাবে থেকে যায়।

২) গ্রন্থচ্ছদ ঃ- গ্রন্থচ্ছদ বা গ্রন্থ পট্ট হল পুথিকে ধূলা ময়লা ইত্যাদি থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যে বস্ত্র খণ্ড ব্যবহার করা হত তাকে শুদ্ধ পরিভাষায় বলা হয় গ্রন্থচ্ছদ। পাটাকে জড়িয়ে জড়িয়ে এক গজ পরিমাণ চতুষ্কোণ মোটা সালুবস্ত্র খণ্ড দিয়ে বন্ধন করা হত। এই বস্ত্র খণ্ডের একটি কোণে দীর্ঘ বস্ত্র রজ্জু থাকে। বস্ত্র রজ্জুর বিপরীত কোণ থেকে বাঁধা শুরু করে শেষে এই রজ্জু বা দড়ি দিয়ে কষে বাঁধা হতো।

'পুথিকে পুত্রের মত পালন এবং শত্রুর মত বাঁধন' দিয়ে না রাখলে পুথি দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এই বন্ধন দৃঢ়ভাবে না করলে বাতাস পোকা-মাকড় ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না পুথিকে।

৩) তাড়ি ঃ- একটি প্রাচীন সংখ্যা নির্ণয় মাপ। হাতের বুড়ো আঙুল থেকে মধ্যমার অগ্রভাগ দিয়ে পুথির পত্র গুচ্ছের একটি মাত্র দিক ধরা পত্রগুলিকে বলে এক তাড়ি পত্র। এর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। পুথির তাড়ি থেকেই 'পাততাড়ি' শব্দটি এসেছে।

৪) লেতি ঃ- গ্রন্থচ্ছদ সূত্রকে লেতি বলা হয়। গ্রন্থচ্ছদ বা গ্রন্থাবরণী বস্ত্র খণ্ডের একটি কোণে যে রজ্জু বা ফিতে দড়ি রূপে ব্যবহার করা হয় তাকে লেতি বলে। এই লেতি দৈর্ঘে ১ গজ পরিমিত হয় সাধারণতঃ। বস্ত্র খণ্ডের দৈর্ঘের মাপে এর দৈর্ঘ হয়।

৫) গ্রন্থসূত্র ঃ- পুথির পৃষ্ঠার মধ্যস্থলে ছিদ্র করা হত। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে সূত্র প্রবিষ্ট করিয়ে প্রথমে পুথি পৃষ্ঠাকে বন্ধন করা হত। এই বন্ধন সূত্রটিকে বলা হয় গ্রন্থসূত্র।

১৩.৫ ঃ পুথির গঠন-প্রকৃতি

বাংলা পুথির নির্দিষ্ট কোনো মাপ নেই। তবে অধিকাংশ পুথি দৈর্ঘ্যে ১০ থেকে ১৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৪ থেকে ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। অধিকাংশ পুথির দুটি দিকেই লেখা হয়। পুথির পাতার নির্দিষ্ট এক ধরণের ভাঁজ আছে। একটি ভাঁজের অন্তর্গত থাকে পুথির দুটি পৃষ্ঠা। কখনো জোড়া অবস্থায় থাকে। কখনও আবার সেই দুটি পৃষ্ঠা কেটেও নেওয়া হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রথম পিঠে থাকে না, দ্বিতীয় পিঠে থাকে। বিষয়ের অবতরণা করে কোনো একজন দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে পুথির আরম্ভ — অথবা 'কৃষ্ণায় নমঃ'; এরপর বিষয়ে অবতারণা করা হয়। কোনোটি আবার 'শ্রীগণেশায় নমঃ।।' লিখে বিষয়ের অবতারণা করা হয়। বিষয় বর্ণনা কালেই কবির নাম লেখা হয়। যে কবির নাম সকলের দৃষ্টিতে আনার জন্য কবি নামের পর একটি বিশেষ ধরণের চিহ্ন ব্যবহার করেন — তার নাম পুষ্পিকা। এই পুষ্প-চিহ্ন — অধ্যায়ের শেষে বা প্রথমে বা বিষয়ের ভণিতার আগে ও পরে দেওয়া হয়।

পুথির ভিতরে থাকে পুষ্পিকা, ভণিতা, কালজ্ঞাপক শ্লোক, লিপিকর-পরিচয়, লিপিকাল ইত্যাদি।

বাংলা পুথিতে কোনো চরণের শেষে বা আরম্ভে থাকে একধরণের ফুলের মত চিত্রাঙ্কন। এই চিত্রাঙ্কন কী বা কেন এই প্রশ্ন স্বভাবতই পাঠক মনে জাগ্রত হয়। পণ্ডিতরা এই চিত্রাঙ্কনের নাম দিয়েছেন পুষ্পিকা। এই পুষ্পিকা শব্দ আভিধানিক। পুষ্পিকা শব্দ অবশ্যই পুষ্প থেকে এসেছে। পুষ্প ইক আ পুষ্পিকা। 'শব্দ কল্পদ্রুম'-এ এই পুষ্পিকা শব্দের যে অর্থ দেওয়া আছে — তা-ই পরবর্তীকালে অন্য সব অভিধানগুলিতে আছে। অধ্যায়ের শেষে, যে বাক্যে অধ্যায়ের নাম আর বিষয়ের উল্লেখ থাকে তার নাম পুষ্পিকা। তবে বিভিন্ন পুথি দেখে এই সিদ্ধান্তও করা যায় যে, অধ্যায়-সমাপ্তি-বাক্যের আগে বা পিছে অথবা শুধু পিছে এক বা একাধিক পুষ্প-চিহ্ন এঁকে বাক্যটিকে অন্য বাক্য থেকে পৃথক করা হত। এর নামও পুষ্পিকা। এই পুষ্প এখন দলবৃন্তহীন শূন্যের রূপ গ্রহণ করেছে। আবার পূর্ব-পশ্চাৎ একটি পুষ্প চিহ্ন অঙ্কণ করেও ভণিতা লেখা হত। এই শূন্য বা পুষ্প বিভিন্ন দলে বিভক্ত। এখ দল, তিন দল, পাঁচ, ছয়, সাত ও আট দলে বিভক্ত। একই পুথিতে ফুলের মতন পুষ্প যেমন দেখা যায়, সেইরকম দলবৃন্তহীন শূন্যের মত পুষ্প-চিহ্নও দেখা যায়। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুথিতে আবার

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো পুষ্প-চিহ্ন নেই। সংস্কৃত শ্লোকের পর যখন পদ আরম্ভ হয়েছে, সেখানেও পুষ্প-চিহ্ন নেই। সংস্কৃত শ্লোকের পর যখন পদ আরম্ভ হয়েছে, সেখানেও পুষ্প-চিহ্ন নেই।

কা -আ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ, পইঠো কাল।। ধ্রু

এই চর্যাপদ হল বৌদ্ধও দোহা গান। এখানে নির্বাণ-তত্ত্বের কথা বলেছেন কবি, সুতরাং দেবভাবনার প্রকাশ এখানে নেই। পুথিকে কবি ও লিপিকরগণ দেবতার মতো সম্মান করতেন। চন্দন মিশ্রিত ফুল দেবতার উদ্দেশে নিয়োজিত। পুথি যেহেতু দেবতার বেদিতে স্থান পেত সেহেতু ঐ চন্দন মিশ্রিত ফুল পুথিতে সমর্পিথ হত — এই ভাবনাকেই মূল্য দেওয়া হয়েছে পুথিতে পুষ্প-চিহ্ন ব্যবহারে। মধ্যযুগের সাহিত্য মূলতঃ দেবভাবনামূলক। দেবতা কখনও পৌরাণিক, কখনও লৌকিক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চৈতন্য-ভাবনা তথা বৈষ্ণবধর্ম। পুষ্প-চিহ্নের সূত্রপাত এই দেবাশ্রয়ী বাংলা সাহিত্য থেকে। গুরুবাদী চর্যাগানে তাই পুষ্প-চিহ্ন নেই।

ভণিতা ঃ- একটি পয়ারের শেষে কিংবা একটি পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ের শেষে কবি নিজের নাম নিজেই জানিয়েছেন — এই প্রয়োগকেই ভণিতা বলে। সুতরাং ভণিতা হল যে কোনো লেখার সঙ্গে লেখকের নাম-স্বাক্ষর। এই ভণিতা বিভিন্ন আকারে হয়। ভনে, ভনই, কহে, বলে, গাইল, বিরচিল, ভণতি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারে এই ভণিতার বিভিন্ন রূপ পাই।

ভণ্ ক্ত আপ ভণিতা

কবি নিজের কাব্যে নিজের নাম প্রকাশ করবেন — এটাই স্বাভাবিক।

ভণিতা থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি। কবির পরিচয়, লিপিকরের পরিচয় ইত্যাদি। জয়দেব বারবার 'ভণতি' বা ভণয়তি — এই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। ভণতি থেকে চলিত বাংলায় শব্দটি হল ভণই। মধ্যযুগের গীতিকবিতায় 'ভণই' ক্রিয়াপদ যুক্ত স্বাক্ষর খুব বেশি পাওয়া যেত। ক্রমে এক একটি কবি-স্বাক্ষর মূলক পদ হয়ে উঠল অত্যন্ত পরিচিত — যেমন ''ভণই বিদ্যাপতি শুন বরনারী''। যখন পদাবলীর পুথি সংকলিত হয়েছে তখন লিপিকরেরা অনেক সময় কবি স্বাক্ষর-জ্ঞাপক সম্পূর্ণ পদটি না লিখে সংক্ষেপে 'ভণই' ইত্যাদি বলে কাজ সেরেছেন 'ভণই' ইত্যাদি থেকেই ভণিতা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে সুকুমার সেন মনে করেন। ('বৈষ্ণব পদাবলি', সুকুমার সেন সংকলিত, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৭, পৃ.৬) ভণিতা পুথিতে কীভাবে ও কোথায় থাকবে তার খুব সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। যদি পুথিটি পদ-সংকলন হয় তাহলে প্রতিটি গীতের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভণিতা থাকবে। যদি বিদ্যাপতির পদসংকলনের কোনো পুথি থাকে তাহলে প্রতিটি পদেই থাকবে বিদ্যাপতির ভণিতা। যদি বিভিন্ন কবির রচিত পদ-সংকলন হয় তাহলে বিভিন্ন কবির নাম তাঁর রচিত পদে ব্যবহৃত হবে। যেমন চর্যাগীতির পুথিতে। আবার যদি গাথা-কাব্যের পুথি হয়, যেমন মঙ্গলকাব্যের বা চৈতন্য-জীবনী কাব্যের পুথি — তাতে প্রত্যেকটি খণ্ডের বা সর্গের অন্তে কবির ভণিতা থাকবে। এক সর্গ বিশিষ্ট ছোটো পুথি হলে সেই পুথিতে একবারই কবির নাম থাকবে ভণিতা হিসেবে। কখনও কখনও সর্গের প্রথমে এবং শেষে — দুই জায়গাতেই ভণিতা থাকবে। সংখ্যায় কম হলেও সর্গের মধ্যেও ভণিতা থাকে। চর্যাগীতির কোনো কোনো পদে একেবারে প্রথমে ভণিতা আছে। যেমন একটি গানের প্রথম ছত্রেই আছে —

'দিহ করিও মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জানও'

(চর্যাগীতিকোষ, ফটোমুদ্রণ, নীলরতন সেন, প্রথম সংস্করণ, পৃ-২, দে বুক স্টোর, ১৯৭৭, পৃ.২)

আমরা এর আগে দেখেছি পুথির ক্ষেত্রে লিপিকরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই পুথির ভণিতা কি কবির স্বাক্ষর অথবা লিপিকরের নাম — এ বিষয়ে একটা সংশয় দেখা যায়। এখানে স্পষ্টতই বুঝে নেওয়া দরকার যে পুথিতে রচয়িতার নামই মূল ভণিতা হিসেবে প্রদত্ত এবং গৃহীত হয়। কিন্তু অনেক পুঁথিতে কবি-স্বাক্ষর সমন্বিত ভণিতার সঙ্গেই লিপিকরের নাম ইত্যাদিও দেওয়া থাকে। অর্থাৎ একটি ভণিতা থাকে কবির, আর একটি ভণিতা থাকে লিপিকরের। যেমন দেখতে পাই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথিশালায় ২০নং পুথি 'প্রেম তরঙ্গিনী'তে (দশম একাদশ দ্বাদশ)। এখানে কবির ভণিতা থাকলেও লিপিকর বিশ্বনাথের নামও দেওয়া হয়েছে — এই পুথিতে তার প্রমাণ দেখা যায়।

'শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রাণচন্দ্র বাবুজী দেওয়ান।
বর্ধমানে সামবাজারেতে যার ধাম।
শুনিলেন এই গ্রন্থ শ্রবণ সুখদ।

পরম জ্ঞানের এই আকর আস্পদ।।
উল্লাস বাড়িল ভক্তি সহিতে বিজ্ঞান
লেখাইতে হংস রোজে কবি অনুমান।
ভৃত্য আজ্ঞা দ্বারে শ্রী বিশ্বনাথ লেখকেরে।
আনিলা পাহারপুর তাহারে।।

আজ্ঞা দিল বিশ্বনাথ জয় হরিদ্বারে।
প্রেম তরঙ্গিনী লেখি সাঙ্গ করিবারে।।'

কিন্তু পুথির ভণিতা বলতে নিঃসন্দেহে বোঝানো হয় কবির স্বাক্ষরকে। অন্য ক্ষেত্রে লিপিকরের ভণিতা উল্লেখ করবার সময় বিশেষভাবে তা যে লিপিকরের ভণিতা তা বলে দিতে হবে। লিপিকরের কাজ হচ্ছে পুথি লিখন এবং অবিকৃতভাবে মূল পুথির রচয়িতার নাম লিপিবদ্ধ করা। সেটিই হল পুথির ভণিতা।

ভণিতার ভাষা বহু বিচিত্র হতে পারে। ভণিতা শব্দটির প্রয়োগ থাকবেই এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ভণে, ভণই, ভণন্তি, ভণহি, কহে, বলে, গাইল, গায় ইত্যাদি ছাড়াও অন্যরকমের ভণিতার উদাহরণ আছে। যেমন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পুথিশালার ৩০ নং পুথিটি একটি সংকলন। সেই পুথির উদাহরণ প্রদর্শিত হল —

'ভুজে বন্ধনে নাহি অবকাশ।
বিপদ নেহারই গোবিন্দ দাস।।'

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ সংখ্যক পুথি

'জয় রামানন্দ দাস মহাশয়
জলধর বলি যারে করিল নিশ্চয়।।
রামানন্দ পদ মনে করিয়া স্মরণ।
মূল গ্রন্থ ক্রমে জেই করিয়ে লিখন।।'

অনেক সময় ভণিতা থেকে জানা যায় কবি কোথাকার অধিবাসী। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পুথিশালার ১২ নং পুথিতে আছে —

'ভূবর্ধমানেন্দ্র রাজা ধিরাজেন্দ্র
তেজচন্দ্র গুন রাখি।
সুখে রাজা করি স্বলীলা সম্বারি
এখানে বৈকুণ্ঠ বাসি।।
তাঁর বর নারী কমল কুমারী
মহাবর্শন খ্যাতি যার
শ্রীকৃষ্ণ রুক্ষিম সংবাদ কাহিনি
প্রকাশিত হয় তার।।'

মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই রাজা বা জমিদার বা ধনবান ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় কবি পুথি লিখছেন —

'কাতর হোই রোই শিব সিংহ হু বভুঁ
জীবন মঠ পটীজ্ঞান
হরি হরি রসনা বোলাই ঘন ধ্বনি
কবি বিদ্যাপতি ভান।।
(১০৯৬ সালের পুথি)
ভুরসিষ্ট পরগনায় নৃপতি নরেন্দ্র রায়
মুটুটি ক্ষিয়তি দেশে
ভারত চন্দ্ররায় অন্নদামঙ্গল গায়
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।।'

ভণিতার সঙ্গে অনেকসময়ে যাকে কবির আরাধ্য দেবতার উল্লেখ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর পুথিতে পাই কবি দেবী বাসুলী বা বাসলীর আদেশে পুথি লিখেছেন —

'অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
দেবী বাসলী চরণে।।'

অন্য একটি পুথির ভণিতায় দেখি —

মন্তব্য

‘রাধাকানু চরন ভাবি নিরন্তর
কর্ণপর্ব বিরচিল দৈবকীকোঙর।’

এছাড়া বিভিন্ন কারণে কবিগণ ভণিতা লিখেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ নং পুথি ‘শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিনী’ সংবাদ-এ রানির ভণিতায় কাব্য লেখার কথা বলেছেন লিপি —

‘এজে পুস্তক লিখেছি মা দেখ তুমি
মহারাণীর নাম ভণিতায়।
যদি ইথে দোষ থাকে শোধন করিবে তাকে
নিজগুণে খোমিবে আমায়।।’

আর এক জায়গায় কবি ভণিতায় লিখেছেন —

‘‘মা শ্রীমতি মহারাণি কমল কুমারী।
ঠাকুরাণি শ্রীচরণে নিবেদন করি।।’

এইভাবে বিভিন্ন ধরণের ভণিতার অবস্থান আমরা দেখলাম।

চিহ্ন

পুথিতে প্রাপ্ত নানাধরণের চিহ্ন এবং বিরাম-চিহ্ন কেমন হত তা আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করতে পারি। একটি চরণের পর আর একটি চরণ বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয় দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদের চিহ্নটি। প্রথম চরণের শেষে এক দাঁড়ি (।) এবং দ্বিতীয় চরণের শেষে দুই দাঁড়ি (।।) দেওয়া হয়। প্রথম দাঁড়িকে বলা হয় এক কোষী এবং দ্বিতীয় চরণের শেষের দুই দাঁড়িকে বলা হয় দুই কোষী। কোনো কোনো পুথিতে প্রথম চরণের শেষে থাকে একটি ছোট ‘শূন্য’ এবং এক দাঁড়ি যেমন ০১; দ্বিতীয় চরণে বা দ্বিপদীর শেষে থাকে একটি শূন্য এবং দুটি দাঁড়ি যেমন ০।।; আবার কোথাও দ্বিপদীর শেষে ঃ।।ঃ এই রকম চিহ্নও থাকে।

লিপিকাল

প্রত্যেক পুথিতে রচনাকাল ও লিপিকাল নির্দেশ করা পুথির গঠনের আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। এই লিপিকাল নির্দেশ করা হত হেঁয়ালির ভাষায়। তাছাড়া বহু ধরণের কালাঙ্ক অনুসরণ করা হত।

১৩.৬ ঃ পুথির লিপিকার ও পাঠক/গায়েন

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত (উদ্ধারিত, আবিষ্কৃত কিংবা সংরক্ষিত) বাংলা পুথির প্রায় সবই নকল পুথি। মূল পুথি নয়। স্বয়ং কবির স্বহস্ত বা কবি কর্তৃক নির্দেশ লিখিত পুথি আমরা পাই নি। পুথিগুলি যাঁরা লিপি করেছেন তাঁদের লিপিকর বলা হয়। বস্তুত যিনি লিপিকরেন তিনিই লিপিকর। আসল বা নকল যাই হোক না কেন।

আমাদের আলোচ্য লিপিকরগণ সকলেই পুথি নকল করেছেন — সে দিক থেকে এঁদের নকলকার বলাও চলে।

মুদ্রা যন্ত্রের আবিষ্কার এবং বহুল প্রচারপর্ব সময়ের আমাদের সাহিত্য নিদর্শনকে পরম্পরায় রক্ষা করার, প্রচার ও বিস্তার করার মহান দায়িত্ব লিপিকরগণ কখনো বংশ পরম্পরায় কখনো এককভাবে পালন করে এসেছেন। অধিকাংশ পুথিতে দেখতে পাই, লিপিকর জানিয়েছেন ‘‘যথা দৃষ্টং/ দিষ্টং তথা লিখিতং, লিক্ষক দোষ নাস্তি’’ ইত্যাদি। এর অর্থ, যেমন দেখেছি তেমন লিখেছি, লিপিকরের কোন দোষ নেই। দোষ যদি থাকে, তবে দৃষ্ট পুথিটির। একটি পুথি সামনে রেখে, তার নকল করতেন লিপিকর। সেই প্রত্যক্ষ পুথিটি আদর্শ পুথি বলে মেনে নিয়েই তিনি (বা তাঁকে যিনি লিপি কার্যে নিযুক্ত করেছেন) অনুলিপি করতেন।

কিন্তু এখানে একটি গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয়। বিভিন্ন পুষ্পিকা দৃষ্টে অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না — খুব সম্ভবত লিপিকর মূল বা আদর্শ পাঠ দেখে দেখে লিপি করতেন না, তিনি পাঠ শুনে শুনে লিপি করতেন। এই অনুমানের সপক্ষে কারণগুলি হল ঃ

১) লিপিকর অনেক স্থলেই পাঠকের নাম দিয়েছেন।
২) লিপিকরের লিপির বানান (অশুদ্ধ) ব্যবহার।
৩) লিপিকর পাঠকের পয়ারের সুরটিও অনেক স্থলে ব্যবহার করে ফেলেছেন। যেমন —

মন্তব্য

'গোরা রূপেরও মাধুরী কভু নাহি হেরি।' 'রূপে'র স্থলে লিপিকর 'রূপেরও' স্বরান্ত 'ও' কারও লিপিবদ্ধ করেছেন।

লিপিকর পাঠকের নাম ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে হয়তো এটাই বলতে চেয়েছেন — অমুক পাঠক-আদর্শ পুথি পাঠ করেছেন। তিনি তা শুনে শুনে লিপি করেছেন।

অবশ্য 'পাঠক'কে সম্পাদক রূপেও ভাবা যেতে পারে। যিনি লিপিকৃত পুথিটির সঙ্গে মূল পুথিটির পাঠ মিলিয়ে সংশোধন করে দিয়েছেন। ইংরাজীতে বলা হয় যাঁকে।

কিন্তু এই অনুমান-এর যুক্তি টেকে না, যখন পুথিতে বিস্তর বানান অশুদ্ধি, উচ্চারণ অনুযায়ী ভাষা লিপির ব্যবহার দেখি। পাঠকের উচ্চারণ ত্রুটি সমেত পুথি লিপি থেকে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয় যে, লিপিকর পাঠ শুনে শুনেই লিপি করেছেন।

আমরা সাধারণতঃ পুথির পুষ্পিকা অংশে লিপিকরের নাম পরিচয় জানতে পারি। তবে নামের সঙ্গে বাসস্থান-এর কথা, লিপি দক্ষিণার কথা এবং পুথির মালিকের নাম-ধাম কিংবা লিপি করানোর কারণটিও জানতে পারি কোন কোন পুথিতে।

লিপিকরগণের বিশদ পরিচয় জানা যায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই।

লিপিকরগণ অধিকাংশই ছিলেন পেশাদার লিপিকর। লিপি নকল করাই ছিল তাঁদের জীবিকা। লিপি নকলের বিনিময়ে লিপিকর অর্থ দান-বস্ত্র ইত্যাদি পেতেন।

লিপিকরগণ অধিকাংশই ছিলেন লিপি শিল্পী। লিপি কুশলতাই তাঁদের প্রধান যোগ্যতা বিবেচিত হত। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা-ভাষা শুদ্ধি তথা ব্যাকরণ জ্ঞান ইত্যাদি ছিল গৌণ। একই লিপিকর — মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত প্রায় সব বিষয়েরই পুথি নকল করতেন। পুষ্পিকায় তাঁরা সকলে প্রায় একই 'গৎ' ব্যবহার করতেন, তেমন বৈচিত্র্য দেখা যায় না। যেমন — লিপিঅন্তে — 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' ইত্যাদি, 'ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ', 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম' ইত্যাদি, 'পুস্তক চুরি' করলে অভিশাপের কথা এইসব বাঁধা গৎ এঁরা উত্তরাধিকারে ব্যবহার করেছেন।

অনেক সময় লিপিকরগণ লিপিকে শৈল্পিক সৌন্দর্য দান করেছেন। দক্ষ লিপিকরগণ লিপিছাদের ধরন সর্বত্র একই রাখার চেষ্টা করেছেন। যেমন — শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পুথির ২ ধরণের লিপিছাঁদের সর্বত্র স্বতন্ত্রভাবে এবং স্ববৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

পেশাদার লিপিকর ছাড়াও অনেকে ব্যক্তিগত সংগ্রহার্থে নির্ভুলভাবে আদর্শ পুথিকে নকল করেছেন। বৈষ্ণব বিষয়ক পুথিগুলিতে লিপিকরের নাম না থাকায় এই অনুমান।

লিপিকরগণ লিপি বিবর্তনের ক্রম সূত্রটিকে ধরে রেখেছেন — একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে এখানে লিপি ছাঁদই মুখ্য। ভাষা বিচার গৌণ। কারণ একই সময়ের ভিন্ন ভিন্ন পুথিতে মোটামুটি লিপিছাঁদের মিল দেখা যায়, ভিন্নতাও কিছু কিছু থাকে। কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বাতন্ত্র্য লিপির বানান-ভাষা ইত্যাদির পার্থক্য বিস্তর। মনে হয়, বাংলা ভাষার মধ্যযুগের ব্যাকরণ (যদিও বাংলা ব্যাকরণের কোন আদর্শ সে যুগে ছিল না, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসৃত রূপকেই ধরতে হবে) লিপিকরগণের অশিক্ষায় এলোমেলো হয়ে গেছে। এই কথার মধ্যে যুক্তির অভাব নেই। সংস্কৃত শব্দ বা অক্ষরের বাংলা উচ্চারণকেই লিপিকরগণ লিপি করেছেন। যেমন — সং পদ্ম বাংলা উচ্চারণ 'পদ্দ'। লিপিকর পদ্দ লিপি করেছেন। 'যুধিষ্ঠির' — উচ্চারণ (পাঠকের) 'যুধিরস্থির' হয়েছে, লিপিকর লিপি করেছেন, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি। তিনটি 'স' কার অর্থাৎ শ, স, ষ — এর যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন লিপিকরগণ। শুভ যুভ / যুব, শিব সিব, সত্য শর্ত্ত ইত্যাদি। ন, ণ-এর ব্যবহারেও যথেচ্ছার দেখি — লবণ লবন, নিল ণিল ইত্যাদি। যুক্তাক্ষর-এর ক্ষেত্রেও নানা বিকৃতি ঘটিয়েছেন লিপিকরগণ — সত্য শর্ত্ত, মিথ্যা মির্থ্যা, পুণ্য পুর্ন্ন ইত্যাদি।

বাংলার পুথির লিপি পাঠকঃ

ক) আমরা পুথির পুষ্পিকায় লিপিকর-এর নাম এবং অনেক স্থলে পাঠকের নামও পাই। মনে হয়, অশিক্ষিত লিপিকর ঠিক মত পুথি পাঠ করতে অপারগ হওয়ার কারণে অথবা লিপি অপেক্ষাকৃত দ্রুত করার কারণে পুথির মালিক বা প্রযোজক কিংবা লিপিকর পাঠক নিযুক্ত করতেন। যিনি মূল বা আদর্শ পুথি পাঠ করতেন এবং তা শুনে শুনে লিপিকর লিপি করতেন। তিনি যেমন যেমন শুনতেন তেমনটি লিপি করতেন। অনেকটা পূজার পূজক ও তন্ত্র ধারকের সম্পর্কের মতই লিপিকর ও পাঠকের সম্পর্ক অন্বিষ্ট ছিল। পাঠক সাধারণত পাঠকুশলী তুলনায় বিষয় জ্ঞানী হতেন। তাঁর পাঠ উচ্চারণ শুদ্ধ না হলে পুথির লিপিতে ভুল হয়ে যায়। কারণ লিপিকর পাঠকের উচ্চারণকেই ধরে রাখার চেষ্টা

করতেন। লিপিকরের কাজ লিপি করা, পাঠকের কাজ পুথিটিকে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে পাঠ করা। মন্তব্য

খ) পাঠক একজন সম্পাদকের বা সংশোধনের দায়িত্ব পালন করতেন তিনি লিপির পাঠ স্বয়ং অথবা লিপিকর দিয়ে সংশোধন করতেন বা করাতেন। তিনি পাঠ মিলিয়ে দিতেন। আধুনিক 'প্রুফ রিডার'-এর কাজও তাঁর ছিল বলে মনে হয়। তাই পুথিতে দেখা যায় — অনেক গ্রহণ ও বর্জন, তোলাপাঠ।

গ) বর্ণাশুদ্ধি, পাঠশুদ্ধিও তিনি করতেন।

ঘ) তাঁর পাঠ উচ্চারণ বিকৃতি থাকলে তার প্রভাব পুথির লিপিতেও অর্পিত হত। পাঠক অসতর্ক হলে লিপিতেও বিকৃতি ঘটত।

ঙ) পাঠক যদি কবি স্বভাব গুণ সম্পন্ন হতেন সেক্ষেত্রে তিনি আদর্শ পুথির মধ্যে মধ্যে নকল পুথিতে নিজ কবিত্ব শক্তির প্রকাশ ঘটাতেন। এভাবে প্রক্ষেপের দায়ও তাঁর উপর বর্তায়। তাই একই বিষয়ের একই কবির ভণিতায় বিভিন্ন পুথিতে পার্থক্য দেখা যায়।

চ) পাঠক যদি যে বিষয়ের পুথি সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞ হতেন বা কোন শব্দ পড়ার সময় বুঝতে না পারতেন তাহলে সেই শব্দ বর্জন করে নতুন শব্দ সংযোজন করতেন। অনেক সময় পাঠকের বিষয় জ্ঞানের অজ্ঞতাও পুথি পাঠে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ছ) অনেক সময় পুথির মালিকই পাঠক হতেন। তিনি লিপি কুশলী না হওয়ায় লিপিকরের দ্বারস্থ হতেন।

পাঠকের ভূমিকা পুথির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

বাংলা পুথির গায়েন ঃ-

গায়েন শব্দটির অর্থ গায়ক। যিনি কবির রচনাকে তাঁর গায়েন বৃত্তির দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতেন। কবির কাব্যের বা পালার প্রচারক হলেন এই গায়েন সম্প্রদায়। বাংলা পুথির ব্যাপক বিস্তার ও প্রচারে উত্তরাধিকারে তাকে বাঁচিয়ে রাখার মহান দায়িত্ব পালন করেছেন এই গায়েন সম্প্রদায়। গায়েন কবির রচনা পালা-গান-সুরতাল সহযোগে আসরে আসরে নিবেদন করতেন। কথকতা ও ব্যাখ্যাও তিনি করতেন।

গায়েনের কাছ থেকেও লিপিকর পুথি লিপি করতেন। গায়েন নিজের পেশার স্বার্থে গান বা পালা কবিকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। অথবা গায়েন-এর মাধ্যমে কবি তাঁর কাব্যের প্রচার করাতেন। গায়েনগণ অনেকটা স্বভাব কবি। কবিওয়ালা। কবির পালাকে আসরের দর্শকের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কবির রচনায় অনেক প্রক্ষেপ ঘটিয়ে ফেলতেন। গায়েন তাঁর সংযোজিত ও রচিত পদটি মূল / জনপ্রিয় কবির ভণিতায় চালিয়ে দিতেন। এভাবেও প্রক্ষেপ ঘটেছে, দেখা দিয়েছে নানা সমস্যা। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-গোবিন্দদাসাদির ভণিতায় অনেক নিম্নমানের পদ যেগুলি পাওয়া গেছে সেই পদগুলির মূল স্রষ্টা হয়তো এই গায়েন সম্প্রদায়।

দ্বিতীয়ত, গায়েন এক কবির পদ অন্য কবির ভণিতায় আসরে গেয়ে দিয়েছেন। আমরা যে একই পদ ভিন্ন ভিন্ন কবি ভণিতায় পাই সেগুলির ক্ষেত্রেও মূল অবদান এই গায়েন সম্প্রদায়ের বলেই মনে হয়। এর ফলে ইতিহাস রচনায় বিভ্রান্তি বেড়ে গেছে।

আমরা এখানে বাংলা পুথির গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে, পুথির বিবর্তনের একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে চেয়েছি। যে সমস্যা উদ্ভুত হয়েছে তার নানা কারণ অনুমান করতেচ চেয়েছি, যুক্তিসঙ্গতভাবে সেইসব কারণগুলির বৃহৎ আলোচনা ও বিশ্লেষণে বাংলা পুথির নানা ত্রুটি ও অপূর্ণতা দূর হতে পারে বলেই বিশ্বাস।

লিপিকরের পুথিটি নকল পুথি। এক্ষেত্রে পুথির প্রচার ও বিস্তারের তিন কারিগর লিপিকর — পাঠক এবং গায়েন-এর (ক) শিক্ষা, (খ) সামাজিক অবস্থান, (গ) নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়, (ঘ) অর্থনৈতিক অবস্থা, (ঙ) মানসিক অবস্থা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা সব কিছুই জড়িয়ে আছে। পুথির সম্পাদন ও মূল্যায়ন করার সময় সেসব দিকও ভেবে দেখা প্রয়োজন। বাংলা পুথির গঠন ও প্রকৃতির একটি সার্বিক রূপ নির্মাণ করা এক দুরূহকর্ম। একার পক্ষে এবং একটি জীবনে তা সম্ভব নয়। এখনও কত হাজার হাজার পুথি লোকচক্ষুর আড়ালে পড়ে আছে। সে সব পুথির উদ্ধার এবং পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হলেই বাংলা পুথির ইতিহাস রচনা সম্ভব হবে।

পুথির লিপিকর ও পাঠকের একটি সংক্ষিপ্ত জাতি বিচার ঃ

বাংলা পুথির লিপিকর, পাঠক এবং প্রযোজক বা মালিক এঁরা সাধারণত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হতেন না। কারণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞানী। তাঁরা শাস্ত্রানুমোদিত নয় এমন সব লৌকিক

মন্তব্য

গল্প-কাহিনীতে আসক্তিহীন ছিলেন। কিন্তু দেশের জনসংখ্যার সামান্য অংশ তাঁরা। তবু সাধারণের রস পিপাসা মিটাবার জন্যেই লৌকিক ভাষায় অনুবাদ-অনুসৃতি, লৌকিক দেব-দেবী কাহিনির স্রষ্টা কবিগণ প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চ বংশীয়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কুলোদ্ভব।

ক) কৃত্তিবাস ওঝা — উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ।
খ) গুণরাজ খান — মালাধর বসু — কুলীন কায়স্থ।
গ) জয়দেব — ব্রাহ্মণ ছিলেন।
ঘ) বিদ্যাপতি — ব্রাহ্মণ ছিলেন।
ঙ) দ্বিজ চণ্ডীদাস — ব্রাহ্মণ ছিলেন।
চ) কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী — ব্রাহ্মণ ছিলেন (চণ্ডীমঙ্গলের কবি)।
ছ) ঘনরাম চক্রবর্তী — ব্রাহ্মণ ছিলেন (ধর্ম মঙ্গলের কবি)।
জ) গোবিন্দ দাস — উচ্চকুল জাত।
ঝ) জ্ঞানদাস — উচ্চকুল জাত।

কিন্তু এঁদের কাব্যের পাঠককুল সাধারণ বর্ণের জনগণ। সাধারণের রস পিপাসা মিটাতে প্রথম উদ্যোগী পুরুষ উচ্চবর্ণের হলেও তাঁদের কাব্যের পাঠক-শ্রোতাগণ কিন্তু অশিক্ষিত জনগণ। সাধারণ জনগণের আশা-আকাঙ্খা মেটানোর দায় তাঁরা প্রাথমিকভাবে তুলে নিলেও সেই দায় উত্তরাধিকারে সঞ্চার করে রাখার মহান কর্তব্য পালন করেছেন সমাজের সাধারণ জনগণ, এঁরা সকলেই রসপিপাসু। পুথির লিপিকরগণের পদবী দৃষ্টে মনে হয় এঁরা অধিকাংশই সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ নন —

নন্দী, মাল, দাস (অবৈষ্ণব), দে (বণিক), মোদক, পাল, পালিত, বারিক, মণ্ডল, তেলি, মিস্তিরি, ঘলুই, কৈবর্ত, সূত্রধর, মালাকর, হাজরা, আদক, ব্রজবাসী (বোষ্টুম), নায়েক, মল্ল, চন্দ্র/চন্দ, তাঁতি, বাগ, বন্ধু, কুণ্ডার, ভুঁই, সামন্ত ইত্যাদি।

এদের ভীড়ে কদাচিৎ দু'চার জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পদবীও মেলে — চট্টরাজ (ব্রাহ্মণ), সিংহ, সরকার, মুখোপাধ্যায়, দেবশর্মা ইত্যাদি।

পাঠকগণ সাধারণত পুথিগত বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। আর সে যুগে পড়াশোনা উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই পাঠকগণ সাধারণতঃ উচ্চবর্ণের হতেন। তাঁদের নামের পদবী থেকেই তা স্পষ্ট হয় —

কানাই সিংহ, বিষ্ণুপদ পাঠক, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন চট্টরাজ, রাধা মাধব দাস দত্ত ইত্যাদি।

১৩.৭ ঃ আদর্শ পুথি

আদর্শ পুথি কাকে বলব ? এর উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যবাংলায় যেসব পুথি পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত তার প্রায় সবগুলিই নকল পুথি। আদি যুগের নিদর্শন চর্যাপদের পুথিটি একটি টীকা সর্বস্ব পুথি। বাছাই করা কিছু কবির ৫০টি গীতির উল্লেখ করে তার টীকা রচনা করেছেন মুনি দত্ত। আধুনিক পরিভাষায় এটিকে সম্পাদিত গ্রন্থ বলা যেতে পারে। মূল চর্যার কোন পুথি পাওয়া যায় নি। তাই তার কোন আদর্শও সংরক্ষিত নেই। মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রাচীন বলে যে পুথিটি আমাদের হস্তগত সেটিও খণ্ডিত এবং নকল পুথি — 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন', কবি বড়ু চণ্ডীদাস। মূল পুথি তো মেলেই নি, দ্বিতীয় কোন নকল পুথিও মেলেনি এ পর্যন্ত। তাই আদর্শ পুথির ধারণা এখানেও পাওয়া যায় না। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' নকল পুথি, তার প্রমাণ —

১) পুথিতে একাধিক হস্তলিপি বর্তমান। বসন্ত রঞ্জন রায়ের মতে তিন জন লিপিকর।

২) ১৩৩টি তোলা পাঠের কন্টকতার সমাকীর্ণ।

৩) দু'ধরণের লিপিছাঁদ আছে। ফলে আদর্শ/মূল পুথিটি কেমন ছিল তা জানা যায় না।

আদর্শ পুথি কোনটি ?

ক) স্বয়ং কবির স্বহস্ত লিখিত পুথি।

খ) স্বয়ং কবি যদি লিপি অনভ্যস্ত হন এবং সেজন্য তিনি কোন লিপিকর দ্বারা লিপি করান

তাঁর গ্রন্থ, সেটি।

গ) কবির সমসাময়িককালের এবং কবির বাসস্থানের নিকটবর্তী স্থানের পুথি।

ঘ) কবির বংশ পরম্পরায় রক্ষিত অনুপিপিত পুথি।

ঙ) পুথির বিষয়ে বিদগ্ধ এবং শিক্ষিত লিপিকর বা সংশোধকের সংশোধিত পুথি।

চ) একই বিষয়ের একাধিক নকল পুথির মধ্যে যেটি সবচেয়ে প্রাচীন এবং যেটির পাঠ ও বানান তুলনায় শুদ্ধ সেই পুথি।

(ছ) একই বিষয়ের একাধিক নকল পুথির মধ্যে যেটিকে সবচেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে সেটিকে আদর্শ করে অন্যান্য পুথির পাঠভেদগুলিকে ফুটনোটে উল্লেখ করতে হবে।

(জ) যেটি সবচেয়ে বেশী নির্ভুল এবং অখণ্ড বা সম্পূর্ণ সেটিকে আদর্শ পুথি রূপে গ্রহণ করতে হবে।

আদর্শ পুথিতে থাকতে হবে ঃ

১) বিষয়ের সঙ্গতি।

২) বানানের সঙ্গতি। অর্থাৎ একই শব্দ সর্বত্র একই বানানে অভিন্ন থাকবে। কিন্তু নকল পুথিতে একই শব্দ ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বানানে লিপিত।

৩) শ্লোকের সঙ্গে পদের সঙ্গতি থাকতে হবে।

৪) ভাষার সঙ্গতি থাকতে হবে।

কৃত্তিবাস কবির 'শ্রীরাম পাঁচালী', কাশীরাম দাসের 'মহাভারত পাঁচালী', মঙ্গল কাব্যগুলির ক্ষেত্রে এবং বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে আদর্শ পুথি নির্বাচন করা দুরূহ। কারণ এইসব পুথির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ফলে শত শত নকল নবীশের হস্তে পাঠকের আত্ম কবিত্ব বয়নের অসংযমে প্রায় প্রতিটি পুথির প্রতিটি পত্র, প্রতিটি চরণে চরণে ভিন্নতা দেখা যায়। কালে কালে রুচিতে রুচিতে বদলে রূপ বদলে গেছে, কেবল কবি ভণিতাটুকু বাদ দিয়ে। কেবলমাত্র চৈতন্য চরিত গ্রন্থ, ভাগবত অনুবাদ কাব্যের ক্ষেত্রে একটা ঐক্য দেখা যায়। এখানে বানানাদির কিছু ভুলভ্রান্তি চোখে পড়ে কিন্তু বিষয় সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ আছে।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে শর্তাবলী ঃ

১) পুথির (আসল ও নকল যাই হোক) অক্ষর লিপি অক্ষত রাখতে হবে।

২) অসঙ্গতি বিবেচিত হলে সেখানে চিহ্নিত করে পাদটীকায় অনুমিত সঠিক পাঠ উল্লেখ করতে হবে। কেন অসঙ্গতি তা বোঝাতে হবে।

৩) পুথি সম্পাদকের উদ্দেশ্য কবির মূল রচনার নিকটবর্তী হওয়া, ছন্দ-অর্থ-ভাব-ভাষার সুসমঞ্জস একখানি নতুন কাব্য গড়ে তোলা নয়।

৪) একটি পুথি নির্বাচন করে সেই বিষয়ের অন্যান্য নকল পুথিগুলিও যতগুলি সম্ভব খোঁজ করে ভালো করে পড়তে হবে, মেলাতে হবে, পাঠভেদ থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে। এবং অবশ্যই ঐ বিষয়ের উপর দখল থাকতে হবে। সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলি ভালো করে পড়তে হবে।

৫) কবি মানসিকতা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

৬) মনে রাখতে হবে মধ্যযুগের প্রায় সব পুথি সাহিত্যই গেয়। সুর আর আবৃত্তির মধ্যে তফাৎ আছে। সুরে ছন্দের ফাঁক-ফোঁকর ভরাট হয়ে যায়। কিন্তু আবৃত্তির সময় তা কানে বাজে। কবিগণও ছিলেন প্রায় সকলেই সুর জ্ঞান তাল জ্ঞান সম্পন্ন। তাই ছন্দ ত্রুটি সংশোধন স্বয়ং না করে পাদটীকায় তার উল্লেখ করা উচিত।

মন্তব্য

১৩.৮ ঃ অনুশীলনী

১। পুথির সংজ্ঞা নিরূপণ করুন ও বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

২। একটি পুথি লেখার জন্য কোন্ কোন্ উপকরণ প্রয়োজন হয় ?

৩। আদর্শ পুথি কাকে বলে ?

৪। একটি পুথির মধ্যে কোন্ কোন্ উপাদান থাকলে তার গঠন সম্পূর্ণ হয় ?

৫। পুথির লিপিকর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করুন।

৬। পুষ্পিকা, ভণিতা ও গায়েন বলতে কী বোঝায় ? ভণিতার প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

১৩.৯ ঃ গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড) — তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

২। প্রাচীন পুথির পরিচয় — মণীন্দ্রমোহন পাল ও প্রফুল্লচন্দ্র বসু।

৩। পুথি পরিচয় (১ম ও ২য় খণ্ড) — পঞ্চানন মণ্ডল।

৪। বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ — জয় বিদ্বদ্বল্লভ ও ভট্টাচার্য্য বসন্তরঞ্জন ও তারাপ্রসন্ন।

৫। বাংলার পুথি বাংলার সংস্কৃতি — স্বাতী সরকার (দাস)।

৬। বাংলা পুথির গঠন ও প্রকৃতি — কল্যাণ কিশোর চট্টোপাধ্যায়।

একক ১৪ ঃ পুথি পাঠ ও পাঠ-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

মন্তব্য

<u>বিন্যাসক্রম</u>

১৪.১ ঃ উদ্দেশ্য।

১৪.২ ঃ পুথিপাঠের পদ্ধতি ও সমস্যা।

১৪.৩ ঃ বাংলা পুথিপাঠের দুই রীতি — তোলাপাঠ ও মিশ্রপাঠ।

১৪.৪ ঃ পুথি পরিচয় ও কাল নির্ণয় পদ্ধতি।

১৪.৫ ঃ পুথির অব্দগণনা ও শকাব্দ নির্ণয় পদ্ধতি।

১৪.৬ ঃ পুথির লিপির উদ্ভব ও বিবর্তন।

১৪.৭ ঃ পুথি সংরক্ষণ।

১৪.৮ ঃ পুথি সম্পাদনা।

১৪.৯ ঃ অনুশীলনী।

১৪.১০ ঃ গ্রন্থপঞ্জি।

মন্তব্য

১৪.১ ঃ উদ্দেশ্য

পুথি পাঠের কতগুলি নিয়ম আছে। মন ও শারীরিক দিক দিয়ে শুদ্ধ হয়ে পুথি পাঠ করতে হয়। আসন শুদ্ধি অর্থাৎ কম্বলের আসনে বসে আসনের চারিদিকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে পূর্বমুখে বসে পুথির পাঠককে পুথি পাঠ করতে হয়। বাক্-শুদ্ধি হচ্ছে পাঠককে মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হয়ে যে দেবদেবীর উদ্দেশে পুথি পাঠ করবেন সেই দিকে মনকে নিবদ্ধ রাখতে হয়।

পুথিকে পাঠ করা হয় কাঠের চারপেয়ের উপর রেখে। এর চারটি পা থাকে বলে একে চারপেয়ে বলে। আবার মানুষ এই জাতীয় চৌকির উপর বসে স্নান করতেন বলে একে জলচৌকিও বলা হত। এটি অবশ্য পরবর্তীকালের কথা।

প্রত্যেক বিষয়ের পুথি পাঠের এক একটি নিয়ম ছিল। যেমন বৈষ্ণব পুথির ক্ষেত্রে তুলসী পাতার ছোঁয়া লাগিয়ে পুথিটিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য যা কিছু মাঙ্গলিক তা করা হত। পুথি পাঠ করা সমাপ্ত হলে পুরুষেরা পরনের ধুতির কোঁচার খানিকটা খুলে গলবস্ত্র হয়ে পুথিটিকে প্রণাম করে পুথি পাঠ সমাপ্ত করতেন। মেয়েরাও গলবস্ত্র হয়ে পুথিটিকে প্রণাম করে পুথি পাঠ সমাপ্ত করতেন। কোনো কোনো জায়গায় অমাবস্যা তিথিতে পুথি পড়া হত। পুথি যে কোনো দিন পাঠ শুরু করা যাবে না। দোলপূর্ণিমায় চৈতন্য-বিষয়ের পুথি পড়তে হয়। কৃষ্ণাষ্টমী বা রাধা-অষ্টমীর পুথিও এই সময় পাঠ করা যাবে।

পুথি পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য হল ধর্ম-কর্মের প্রচার ও প্রসার। পুথির লেখকও পুথি থেকে ধর্ম বিষয় জ্ঞান লাভ করেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল গল্প শুনিয়ে মানুষকে আনন্দ দান করা।

পুথির মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবন সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করা হয়। সমকালীন সমাজের বাজার-দর-অর্থনৈতিক অবস্থা; সমাজে কোন শ্রেণির মানুষের প্রাধান্য বেশি; তাদের পারিবারিক অবস্থা ও আরও অনেক কিছু পুথি থেকে জানা যায়। কবি পুথি লিখে পুথির বিষয়ের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করেন এবং ধর্মাচার ও লোকাচার সম্বন্ধে সচেতন করেন।

একটি পুথি ঠিকমতো পাঠ করতে গেলে কিছুটা বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। বিশেষভাবে জানতে হবে পুথির কালজ্ঞাপক শ্লোকের হেঁয়ালি সমাধানের প্রক্রিয়া এবং লিপি। জানতে হবে বিভিন্ন অব্দের খুঁটিনাটি। এই একক-এ এই বিষয়গুলি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৪.২ ঃ পুথি পাঠের পদ্ধতি ও সমস্যা

পুথি পাঠের ক্ষেত্রে বহু মতান্তরের সম্ভাবনা থাকে। গবেষকেরা সব সময় একমত হন না।

পুথির পাঠোদ্ধার এবং শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সময়-সাপেক্ষ এবং সতর্ক হয়ে করবার কাজ। অভ্যস্ত না হলে একাজ সাধারণ শিক্ষিত মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এ কারণে বর্তমানে এইসব বিষয়ে কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের সর্বদাই মনে রাখা দরকার — পুথি গেয় কাব্য। চণ্ডীমণ্ডপে বসে কবি বা গায়ক সেটি পরিবেশন করেন।

পুথির শুরুতে দেবদেবীর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বন্দনা রচিত হত। আবার অনেক সময় বৈষ্ণব পুথিতে সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া থাকে। সেক্ষেত্রে পাঠকের সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত হওয়া উচিত কারণ পুথি পাঠের সময় তা না হলে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। যেখানে একটি পুথির বিভিন্ন পাঠান্তর পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত পাঠগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পাঠ গ্রহণ করা উচিত। সাধারণত পুথির পুষ্পিকায় লেখা লিপিকাল থেকেই পাঠের প্রাচীনতা উদ্ধার করা যায়। লিপিকাল না থাকলে পুথির অবস্থা, উপকরণ, লিপির ছাঁদ ও ভাষা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি থেকেও পাঠের প্রাচীনতা নির্ধারণ করা যায়। তবে পুথি প্রাচীন হলেই যে তার পাঠ মূল বা বিশুদ্ধ হবে তা নয়। সুতরাং পাঠ-বিচারের প্রাথমিক স্তরে বিশুদ্ধ পাঠের সন্ধান না করে প্রাচীনতর পাঠ উদ্ধার করাই শ্রেয়। প্রাচীন পাঠগুলি উদ্ধার করবার পর সব পাঠের মধ্যে তুলনা করে তাদের মধ্যকার পারস্পরিক অভেদ ও প্রভেদের প্রকার ও পরিমাণ নিরূপণ করা প্রধান কাজ। তারপর এই পাঠ-প্রভেদগুলি সংশোধন করা দরকার।

অনেক সময় পুথির প্রাচীনত্ব এবং পাঠ উদ্ধার করার কাজে পুথি-মধ্যস্থ লিখিত উপাদানেরও বিচার করতে হয়। যেমন পঞ্চদশ শতকে রচিত কোনো পুথিতে ইংরেজি, ফারসি, পর্তুগিজ শব্দ থাকলে বুঝতে হবে সেই শব্দটি পুথির আদি পাঠে ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনো লিপিতে এই শব্দটি অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এইভাবে গবেষককে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয় অনেক সময়ে।

মন্তব্য

পুথি যখন রচিত হত তখন মুদ্রণ ছিল না বলে একই পুথির বহু হুবহু অনুলিপি থাকা সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লিপিকর একটি পুথির হস্ত-লিখিত অনুলিপি করতেন। সে ভাবেই একটি পুথির আরও কয়েকটি অনুলিপি পাওয়া যেত। কিন্তু বিভিন্ন অনুলিপিতে প্রায়শই পাঠে মূল পুথির নানাবিধ পাঠান্তর লক্ষ করা যেত। সব লিপিকর সমান শিক্ষিত হতেন না বলে অনেক পুথির পাঠে ভুল থেকে যেত। পুথির হরফের একাধিক আকার প্রচলিত ছিল বলে অনেক সময় লিপিকরের পক্ষে ঠিক করে পড়াও সম্ভব হত না। সাধারণত বাংলা উচ্চারণে তিন 'স' কার — শে, স, ষ, ই, ঈ, উকার-ঊ কার, য, ফলা ন, ণ, ঢ়, র, য, জ, অ, য় — প্রভৃতির পৃথক উচ্চারণ হয় না। ফলে উচ্চারণ-দোষে বানান ভুল হয়ে যেত। অশিক্ষাই এর কারণ।

পুথি পাঠের সময় লেখক, কবি বা লিপিকর আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করে পুথি লিখতেন বা পাঠ করতেন। তারপর লেখা হত ''শ্রী শ্রী হরি:'' ''শ্রী শ্রী রাধা গৌরী গৌরীন্দ্রো জয়ত'' :, ''শ্রীশ্রী গণেশায় নমঃ।।'' ''শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য''।। ইত্যাদি। তারপর দুই দাঁড়ি দিয়ে লেখা হত — ''অথ প্রসাদ চরিত্র লিখতে'' — এই রীতিতে পুথির নাম জানিয়ে দেওয়া হত। তারপর পুথি পাঠ করা হত।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্পূর্ণ পুথি নির্ভর। ছাপাখানার আগেরযুগে হস্তলিখিত পুথিই শুধু আমাদের কেন সারা বিশ্বের সাহিত্যের একমাত্র সাহিত্যিক মাধ্যম ছিল। আজকের দিনে সেই সব হস্তলিখিত প্রাচীন পুথিগুলি পাঠে নানা সমস্যার সম্মুখীন হই আমরা। যে সমস্ত পুথি এখনও ছাপারূপে প্রকাশের মুখ দেখেনি সেসব পুথির পাঠে সমস্যা অধিক। যে সমস্ত পাঠক পুথি পাঠ করতে উৎসাহী হন তাঁরা প্রত্যেকেই যেসব পাঠ সমস্যার সম্মুখীন হন তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় — (ক) **বহিরঙ্গ সমস্যা (খ) অন্তরঙ্গ সমস্যা**।

(ক) প্রধানত লিপি পাঠ সমস্যা লিপি পরিচয় / লিপিজ্ঞান সমস্যা ঃ

'পুথি পাঠে' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল লিপি পরিচয় জ্ঞান। হাতের লেখা পুথির লিপির ক্ষেত্রে ছাপা হরফের মতো কোনো নির্দিষ্ট রূপ সর্বত্র বজায় থাকেনি। একই লিপিকরের হস্তলিখিত একই পুথিতে একই লিপিছাঁদের নানা পার্থক্য আমাদের অনেক সময় বিভ্রান্ত করে। কখনো — গোলাকার লিপি, কখনো কোণাকার, কখনো টানা টানা লিপি, কখনো পাকানো পাকানো লিপি — পাঠককে বারে বারেই পাঠকালে হোঁচট খেতে হয়। বিশেষ করে যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও তীব্র। 'কু' 'ঙ্গ', 'ক্ষ', 'দ্ধ', 'ন্দ', 'জ্ঞ' — লিপিগুলি পুথিতে প্রায় এক রকম আকারের। 'কু ঙ্গ', 'ঙ্গ' ঙ্গ, দ্ধ ঙ্গ ন্দ ঙ্গ ইত্যাদি। এছাড়া যু, দু, ত্য, দ্ধ প্রভৃতি যুক্তাক্ষর লিপির ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা যায়। যেমন 'যু', 'হ্ন', 'দু', 'দ্ব', 'দ্ধ', 'ঙ্গ', কৃ ইত্যাদি।

১। লিপিকরের প্রভাব, এই লিপি সমস্যার কারণ ঃ একই লিপিকরের লিপিছাঁদ সর্বত্রই একই আকারের হয় না। যদি লিপিকর মনোযোগের সঙ্গে লিপি করেন ধীরে ধীরে, ধরে ধরে তাহলে তা একরকমের হবে। আবার যদি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কিংবা দায়সারা ভাবে লেখেন মোটামুটি পড়া গেলেই হল, তাহলে একই লিপিকরের লিপিছাঁদে পার্থক্য দেখা দেবে।

২। আদর্শ লিপিছাঁদ না থাকা ঃ তখন কোনো আদর্শ লিপিছাঁদ তাঁদের সামনে ছিল কিনা তা জানা যায় না। নাগরী নেওয়ারী চর্যালিপি ক্রমবিবর্তনেই আজকের বাংলা লিপিছাঁদ একটা নির্দিষ্ট রূপ পেয়েছে। আদর্শ লিপিছাঁদ না থাকাটাও একটা সমস্যার কারণ।

৩। স্বয়ং মালিক অথবা পেশাদার লিপিকর ঃ লিপিকর দু'ধরনের — ১) যিনি স্বয়ং সংগ্রহার্থে পুথি নকল করছেন অথবা ২) যিনি নিজে অপারঙ্গম হয়ে পেশাদার লিপিকরকে দিয়ে পুথি নকল করাচ্ছেন। পেশাদার লিপিকর লিপিকুশলী হলেও এঁরা একই সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন বিষয়ের পুথি নকল করতেন রুজির স্বার্থে — ফলে অনেক সময় মিশ্রণ দোষ ঘটে যেত, একটা দায়সারা মনোভাবও দেখা দিত। ফলে লিপিছাঁদের রকমফের ঘটত।

৪। লিপিছাঁদে আঞ্চলিক প্রভাব ঃ লিপিকরদের বিভিন্ন ঘরানায় লিপিছাঁদের পার্থক্য সৃষ্টি করত। একই সময়ে একই বিষয়ের একই কবি ভণিতার পুথির বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন লিপিকরের লিপিছাঁদেও পার্থক্য ঘটত। একই সময়ে উত্তরবঙ্গের কোনো অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি পুঁথির লিপির সঙ্গে সমকালের একই বিষয়ের পুথি যদি দক্ষিণবঙ্গে পাওয়া গেছে তার লিপিছাঁদে অমিল পাঠককে বিভ্রান্ত করে।

৫। পাঠকের উচ্চারণ সমস্যা ঃ লিপিকর পাঠকের পাঠ শুনে উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করতেন অনেক সময়। লিপিকরগণ ছিলেন অধিকাংশই অশিক্ষিত, কেবল হস্তলেখা ভালো। পাঠক যদি ভুল

মন্তব্য

উচ্চারণ করতেন অথবা দুর্বোধ্য উচ্চারণ করতেন তাহলেও লিপিতে সমস্যা হত।

৬। **একই পুথিতে বিভিন্ন লিপিকরের হস্তলিপি ঃ** একই বিষয়ের বিভিন্ন পুথি একসঙ্গে সামনে রেখে পড়লেও অনেক সময় সমস্যার সমাধান হয়। অথবা সেই লিপিটি যেটি দুর্বোধ্য সেটি অন্য কোনো জানা শব্দে থাকলে সেই দুরূহ লিপিছাঁদটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিংবা, একই পুথিতে একাধিক হস্তলিপির ছাপ পড়লেও লিপিছাঁদের ভিন্নতা পাঠককে সমস্যায় ফেলে দেয়।

৭। **লিপিকরের শিক্ষা-দীক্ষা ঃ** লিপিকরের শিক্ষাদীক্ষাও অনেক সময় যেমন লিপি রচনায় প্রভাব সৃষ্টি করে তেমনি লিপিকরের বিষয়জ্ঞানও অনেকসময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন 'ছ' এবং 'ন্দ্র' পুথিতে অনেকটা একই রকম দেখতে। লিপিকর একটি পুথির লিপি দেখে আর একটি পুথি নকল করছেন। সেখানে অনেক সময় হয়তো পূর্বপাঠ বা লিপি ঠিকমত বুঝতে না পেরে তিনি লিপিকালে গোলমাল করে ফেলেছেন। যেমন — পুথিতে ছিল 'ইন্দ্রের সমান 'বীর', সেখানে লিপিকর 'ন্দ্র' — বুঝতে না পেরে 'ছ' লিপি করেছেন — ইছের সমানবীর' হয়েছে। এতে পাঠক বিভ্রান্ত হন।

৮। **পত্র কালি কলমের প্রভাব ঃ** লিপিকালে কাগজ, কালি, কলম-এরও গুরুত্ব আছে। কাগজ যদি মসৃণ না হয়। কালি যদি স্পষ্ট না হয় এবং কলম যদি ভালো না সরে — তাহলেও লিপিছাঁদে বিকৃতি আসে। এর ফলেও পাঠক সমস্যায় পড়ে।

এ তো গেল পুথি পাঠের বহিরঙ্গ সমস্যা।

(খ) পুথি পাঠে অন্তরঙ্গ সমস্যাগুলি সবচেয়ে গুরুতর ঃ

বিষয় জ্ঞান ঃ অনেক সময় পাঠকের লিপি উদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে পুথির বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব জ্ঞান। লিপি পরিচয় প্রয়োজন হয় পুথিটিকে পাঠ করতে। কিন্তু পুথিপাঠের অন্তরঙ্গ দিক হল পাঠ্য বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করা। পাঠ্য বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে — বিষয়জ্ঞান দরকার। মনে রাখতে হবে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধুযুগের সাহিত্যই সংস্কৃত পুরাণাদি এবং ইসলামী সাহিত্য থেকে আহৃত। চর্যাপদেও বৌদ্ধ তন্ত্র শাস্ত্রাদির প্রভূত প্রভাব বর্তমান। তাই চর্যা পুথির পাঠ সম্যক উপলব্ধি করতে বৌদ্ধ তন্ত্রাদির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে ভাগবত-রামায়ণ-মহাভারতাদি সংস্কৃত পুরাণের বিষয় জানা থাকলে পুরাণাশ্রিত অনুবাদকাব্যগুলির পাঠ সমস্যার জটিলতা অনেকটাই দূর হয়। দুর্বোধ্য দুরূহ শব্দগুলিও সহজ হয়ে যায় পাঠকের কাছে।

এই বিষয় জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন —

১) সংস্কৃত পুরাণাদির সম্যক জ্ঞান।

২) বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান।

১৪.৩ ঃ বাংলা পুথি পাঠের দুই রীতি — তোলাপাঠ ও মিশ্রপাঠ

পুথির পাঠের উপকরণ পুথির লিপি নির্ভরশীল —

১) পুথি লিপিকরণে 'পুথির পাঠ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লিপিকরগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধুই নকল নবীশ, লিপি কুশল, পাঠ কুশল নন। লিপিকর পাঠ নকল করতেন, লিপি নকল করতেন না। যদিও পুষ্পিকায় আমরা দেখি 'জথাদিষ্টং' তথা লিখিতং লিক্ষকো দোষ নাস্তি' ইত্যাদি, তবু পুথির লিপি দৃষ্টে আমরা বুঝে নিতে পারি লিপিকর পাঠ শুনে শুনে লিপি করেছেন। সুতরাং পুথির পাঠকের উচ্চারণ শুদ্ধি বা যথাযথ পাঠ না হয় তাহলে লিপিতেও যথাযথ পাঠ রক্ষা হয় না।

২) পাঠককে শুধুমাত্র পাঠ কুশল হলেই হবে না। তাঁকে গ্রন্থ বিষয়েও বিজ্ঞ হতে হবে। সুর-তাল-ছন্দ-জ্ঞান থাকা চাই তাঁর। মনে রাখতে হবে একটি পুথির নকল-এর সমস্ত দায় তাঁর। তিনিই পরিচালক, যজ্ঞের আচার্য স্বরূপ।

৩) পুথি নকল সাঙ্গ হলেই লিপিকর ও পাঠকের দায় শেষ নয়। নকল পুথিটিকে পুনরায় পর্যালোচনা করে নিখুঁতভাবে হাজির করতে হবে। প্রয়োজনে সংযোজন, বিয়োজন, বর্ণাশুদ্ধি ইত্যাদি করে তাকে মূলের বা আদর্শ পুথির অবিকল করে তুলতে হবে। তাই আমরা অনেক পুথিতে নানা সংযোজন বা বিয়োজন হতে দেখি। সংশোধিত নতুন পাঠটি পুথির চরণে চিহ্নিত করে মার্জিন অংশে

চরণ সংখ্যা দিয়ে তাকে সংস্থাপিত করা হয়। একেই বলে তোলা পাঠ। মন্তব্য

তোলাপাঠ ঃ- মূল পাঠের ভুল সংশোধন করে অথবা বাদ পড়া পাঠ্যাংশকে যেখানে বাদ/সংশোধন করা হয়েছে সেই স্থান চিহ্নিত করে ঐ পৃষ্ঠাতেই উপর/নীচে, বাঁদিক/ডানদিকের মার্জিন অংশে তুলে রাখাকে বলে তোলা পাঠ। কখনও কখনও সংযোজিত চরণ-শব্দ বা অক্ষরকে সংযোজন স্থানের উপরের পূর্বচরণের নীচের ফাঁকা অংশেও লিপি করা হয়েছে।

প্রায় অধিকাংশ পুথিতেই তোলা পাঠের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করি আমরা। কোন কোন পুথিতে তোলা পাঠে নানা হস্তের ও নানা সময়েরও (এটা বোঝা যায় লিপি গঠন দেখে) হস্তাবলেপ দেখা যায়। এতে মনে হয় দীর্ঘজীবি পুথিটিতে নানা পাঠক নানা সময়ে এই প্রক্ষেপ ঘটিয়েছেন।

তোলা পাঠের গুরুত্ব ঃ

১) যদি তোলা পাঠে স্বয়ংলিপিকরের হস্তলিপি থাকে। এর থেকে অনুমান করা যায় পুথিটি লিখন কালেই সংশোধিত হয়েছে।

২) সম-সাময়িক পাঠক/সংশোধক বা প্রযোজক দ্বারা কৃত হয়েছে। নকল পুথির লিপি ছাঁদের সঙ্গে না মিললে এটা বোঝা যায়।

৩) অনেক পরবর্তীকালের লিপিকরের হস্তলিপিতেও তোলাপাঠ দেখা যায়। এর দ্বারা পুথিটির জনপ্রিয়তার কালটিও বোঝা যায়।

৪) তোলাপাঠ আদর্শ পুথি অনুসরণে যদি করা হয়ে থাকে তাহলে নির্ভুল পাঠ পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশী গ্রহণীয় হয়। যদি ঐ বিষয়ের আর কোন দ্বিতীয় পুথি না পাওয়া যায় এবং বোঝা যায় ঐ প্রাপ্ত পুথিটি একটি নকল পুথি তাহলে সেই পুথিটির গুরুত্ব আরও অধিক।

৫) অর্থ সঙ্গতির জন্য লিপিকর প্রমাদ-এর সংশোধন দৃষ্টে মনে হয় পুথিটি অনেক প্রাচীন, পরবর্তীকালের প্রচলিত শব্দ অপ্রচলিত শব্দের স্থানে সংযোজিত হয়েছে।

৬) লিপিকরের 'ছাড়' পূরণ করা হয় তোলা পাঠে।

৭) ছন্দের মাত্রা পূরণেও এক বা একাধিক অক্ষরের যোজনা ঘটেছে।

অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে বিতর্কিত ও নানা সমস্যায় কন্টকিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথিতে নানা সময়ের মোট পাঁচজন সংশোধক দ্বারা সংশোধিত ১২০টি তোলা পাঠের সন্ধান পেয়েছেন।

পুথির তোলাপাঠ কি আদর্শ পুথি না অপর কোন পুথির সাহায্যে করা হতো ? এই প্রশ্নের উত্তর সবচেয়ে জরুরি। কারণ এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই সংশোধনের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে।

সংশোধন বা তোলাপাঠ লিপিকর কৃত না হলেও ক্ষতি নেই। আদর্শ পুথির অনুসরণে যদি সংশোধন করা হয়ে থাকে তবে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

এক্ষেত্রে দেখতে হবে — ১) তোলাপাঠে পাঠান্তর পাওয়া যাচ্ছে কিনা। যদি আদর্শ পুথি দৃষ্টে নকল পুথিটি শোধিত করা হয় তাহলে তোলা পাঠে পাঠান্তর পাওয়া যাবে না। অন্যথায় পাঠান্তর দেখা যায়।

২) সংশোধনের প্রকৃতি দেখে বুঝে নেওয়া যায় —

(ক) তাঁর কাছে আদর্শ পুথি ছিল কিনা।

(খ) তিনি ঐ বিষয়ে (কাব্য বিষয়ে) অভিজ্ঞ ছিলেন কিনা।

সংশোধকের লক্ষ্য কি ঃ

১) আদর্শ পুথির অবিকল নকল রক্ষা করা।

২) যদি আদর্শ পুথি না থাকে তখন —

(ক) ছন্দের দাবীকে মেনে চলা।

(খ) ভাবের ও অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করা।

(গ) পুথিতে ব্যবহৃত প্রচলিত শব্দকেই তোলা পাঠে স্থান দেওয়া।

মূলতঃ তোলাপাঠ হলো প্রাচীন সম্পাদকের পাদটীকা, তাঁর বলেছেন এখানে 'এমন হওয়া

মন্তব্য

উচিত'। কিন্তু মূল পাঠের কোন বিকার বা বিকৃতি ঘটান নি। তোলাপাঠ হলো অনুমিত সঠিক পাঠ।

মিশ্র পাঠ ঃ

একই কবি ভণিতায় একই বিষয়ের পুঁথি দীর্ঘকালের পরিক্রমায় 'শত হাতে সহি পরখের' ছলে প্রাচীন ও জনপ্রিয় কবির একাধিক পুঁথিতে নানা কালে নানা অঞ্চলের নকল পুঁথিতে — বহু পাঠান্তর, প্রক্ষেপ এবং মিশ্রণ ঘটেছে। অধ্যাপক সুকুমার সেন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বর্তমানে প্রাপ্ত কৃত্তিবাসের পুঁথিগুলিতে কেবলমাত্র কবির ভণিতাটুকু ছাড়া স্বয়ং কবি সৃষ্ট একখানি শ্লোক বা চরণ অক্ষত আছে কিনা। যুগের রুচি ও অবস্থার পরিবর্তনের ঢেউ, ধর্ম আন্দোলনের নানামুখি জোয়ারের ঢেউ মূল পুঁথির পাঠে আছড়ে পড়েছে। কখনও তা মূলকেই ভাসিয়ে দিয়েছে। তাই উত্তর-চৈতন্য যুগের কবির চৈতন্য প্রভাব পড়েছে, রামায়ণের পুথিতে মিশেছে মহাভারতের কথা ও চরিত্র। অথচ রামায়ণ মহাভারতের বহু কাল আগের কাব্য। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে অনুপ্রবেশ করেছেন শ্রীচৈতন্য। পদাবলী সংকলন গ্রন্থে দেখা যায় গোবিন্দ দাসের পদ বিদ্যাপতির ভণিতায়, জ্ঞানদাসের পদ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের ভণিতায়। এই মিশ্রণের ফলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। সেইসব জটিলতার জাল এখনও ছিন্ন হয়নি।

এর কারণ অদ্যাবধি স্বয়ং কবি কৃত মূল পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় নি। মূল পুঁথি না পাওয়ায় আমরা মিশ্রপাঠগুলিকে অবহেলায় বাদ দিতেও পারিনা। তবে মিশ্রপাঠের 'ধুলি আবরণ' ঝেড়ে ফেলার প্রয়াস চলছে এবং চলবে। অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। মিশ্রপাঠ চিহ্নিতকরণ আগে প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে — (ক) কবির সময়ের কাছাকাছি সময়ের পুঁথি, (খ) কবির বাসস্থানের নিকটবর্তী পুঁথি, (গ) একাধিক একই বিষয়ের পুঁথির মধ্যে মিল অংশগুলিকে আলাদা করে নিয়ে।

১৪.৪ ঃ পুঁথি পরিচয় ও কাল নির্ণয় পদ্ধতি

এ যাবৎ আমরা যে সব পুঁথি পেয়েছি সেগুলি সবই নকল পুঁথি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে লিপিকৃত প্রাচীন পুঁথির সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। হাতে গোনা দু-তিনটি পুঁথি বাদ দিলে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিপিকৃত পুঁথিই আমাদের এ পর্যন্ত সম্বল। শতকরা ৮০/৯০ ভাগ পুথিই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও তার পরবর্তীকালে লিপিকৃত। প্রাক্-চৈতন্য যুগের এবং চৈতন্য সমকালীন যুগের কবি ও তাঁদের কাব্য পরিচয় অনেক পরবর্তীকালের নকল পুঁথির আলোতেই গবেষক পণ্ডিতগণ দেবার চেষ্টা করেছেন। সমকালে রচিত কিংবা মূল কবিকৃত কোনো পুঁথি না পাওয়ায় ঐ সব সিদ্ধান্ত ও বিচার নির্ভুল এ দাবী তাই সঙ্গতভাবেই করা যায় না। ফলে নানা বিতর্ক, সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তবু বিভিন্ন পুঁথির সূত্র থেকে এবং নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থের সহায়তায় সাহিত্য গবেষকগণ বহু ক্ষেত্রেই ঐকমত্য হয়েছেন, দু-একটি বিতর্কিত পুঁথি এবং তাঁদের রচয়িতা কবির ক্ষেত্র ছাড়া। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন কবিদের সময় ও পরিচয়' গ্রন্থে চর্যাগীতির কবি পরিচয়, কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করেছেন।

আমরা কিছু কিছু পুঁথিতে দুটি লিপিকাল দেখতে পেয়েছি। একটি মূল কবির কাব্য রচনাকাল, অন্যটি যেটি অর্বাচীন সেটি আলোচ্য পুঁথির নকল বা অনুলিপিকাল। যে সব পুঁথিতে দুটি রচনাকাল পাই সেক্ষেত্রে কাব্যটির মূল রচনাকাল নিয়ে কোন ধন্দ নেই। কিন্তু অধিকাংশ পুঁথিতেই মূল রচনাকাল পাই না। আবার 'পুষ্পিকা' অংশ বর্জিত পুঁথিতে (মূল রচনাকাল যদি না থাকে) নকল কালটিও পাওয়া যায় না। পুঁথির গঠন, রূপের বিচারে কেবল মূল রচনাকাল নয়, অনুলিপিকালটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শতাব্দীতে শতাব্দীতে লিপিছাঁদের-ভাষার-ছন্দের এবং বানান ও উচ্চারণের যে বিবর্তন বা রূপান্তর ঘটেছে তা জানতে অবশ্যই সময়কাল জানা দরকার।

যে সব কবির ঐতিহাসিক কালপরিচয় নিয়ে কোন সন্দেহ নেই সেসব কবিদের নিয়ে কোন গোল নেই। যেমন — জয়দেব-বিদ্যাপতি-কৃত্তিবাস এবং প্রাক্-চৈতন্য যুগের কোন একজন চণ্ডীদাস, প্রাক্-চৈতন্য যুগের এই সব কবিদের এবং তাঁদের সময় নিয়ে তেমন গোলমাল নেই। কিন্তু রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। ঠিক কত সালে তাঁদের কাব্যটি সমাপ্ত হয়েছিল তা বিতর্কিত। একমাত্র প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি মালাধর বসু তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের সাল তারিখ দিয়ে গ্রন্থ রচনার কালটি স্পষ্ট করেছেন। অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'কৃষ্ণ কথায় মালাধর ও মাধব' এ রচনাকালটির প্রামাণ্য উদ্ধার করেছেন। একাধিক চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে জয়দেব-বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদনকারী শ্রীচৈতন্যের উল্লেখ — প্রমাণ করে এই তিনজন কবি প্রাক-চৈতন্য যুগের। কিন্তু চণ্ডীদাস নিয়ে বির্তকের শেষ নেই। সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাসের পরিচয় পাওয়া যায় — দ্বিজ বা রামী চণ্ডীদাস, অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস — এঁদের মধ্যে কোন্ চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্য যুগের অথবা এঁরা

সকলেই প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি কিনা তা নিয়ে বির্তকের মীমাংসা হয়নি। মন্তব্য

সমস্যা গভীরতর উত্তর চৈতন্য যুগের কবিদের সঠিক পরিচয় উদ্ধারে। এইসব কবিগণ শত শত লিপিকর-পাঠক ও গায়েনের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হতে হতে শতধা হয়ে গেছেন। যাঁরা আত্মপরিচয় দিয়ে গেছেন সেখানে বিতর্ক কম হলেও, প্রামাণিকতা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। একাধিক আত্মপরিচয় সম্বলিত একই কবির একই বিষয়ের পুঁথি পাওয়া গেলে তুলনামূলক আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র একটিমাত্র আত্মপরিচয় সম্বলিত পুঁথি পাওয়া গেলে তাকে প্রমাণ করতে বিস্তর জলঘোলা। যেমন — কৃত্তিবাসের 'আত্মপরিচয়'-এর ক্ষেত্রে হয়েছে।

যাঁদের আত্মপরিচয় পাওয়া যায় না — তাঁরা ইতিহাসের পাতায় কেবল নামেই পরিচিত — কাল বা সময়ের সমস্ত সীমাকে হারিয়ে পরিচয় লুপ্ত হয়ে গেছেন। সেই সব পরিচয়হীন কবিদের পরিচয় খুঁজে বের করা আজ প্রায় অসাধ্য। যেমন — 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যের কবি 'বড়ু চণ্ডীদাস'-এর কোন ব্যক্তি পরিচয় জানা যায় না। কাব্য পরিচয়েই তিনি পরিচিত।

যে সব পুঁথিতে রচনাকালের পরিচয় আমরা জানতে পারিনা সে সব পুঁথির কবির সময়কাল বা মূল রচনাকাল জানতে চেষ্টা করা হয় অন্তত তিন ভাবে —

ক) সময় জ্ঞাপক সমসাময়িক বা অদূরবর্তীকালের কোন কবির কাব্যে ঐ কবির অথবা কবির কাব্যের উল্লেখ থাকলে আমরা ধরে নিতে পারি পরিচয় লুপ্ত কবির অথবা তাঁর কাব্যের কাল সীমা উক্ত কাব্যের কিছু পূর্ববর্তী সময়ে।

খ) কাব্যের বিষয় বিশ্লেষণ করে। অর্থাৎ কবি প্রাক-চৈতন্য যুগের না উত্তর-চৈতন্য যুগের তা বোঝা যায়। উত্তর-চৈতন্য যুগের কাব্যে চৈতন্য বন্দনা কিংবা চৈতন্য ভাবধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ ষোড়শ শতাব্দী এবং পরবর্তী সময়ের কাব্য চৈতন্য প্লাবন থেকে মুক্ত নয়।

গ) কবির আত্মবিবরণী যদি থাকে তার প্রমাণিকতা বিচার করে।

সাল তারিখ হীন নকল পুঁথির ক্ষেত্রে —

ক) লিপির ছাঁদ এবং খ) কালি ও কাগজ-এর প্রাচীনত্ত্ব নিরূপণ করে আনুমানিক নকল কালটির পরিচয় পেতে পারি আমরা।

১৪.৫ ঃ পুঁথির অব্দগণনা ও শকাব্দ নির্ণয় পদ্ধতি

পুঁথিতে লিপিকাল ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি এবং লিপিকরেরা বিভিন্ন ধরণের অব্দ নির্দেশ করেছেন। সেগুলি বিচিত্র ধরণের এবং সংখ্যায় কম নয়। এ পর্যন্ত পুঁথিতে যতগুলি অব্দের উল্লেখ পাওয়া গেছে আমরা সেগুলির পরিচয় দেব।

এই কাল বলতে পুঁথির লিপিকাল বোঝানো হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, একটি পুঁথির রচনাকালও থাকে। আবার যে লিপিকর যখন একটি পুঁথির অনুলিপি করছেন তখন তিনি যত্নের সঙ্গে লিপিকালটিও উল্লেখ করেন। একটি পুঁথি থেকে লিপিকালের উল্লেখ সব সময়ই পাওয়া যায়। পুঁথির রচনাকাল উল্লিখিত হবার রীতি বাংলা সাহিত্যে ততটা ছিল না, অনুলিপির কাল সম্পর্কেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে পারি।

এ পর্যন্ত গবেষকেরা যে সমস্ত পুঁথি দেখেছেন ও তার বিবরণ দিয়েছেন সেগুলিতে সাধারণভাবে চব্বিশ (২৪) প্রকারের কালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চব্বিশ প্রকার কালের প্রয়োগ পুঁথিতে দেখা গেছে। তবে এই চব্বিশ (২৪) প্রকার উল্লেখ নির্দিষ্টভাবে চব্বিশ (২৪) প্রকারের অব্দ বোঝায় না। যেমন 'ইংরাজী সন আর খৃষ্টাব্দ' প্রকৃতপক্ষে একই অব্দ নির্দেশ করে, যদিও লেখা হয়ে থাকে অনেক সময়ে দুইভাবে, যে সব অব্দ নামের ভিন্নতা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন সেগুলিকে আমরা এক একটি গুচ্ছে বিন্যস্ত করেছি। এইভাবে দেখলে পুঁথিতে উল্লেখিত চব্বিশ প্রকার অব্দ প্রকৃতপক্ষে পনেরো অব্দে পরিণত হবে। কিন্তু এখানে আমরা উক্ত সালটি কোথা থেকে আরম্ভ তার সামান্য পরিচয় দেব।

ক) গুচ্ছ ১। বঙ্গাব্দ ঃ- বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন প্রচলিত হয় সুলতান হুসেন শাহের সময় থেকে। বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫৯৩ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫৯৪ যোগ দিলে পাওয়া যাবে খ্রিষ্টাব্দ। বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫১৫ যোগ দিলে পাওয়া যাবে শকাব্দ। এই সন বাংলায় বহুল প্রচলিত। বঙ্গাব্দের কালপঞ্জী অনুসারে বাঙালির সামাজিক জীবন এখনও অনেকখানি নির্ধারিত হয়। যদিও সরকারি কাজকর্মে আন্তর্জাতিক কালপঞ্জী বিকল্পহীনভাবে অনুসৃত। বঙ্গাব্দ উল্লিখিত হয়েছে এমন পুঁথির সংখ্যা প্রচুর।

মন্তব্য

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পুঁথিশালার ১৩ সংখ্যক সম্পূর্ণ পুঁথি গদাধর দাসের 'জগন্নাথ মঙ্গল'-এ আছে সন ১৩২৯ সাল ২ ফাল্গুন।

২। অমলি সন ঃ- মেদিনীপুর অঞ্চলে অমলি সন ব্যবহৃত হয়। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এটি আরম্ভ হয়। যেসব পুঁথিতে অমলি সনের পাশাপাশি শকাব্দ লেখা থাকে সেখানে শকাব্দের সঙ্গে হিসেব করলে বঙ্গাব্দ এবং অমলি সন অভিন্ন হয়.....। কোনো কোনো অঞ্চলে বঙ্গাব্দকেই অমলি বলা হত।

৩। নসরৎসাহী সন ঃ- গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের নাম অনুসারে নসরৎ শাহী সনের প্রচলন হয়। এটিও বঙ্গাব্দের সঙ্গে অভিন্ন।

খ) গুচ্ছ ৪। ত্রিপুরাব্দ ঃ- ৬২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত ছিল। বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৩ যোগ করলে ত্রিপুরাব্দ পাওয়া যায়।

গ) গুচ্ছ ৫। শকাব্দ ঃ- শকাব্দের প্রবর্তক কে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কেউ কেউ বলেন ভারতে কণিষ্ক পরবর্তীকালে শকাব্দের ব্যবহার প্রচুরভাবে দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শকাব্দ আরম্ভ। বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫১৫ যোগ করলে শকাব্দ পাওয়া যায়।

ঘ) গুচ্ছ ৬। সম্বৎ সন ঃ- বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৬৫০ যোগ করলে সম্বৎ সন পাওয়া যায়।

ঙ) গুচ্ছ ৭। মগী ও মঘী সন ঃ- ৬৩৮ বা ৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মঘীসনের গণনা করা হয়। বঙ্গাব্দ থেকে ৪৫ বিয়োগ করলে এই সন পাওয়া যাবে।

চ) গুচ্ছ ৮। মল্লাব্দ ঃ- বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে মল্লবংশীয় রাজারা নিজেদের নামে এই সনের প্রবর্তন করেছেন। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে এই সন বহুল প্রচলিত। বঙ্গাব্দ থেকে ১০১ বিয়োগ করলে মল্লাব্দ পাওয়া যায়।

৯। জমিদারি সন ঃ- মল্লাব্দের সঙ্গে অভিন্ন।

ছ) গুচ্ছ ১০। বিশ্বসিংহ শক ঃ- এটিও কোনো রাজার আদেশে প্রচলিত সন বলে মনে করা যেতে পারে। পুঁথিতে এই সনের সঙ্গে বঙ্গাব্দেরও উল্লেখ থাকার জন্য গণনা সম্ভব হয়েছে যে ৯১৬ বঙ্গাব্দে বিশ্ব সিংহ শকের শুরু। বঙ্গাব্দ থেকে ৯১৬ বাদ দিলে বিশ্বসিংহ শক হয়।

জ) গুচ্ছ ১১। দানিশাব্দ ঃ- এই অব্দের উল্লেখ খুব কমই দেখা যায়। এই অব্দ শুরু হয়েছে ১১৫৭ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ বঙ্গাব্দ থেকে ১১৫৭ বাদ দিলে দানিশাব্দ পাওয়া যায়।

ঝ) গুচ্ছ ১২। খ্রীষ্টাব্দ ঃ- যিশুখ্রীষ্টের জন্ম থেকে যে অব্দের গণনা করা হয় তাকেই খ্রীষ্টাব্দ বলা হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর আন্তর্জাতিক গণনা পদ্ধতি খ্রীষ্টাব্দ অনুসারেই নিষ্পন্ন হয়। ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডাইওনিসিয়াস এই অব্দ গণনা প্রচলন করেন। কোনো প্রাচীন পুঁথিতে খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার পর ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দে যে সমস্ত পুঁথির অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলিতে কোথাও কোথাও খ্রীষ্টাব্দ নির্দেশ করা হয়েছে। বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫৯৩/৪ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ হয়।

ঞ) গুচ্ছ ১৩। হিজরী সন ঃ- বেশ কিছু পুঁথিতে হিজরী বা হিজরা সনের উল্লেখ আছে। হজরৎ মহম্মদ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় গমন করেন। ইসলামি ধর্মে ঐ বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতি রক্ষার্থে এই অব্দের প্রচলন করেন খালিফা উমর। ৬৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই অব্দ গণনা হয়। খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে ৬২২ বিয়োগ করলে হিজরা বা হিজরী সাল গণনা করা যায়। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুলাই (মতান্তরে ১৯ মার্চ) শুক্রবার থেকে এই অব্দের শুরু। ভারতে মুসলমান আগমনের পর থেকে বিভিন্ন রাজকার্যে হিজরা / হিজরী অব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। শতাব্দ এবং হিজরা বা হিজরী সন বহুদিন ব্যবহৃত হয়েছে। শকাব্দ এবং হিজরী সন সমান্তরালভাবে একসঙ্গে বহুদিন ধরে একসঙ্গে প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতকের বহু পুঁথিতে হিজরা বা হিজরী সনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ট) গুচ্ছ ১৪। নেপালি সবেৎ ঃ- ৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নেপালি সংবৎ আরম্ভ হয়েছে বলে গবেষকরা মনে করেন। নেপালে কোথাও কোথাও এই অব্দ ব্যবহৃত হয়। পুঁথিতে এই অব্দের উল্লেখ খুব কমই পাওয়া যায়। খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৮৮০ বিয়োগ করলে অব্দ নেপাল সংবৎ পাওয়া যাবে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে আরও বহু ধরনের অব্দের উল্লেখ আছে। ৬৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে ব্যবহৃত হয়েছে কলাব্দ। উত্তর ভারতের বহুস্থানে প্রচলিত ছিল বিক্রম সংবৎ। ৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিক্রম সংবতের সূত্রপাত। ৭৯৪ বিক্রমাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় অন্য একটি

শিলালিপিতে।

বিক্রমাব্দকে মালবগণাব্দ এবং কৃতাব্দও বলা হয়। বুদ্ধের নির্বাণকাল থেকে বুদ্ধাব্দের গণনা করা হয়েছে। যার আরম্ভ ৫৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; মহাবীরের নির্বাণকাল থেকে জৈনদের মধ্যেও এক অব্দ গণনার প্রচলন আছে, যার সূত্রপাত ৫২৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই অব্দকে জৈনাব্দ বা বীরাব্দ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। গুপ্ত বংশের রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গুপ্তাব্দ প্রচলন করেন। সমগ্র উত্তর ভারতে এই অব্দের বহুল প্রচলন ছিল। ২৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রচলিত হয়েছিল চেদি অব্দ। অনেকে মনে করেন হর্ষবর্ধনের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ হর্ষাব্দের প্রচলন হয়েছিল। ওড়িশার শতাব্দের শেষে বা ষষ্ঠ শতাব্দের গোড়ায় এটি প্রচলিত হয়। মিথিলায় প্রচলিত আছে লক্ষ্মণ সংবৎ। বাংলায় সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের নামে মিথিলায় প্রচলিত লক্ষণ সংবৎ। বাংলার সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের পিতামহ বিজয় সেন যখন মিথিলা জয় করেন তখন পৌত্র লক্ষ্মণ সেনের জন্মসূচক সময়টিকে এই অব্দের নামে তিনি স্থায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন। ১১০৮ থেকে ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময় এই অব্দ শুরু হয়েছিল মিথিলায়। এই অব্দ মিথিলায় যথেষ্ট প্রচলিত থাকলেও বাইরে এর প্রচলন ছিল না। কোনো বাংলা পুঁথিতে এই সংবেতের উল্লেখ নেই। বল্লালি সন বা বলালি সন্ নামেও একটি অব্দ কিছুকাল প্রচলিত ছিল। এছাড়াও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকাল থেকে সূচিত চৈতন্যাব্দ বাঙালি সমাজে বেশ কিছু কালের জন্য স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু এই অব্দগুলির কোনোটি বাংলা পুঁথিতে উল্লিখিতচ হয়েছে এমন নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

অব্দ গণনা

বিভিন্ন অব্দ ঃ

১) বুদ্ধাব্দ + ৫৪৫ = খ্রীষ্টাব্দ। জৈনাব্দ + ৫২৮ = খ্রীষ্টাব্দ। গুপ্তাব্দ + ৩১৯ = খ্রীষ্টাব্দ।

২) শকাব্দ + ৭৭/৭৮ = খ্রীষ্টাব্দ। খ্রীষ্টাব্দ – ৫৯৩ = বঙ্গাব্দ। হর্ষাব্দ + ৬০৬ = খ্রীষ্টাব্দ।
(কনিষ্কের সময় থেকে শকাব্দ সারা ভারতে চালু হয়)

৩) অমলি মাস + ৫৯৩ = খ্রীষ্টাব্দ (এটি ওড়িষ্যার সাল, বঙ্গাব্দের থেকে ৫ মাস কম)

৪) চৈতন্যাব্দ + ১৪৮৫ = খ্রীষ্টাব্দ।

৫) ত্রিপুরাব্দ + ৫৯০ = খ্রীষ্টাব্দ।

৬) দানিশাব্দ + ১৭৫ = খ্রীষ্টাব্দ।

৭) নেপাল সংবৎ + ৮৮০ = খ্রীষ্টাব্দ।

৮) বঙ্গাব্দ + ৫৯৩ = খ্রীষ্টাব্দ।

৯) মঘীসন + ৬৩৮ = খ্রীষ্টাব্দ (মঘ রাজাদের রাজত্বকাল শুরু হয় ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে)

১০) মঘী সন – ৪৫ = খ্রীষ্টাব্দ।

১১) মল্লাব্দ + ৬৯৬ = খ্রীষ্টাব্দ।

১২) লক্ষ্মণাব্দ + ১১১৮ = খ্রীষ্টাব্দ।

১৩) সংবৎ – ৫৭ + খ্রীষ্টাব্দ

১৪) ত্রিপুরাব্দ – ৩ + বঙ্গাব্দ।

১৫) বঙ্গাব্দ = ত্রিপুরাব্দ — ৩

১৬) নছরৎ শাহীসন = বঙ্গাব্দ + ২

১৭) বিশ্বসিংহ শাক = বঙ্গাব্দ – ৯১৬

১৮) জমিদারি সন = বঙ্গাব্দ – ১০১

১৯) হিজারি সন = খ্রীষ্টাব্দ – ৬২২

অভিন্ন জমিদারি সন, বিষ্ণুপুরী সন, মল্লাব্দ, রাজসন, দানিশাব্দ।

বিশ্বসিংহ শাকের উল্লেখ ঃ

ঋতু ভুজ হরনেত্র বিশ্বসিংহশাকে।
বারোশ বিয়াল্লিশ সন লোকে বলে থাকে।

মন্তব্য

ঋতু = ৬, ভুজ = ২, হরনেত্র / ৩ অর্থাৎ অঙ্কের বামাগতিতে পাই ৩২৬। এর সঙ্গে ৯১৬ যোগ করলে হবে বঙ্গাব্দ, ৩২৬ + ৯১৬ = ১২৪২ বঙ্গাব্দ বা ১২৪২ + ৫৯৩ = ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ বা ১৮৩৫ – ৭৮ = ১৭৫৭ শকাব্দ।

তিথি ১) প্রতিপদ ২) দ্বিতীয়া ৩) তৃতীয়া
৪) চতুর্থী ৫) পঞ্চমী ৬) ষষ্ঠী
৭) সপ্তমী ৮) অষ্টমী ৯) নবমী
১০) দশমী ১১) একাদশী ১২) দ্বাদশী
১৩) ত্রয়োদশী ১৪) চতুর্দশী ১৫) অমাবস্যা / পূর্ণিমা

কবি শকাব্দ নির্ণয়

কাব্যের রচনাকাল অথবা অনুলিপিকাল দেবার সময় কবিগণ শকাব্দের সাংকেতিকতাকে আশ্রয় করতেন প্রায় সর্বত্র। একমাত্র মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের স্পষ্ট সাল তারিখ যুক্ত ভণিতা ব্যবহার পাওয়া যায় —

'তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন।।'

অর্থাৎ গ্রন্থ রচনার সমাপ্তি কাল ১৪০২ শক বা ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

কয়েকটি পুঁথির লিপিকাল / শকাঙ্ক নির্ণয় ঃ

১) মহাভারতের একটি খণ্ডিত পুঁথি। কবি — পীতাম্বর দাস (ব. সা. সভা ৫৩৮)

'রস ঋতু বেদ চন্দ্র শাকের প্রমাণে।
কহে পীতাম্বর নারায়ণ পরসনে।।'

রসে = ৬, ঋতু = ৬, বেদ = ৪, চন্দ্র = ১ — অঙ্কের বামাবর্তে হয় ১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৪৬৬ ৭৮ ১৫৪৪ খ্রীঃ।

পুঁথি — মনসা বিজয়। কবি — বিপ্রদাস (পিপলাই)

'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুশেন শাহ গৌড়ের প্রধান।।
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া ভাবিত লোক পরম পিরীত।।'

সিন্ধু = ৭, ইন্দু = ১, বেদ = ৪, মহী = ১। অঙ্কের বামাবর্তে পাই — ১৪১৭ শক বা ১৪৯৫ খ্রীঃ। হুশেন শাহ এই সময়ে বাংলার শাসক ছিলেন।

পুঁথি — শিবায়ন। কবি — রামেশ্বর।

'শাকে হল্য চন্দ্র কলা রাম করতলে।
বাম হল্যা বিধিকাণ্ড পড়িল অনলে।
সেস কালের শিবের সঙ্গীত হল্য যারা।।'

চন্দ্রকলা = ১৬, রাম = ৩, কর = ২। এখানে অঙ্কের দক্ষিণাবর্ত। বিধি বাম হয়ে অনলে প্রবেশ করেছে অর্থাৎ এখানে দক্ষিণ গতি ধরতে হবে। তাহলে হয়, ১৬৩২ শক + ৭৮ = ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ।

পুঁথি — ধর্মমঙ্গল। কবি — ঘনরাম চক্রবর্তী।

'শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যাম সংখ্যা দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি।।'

রাম = ৩, গুণ = ৩, রস = ৬, সুধাকর = ১। অঙ্কের বামাগতিতে হয় — ১৬৩৩ শক। অর্থাৎ

মার্গকাদ্য — অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম, ভার্গব বাসর — শুক্রবার। সুলক্ষ বলক্ষ — শুক্লপক্ষ। তিথি — তৃতীয়া।

পুঁথি — অন্নদা মঙ্গল। কবি — ভারতচন্দ্র।

'বেদলয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরুপিলা।
সেই সকে এই গীত ভারত রচিলা।।'

বেদ = ৪, ঋষি = ৭, রস = ৬, ব্রহ্ম = ১।

অঙ্কের বামাবর্তে হয় ১৬৭৪ + ৭৮ = ১৭৫২।

পুঁথি — মহাভারত। কবি — কাশীরাম দাস।

'চন্দ্রবাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।'

চন্দ্র = ১, বাণ = ৫, পক্ষ = ২, ঋতু = ৬। এক্ষেত্রে দক্ষিণাবর্ত হয়েছে, অর্থাৎ ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

পুঁথি — মনসামঙ্গল। কবি — বিজয় গুপ্ত।

'ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক।'

ঋতু = ৬, শূন্য = ০, বেদ = ৪, শশী = ১। অর্থাৎ ১৪০৬ শকাব্দ বা ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু হুসেন শাহর রাজত্বকালের পূর্বেই হচ্ছে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত, 'ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক' ধরলে ১৪১৬ শক বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হয়। 'শূন্য' না হয়ে 'শশী' হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পুঁথি — চণ্ডীমঙ্গল। কবি — মুকুন্দ চক্রবর্তী।

'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
এত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা।।'

রস = ৬, বেদ = ৪, শশাঙ্ক = ১। অর্থাৎ ১৪৬৬ শক + ৭৮ = ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু আত্মবিবরণীতে মানসিংহের কথা বলা হয়েছে। মানসিংহের বাংলার সুবেদার পদের কাল ছিল ১৫৯৪ - ১৬০৫ খ্রীঃ। তাহলে মুকুন্দের আত্মবিবরণীটির প্রামাণিকতা থাকে না। তা না হলেও এই কবি শকাঙ্কটি নির্ভুল নয়। মুকুন্দ ষোড়শ শতাব্দীর কবি ছিলেন। এখন 'রস' কে ৬ না ধরে '৯' ধরলে হয় — ১৪৯৯ শক ৭৮ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ কাব্য রচনাকাল। তাহলেও মানসিংহের সময় আসছে না।

দ্বিজ মাধব কৃত চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুঁথিতে শকাঙ্ক পাই —

'ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গায়ে শারদা চরিত।।'

ইন্দু = ১, বিন্দু = ০, বাণ = ৫, ধাতা = ১ বা ১৫০১ শক + ৭৮ = ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর পুঁথিতে আকবর বাদশার কথা আছে।

'পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর বাদশা অর্জুন অবতার।।'

এই সময়কাল আকবরের রাজত্বকাল ইতিহাস সিদ্ধ। সুতরাং শকাঙ্ক যদি সঠিক না হয় তাহলে বিতর্ক দেখা দেয়। যার প্রমাণ মুকুন্দের ভণিতায় প্রাপ্ত শকাঙ্কটি।

শকাঙ্ক বা পুঁথির সাল, তারিখ জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্বারা প্রমাণ করা যায় (যদি শকাঙ্কে কোন ত্রুটি না থাকে)

১) মূল কাব্য রচনাকাল বা লিপিকাল, অথবা নকল কাব্যের রচনাকাল।

২) কবির ইতিহাস বা সময় সচেতনতা।

৩) কবির পাণ্ডিত্য, মুন্সীয়ানা ইত্যাদি।

মন্তব্য

১৪.৬ ঃ পুঁথির লিপির উদ্ভব ও বিবর্তন

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম বিস্ময় লিপির আবিষ্কার। মানব-সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম সহায়ক হল লিপি। লিপির সাহায্যেই মানুষের পক্ষে যুগ থেকে যুগান্তরে অর্জিত জ্ঞান সঞ্চিত করে রাখা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক সভ্য জগতের লিপি উদ্ভুত হয়েছে চারটি সুপ্রাচীন লিপিপদ্ধতি থেকে এ তথ্য সকলের জানা। এই চারটি লিপিমালার অন্তর্গত মিশরীয়, টীনীয় এবং মেসোপটেমীয় লিপির সম্পর্কে এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় প্রাচীন লিপি থেকে কিভাবে বাংলা পুথির লিপি এসেছে সেটুকুই আমরা এখানে দেখবো।

ভারতের প্রাচীনতম লিপি ছিল দুই প্রকার — খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। খরোষ্ঠী সেমীয়লিপি থেকে উৎপন্ন। ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও প্রাক্ খ্রীষ্টীয় যুগ থেকে ভারতের উত্তরাঞ্চলের লিপি হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্মী। এই ব্রাহ্মীলিপি ষষ্ঠশতকে গুপ্ত শাসনকালে যে রূপ পেয়েছিল তাকে কুটিল লিপি বলা হয়। ভারতের অষ্টম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত প্রচলিত লিপি প্রধানত কুটিল লিপি নামে পরিচিত।

কিন্তু এই কুটিল লিপি মোটামুটিভাবে একটি সাধারণ স্বীকৃত লিপি হলেও বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব বৈশিষ্ট সমন্বিত আঞ্চলিক লিপি প্রচলিত ছিল। যে কারণে বাংলা, ওড়িয়া, নেপালি ইত্যাদি আঞ্চলিক লিপি হলেও কুটিল লিপির পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। সেগুলির নিজস্ব বিকাশও ঘটে চলছিল। কোন কোন গবেষক-এর মতে বাংলা হরফও খ্রীষ্টপূর্ভ ২০০/২৫০ অব্দেই নিজস্ব রূপে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছিল। কোন্ লিপি থেকে কোন্ লিপি এসেছে, কোন্ যুগ থেকে কোন্ লিপি নিজস্ব আকার পেয়েছে এসবই এখনো অনেকখানি অনুমান নির্ভর। মোটের উপর এটুকু বলা যায় যে দ্বাদশ শতকের মধ্যে আঞ্চলিক লিপিগুলি অনেকটাই স্বতন্ত্র রূপ পেয়ে গেছে।

বাংলা হরফ ছাড়া আরও সাতটি হরফে লিখিত বাংলা পুঁথি পাওয়া গেছে। সেগুলি হল — আরবি, ওড়িয়া, ফারসি, নাগরি, নেওয়ারি, রোমক, সিলেট লিপি।

বাংলা হরফ ঃ- বাংলা ভাষায় রচিত পুঁথির অধিকাংশই বাংলা হরফে লেখা। এযাবৎ প্রাপ্ত প্রথম বাংলা পুঁথি 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' প্রাচীন বাংলা লিপিতে লিখিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লিপির অবশ্য বহু বিবর্তন ঘটেছে। তা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষার পুঁথি বাংলা হরফেই লেখা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

আরবি লিপি ঃ- ভারতে ইসলামিক জাতিগুলির আগমন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরবি এবং ফারসি ভাষা ও লিপি ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যদিও ক্রমে ফারসির প্রচলন বেশি হয়েছিল। কারণ প্রশাসনিক ভাষা ছিল ফারসি। তবুও আরবি ভাষার মূল্যও ছিল যথেষ্ট। কারণ আরবি ভাষায় লিখিত হওয়ার ফলে এই ভাষাটিকে তাবৎ মুসলমান সমাজ পবিত্র ভাষা বলে গণ্য করে থাকেন। মুসলমান লিপিকর দ্বারা অনুলিখিত পুঁথি অনেক সময় আরবি লিপিতে রচিত হয়েছে। পূর্ববাংলাতে আরবি লিপিতে রচিত পুঁথি বেশি পাওয়া যায়।

আরবি লিপি ডানদিক থেকে বামদিকে লেখা হয় বলে এই লিখন রীতির একটি ছাপ বাংলা হরফে লেখা পুঁথির ক্ষেত্রেও পড়েছে। কিন্তু বাংলা পুঁথি লেখা হয়েছে ডানদিক থেকে বামদিকে। তবে এগুলি বাংলা হরফে লিখিত। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সঙ্কলিত পুঁথির পরিচিতির ৩ সংখ্যক পুঁথি আমীর আসক্ত। ডানদিক থেকে বামদিকে লিখিত। সত্যপীরের পাঁচালী ডানদিক থেকে বামদিকে লিখিত।

ওড়িয়া লিপি ঃ- মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে জানা যায় ওড়িয়া ও বাংলা সংস্কৃতিক সংযোগ দীর্ঘকালের। শক্তিসাধনা এবং বৈষ্ণবসাধনা এই উভয় সূত্রেই ওড়িয়া এবং বাঙালি ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দীর্ঘদিনের সংযোগ গড়ে উঠেছিল। ওড়িয়া ভাষী ভক্তরা খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে বাংলা পুঁথি পাঠ করেছেন এবং অনেক সময় সেইসব পুঁথি ওড়িয়া লিপিতে লিখেও গিয়েছেন। সে কারণে ওড়িয়া লিপির বাংলা পুঁথিগুলি সবই পাওয়া গেছে ওড়িয়ায়। তাদের লিপিকররা ওড়িয়া সমাজভুক্ত। এদের মধ্যে কাশীরাম দাসের মহাভারত (বিরাট পর্ব), কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত (মধ্যলীলা), জগন্নাথ বিপ্রের গঙ্গামঙ্গল, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল উল্লেখযোগ্য।

কায়েথি লিপি ঃ- কায়েথি লিপি প্রধানত উত্তর বিহারে এবং উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত। দীর্ঘকাল যাবৎ যে কোন লেখালেখি এবং লিপিকরণের কাজ হিন্দীভাষী অঞ্চলের কায়স্থ সম্প্রদায়ের মানুষেরাই করে এসেছেন। তাদের একধরণের নিজস্ব লিপি ছিল। অবশ্য দেবনাগরি

লিপির সঙ্গে সেই লিপির সাদৃশ্য বর্তমান কায়েথি লিপি মধ্যযুগ আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিহারে এবং উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে বহুল প্রচলিত। মন্তব্য

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে কায়েথি বা কৈথি লিপিতে লিখিত দুইখানি বাংলা পুঁথি আছে, ৫২৯ সংখ্যক এবং ১৪১৮ সংখ্যক। দুটিই ক্ষেমানন্দের 'মনসা মঙ্গল' পুঁথি। এই দুটি পুঁথি অবলম্বন করেই বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল সম্পাদনা করেন।

নাগরি বা দেবনাগরি ঃ- ভারতবাসীর কাছে দেবনাগরি হরফ বহুকাল থেকে প্রচলিত। আরবি লিপিকে যেমন তাবৎ মুসলমান সম্প্রদায় শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন, তেমনি দেবনাগরি লিপিকেও হিন্দু ভারতীয় মাত্রেই শাস্ত্র লিখিত হবার মাধ্যম জ্ঞানে ধর্মীয় শ্রদ্ধা প্রদান করে থাকেন সুশিক্ষা এবং পাণ্ডিত্যের নিদর্শন রূপে। সংস্কৃত জ্ঞানের মতই দেবনাগরি লিপিতে লেখা হয়েছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ১৫৭৫ সংখ্যক পুঁথি কৃষ্ণদাস রচিত 'বনপরিক্রমা' এবং বীরভূম সিউড়ির শিবরতন মিত্রের ৩৩ সংখ্যক পুথি 'কলাবতী সত্যনারায়ণ' উল্লেখযোগ্য।

নেওয়ারি লিপি ঃ- মিথিলা ও দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে লিপিকর কায়স্থ সম্প্রদায়কে বলা হত নেওয়ার। তাদের অভ্যস্তলিপি নেওয়ারিলিপি নামে পরিচিত হয়। নেপালের সঙ্গে নৈকট্যবশত উত্তর বিহারের ঐ স্থান থেকে নেওয়ার সম্প্রদায়ের বহু লিপিকর বিভিন্ন সময়ে নেপালে গিয়েছিলেন এবং যাওয়া আসা করতেন। তারা নেপালে বসে নেওয়ারি লিপিতে অনেক পুঁথি লিখেছিলেন যেগুলির ভাষা বাংলা অথবা হিন্দী। এই কারণে নেওয়ারিলিপির বহু পুঁথি নেপালে পাওয়া গেছে। বাংলা লিপির সঙ্গে নেওয়ারি লিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং তা থাকা স্বাভাবিক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ''নেপালে বাংলা নাটক'' গ্রন্থটি নেওয়ারিলিপিতে লিখিত চারখানি নাটকের পুঁথি অবলম্বনে সঙ্কলিত।

রোমক লিপি ঃ- বাংলার খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রোমকলিপিও বাংলার সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে। বিদেশিরা যখনই খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কীয় কোন গ্রন্থ রচনা করেছেন তখন প্রয়োজনে রোমকলিপি ব্যবহার করেছেন। দোম আন্তেনিয়ো দে রোজবিরয়ো রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত বাংলা শব্দ সংগ্রহ রোমক হরফে লিখিত।

সিলেটি নাগরি ঃ- সিলেটি নাগরি লিপি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এবং শ্রীহট্ট ও কাছার অঞ্চলে বসতি স্থাপন কার মুসলমানদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। কিছুটা বাংলা কিছুটা দেবনাগরি লিপির প্রচলন ছিল ব্যাপক। বহু পুঁথি লেখা হয়েছে এই লিপিতে বাংলা হরফে যেসব বাংলা পুঁথি লিখিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে হরফের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

মূর্ধণ্য 'ণ', দন্ত্য 'ন' এবং 'ল' তিনটি হরফের মধ্যে প্রায়ই নানাবিধ গোলযোগ দেখা যায়। দন্ত্য-'ন' কখনো '¶F' 'îF'-এর মতো লেখা হয়েছে। আবার 'ল' হিন্দী এবং মূর্ধণ্য 'ণ'-এর মতো লেখা হয়েছে। 'তু' বোঝানো হতো আধুনিক বাংলার 'ও'-এর মত লিখে।

যুক্ত ব্যঞ্জন এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে আ-কার, ই-কার ইত্যাদি বোঝানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন হরফ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। যেমন — 'কু' লেখা হয় 'ঙ্গঁ'-এই হরফের সাহায্যে, কোন একটি শব্দ যখন দুবার ব্যবহৃত হয়েছে তখন অনেক সময় শব্দটিকে দুইবার না লিখে একবার লিখে তারপর '২' সংখ্যাটি বসিয়ে দেওয়া হত।

মুদ্রণের যুগে হরফের আকারে সারল্য এবং স্থিতি এসেছিল।

পাঠসমস্যা ঃ- পুঁথি যখন রচিত হত মুদ্রণ ছিল না বলে একই পুঁথি বহু অনুলিপিকরণ সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লিপিকর একটি পুঁথির হস্তলিখিত অনুলিপি, করতেন এভাবেই একটি পুঁথির আরও কয়েকটি অনুলিপি পাওয়া যেত। এভাবেই দেখা দিত পাঠ সমস্যা।

(১) পুঁথির হরফের একাধিক ছাঁদ প্রচলিত ছিল বলে অনেক সময় লিপিকরদের পক্ষে ঠিক করে পড়াও সম্ভব হত না।

(২) সাধারণ পুঁথির পুথিকায় লেখা লিপিকাল থেকেই পাঠের প্রাচীনতা উদ্ধার কার যায়। লিপিকাল না থাকলে পুঁথির অবস্থা, উপকরণ, লিপির ছাঁচ ও ভাষা বিশিষ্ট ইত্যাদি থেকেও পাঠের প্রাচীনতম নির্ধারণ করা যায়।

(৩) প্রাচীন পাঠগুলি উদ্ধার করার পর সব পাঠের মধ্যে তুলনা করে তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক অভেদ ও প্রভেদের প্রকার ও পরিমাণ নিরূপণ করা গবেষকের কাজ। তারপরে ঐ পাঠ — প্রভেদগুলিকে সংশোধন করা দরকার।

(৪) অনেক সময় পুঁথির প্রাচীনত্ব এবং পাঠোদ্ধার করবার কাজে পুঁথি মধ্যস্থ লিখিত

মন্তব্য

উপাদানেরও বিচার করতে হয়। যেমন পঞ্চদশ শতকে রচিত কোন পুঁথিতে ইংরেজি ফারসি, পর্তুগিজ থাকলে বুঝতে হবে সেই শব্দটি পুঁথির আদি পাঠে ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন অনুলিপিতে এই শব্দটি অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এইভাবে গবেষককে অনুমানের উপর নির্ভর করে শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে মতভেদেরও সম্ভাবনা থাকে। গবেষকরা সবসময় একমত হন না।

(৫) সাধারণ পুঁথি পাঠে যে বিভ্রান্তি দেখা যায় তার প্রকার দুটি। একটি হল — বর্ণ বিভ্রান্তি দ্বিতীয়টি হল — শব্দ বিভ্রান্তি। কোন কোন লিপির আদর্শ পুঁথির বর্ণ ঠিকমতো বুঝতে না পারলে অনেক সময় মূল পাঠের নির্দিষ্ট বর্ণটিকে ব্যবহার না করে তিনি বর্ণটিকে যেভাবে লিখতেন সেইভাবেই লিখে দিতেন। তার ফলে পাঠের বিপর্যয় ও দুর্বোধ্যতা দেখা দেয়। অসর্তকতার ফলেও অনেক সময় ঠিকমতো পাঠোদ্ধার না করতে পারলে পুঁথিতে বর্ণ, শব্দ বা চরণের ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা যায়। যদি লিপিকর শ্রুতিলেখক অর্থাৎ কানে শুনে অনুলিপি প্রস্তুত করেন তাহলে এই বিপর্যয় বেশি দেখা যায়।

১৪.৭ ঃ পুঁথি সংরক্ষণ

পুঁথি — সংস্কৃত 'পুস্তিকা' শব্দ থেকে পুঁথি বা পুঁথি শব্দটি এসেছে। [পুস্তিকা > পুস্থিআ > পোথী > পুঁথি/পুঁথি (স্বতঃ নাসিক্যীভবন)]। সাধারণভাবে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপ (তালপাতা/ভূর্জপত্র/ তুলোট কাগজ প্রভৃতিতে লেখা) যা কমপক্ষে ষাট বছরের প্রাচীন [এন. এম. এম. বা ন্যাশনাল ম্যানস্ক্রীপট মিশন কর্তৃক নির্দ্ধারিত] তাকেই পুঁথি বলা হয়। উত্তরাধিকারে পাওয়া কিংবা বিভিন্নভাবে (দান, বিক্রয় অথবা আবিষ্কার) বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত অথবা গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা পুঁথিগুলিকে যদি যথা যথা সংরক্ষিত করা না হয় তাহলে এইসব প্রাচীন এবং মহামূল্যবান পুঁথিগুলিও হারিয়ে যাবে চিরতরে। সেই সঙ্গে আমরা হারিয়ে ফেলব মানব সৃষ্ট সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলিকে, হারিয়ে ফেলব মানব ইতিহাসের সবচেয়ে নিবিড়, অন্তরঙ্গ এবং প্রত্যক্ষ ঐতিহ্যের মূলসূত্রগুলি।

সুতরাং পুঁথি সংগ্রহের পরই প্রয়োজন — সেগুলির যথাযথ সংরক্ষণ। পুঁথি সন্ধান পাওয় গেলেই তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা জাতীয় কর্তব্য। বর্তমানে ভারত সরকরের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এন. এম. এম. বা ন্যাশানাল ম্যানস্ক্রীপট্ মিশনের মাধ্যমে প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ ও তালিকা প্রণযনে সর্ববিধ সাহায্যে করেছেন। পুঁথি সংরক্ষণে পুঁথির বহিরঙ্গ উপকরণগুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পুঁথির এইসব উপকরণগুলি হল — (ক) পত্র, (খ) কালি, (গ) গ্রন্থপট, (ঘ) গ্রন্থসূত্র, (ঙ) গ্রন্থবস্ত্র, (চ) গ্রন্থরজ্জু। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণের বহু আগেই সে যুগে এইসব উপকরণগুলির আভ্যন্তরীণ সংরক্ষণের ক্ষমতা ছিল। অর্থাৎ উপকরণগুলিই পুঁথিকে শতশত বছর বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম ছিল। পূর্বেই বলেছি ঐতিহাসিক অসচেতনতায় রাষ্ট্রনৈতিক অস্থিরতা, জলবায়ুর আর্দ্রতা, পোকার আক্রমণ, অনাদর, অবহেলা সত্ত্বেও হাজার হাজার পুঁথি যে আজও অক্ষত আছে তার প্রধান কারণ হল উপাদানগুলির মধ্যেই আছে কালজয়ী ক্ষমতা।

(ক) **পত্রোপকরণ ঃ-** পূর্বেই বলা হয়েছে পুঁথির লিখনাধার রূপে মূলতঃ তিন প্রকারের পত্র ব্যবহার করা হত — (১) ভূর্জপত্র, (২) তালপত্র, (৩) তুলোটকাগজ।

(১) **ভূর্জপত্র ঃ-** হিমালয়ের তিন হাজার মিটার উচ্চতায় নিবিড় ভূর্জ বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। একে 'ভোজ' পত্রও বলা হয়। এই বৃক্ষের ছাল অতি নরম, সিল্কের কাপড়ের মত পাতলা ছালে বর্ণ তুলি দিয়ে লেখা হত। এগুলি দীর্ঘদিন ধরে একইভাবে থাকে। সাধারণত এই পত্রে কবচাদি লালকালিতে লিখে মাদুলিতে ভরে দেওয়া হয় আজও।

(২) **তালপত্র ঃ-** কচি তালপাতা সংগ্রহ করে প্রথমে বিশেষ মাপে কেটে নিয়ে মধ্যের লম্বা শিরাকে লম্বভাবে চিরে তা থেকে দুটো পাতা বের করা যেতো। এরপর পত্রগুলিকে জলে দু-তিন দিন ডুবিয়ে রেখে ছায়ায় শুকিয়ে নেওয়া হতো। এরফলে পোকার হাত থেকে একে বাঁচানো যেত। গীতাদি উপনিষদ পূজার্চনা-পুঁথি তালপাতায় লেখা হত। এর কারণ এর আয়তনের স্বল্পতা এবং হাল্কা।

(৩) **তুলোট কাগজ ঃ-** তুলো বা ছেঁড়া বস্ত্রখণ্ড, ঘাস, পাতা, বাঁশের ছোট ছোট কচি কচি খণ্ড, কালিচুনের জল, হরিতকীর রস, অভ্র, হলুদ বাটা, গদ — প্রভৃতির আনুপাতিক মিশ্রণে হস্ত নির্মিত তুলোট কাগজ — অমর অক্ষয় বলা যায়। কলিচুনের জল, অভ্র, হরিতকী, হলুদ, গদের আঠা — পুঁথির পাতাকে সবদিক থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। বৈজ্ঞানিকভাবে সংরক্ষণ করা নয় এমন তিন-চারশো বছরের প্রাচীন তুলোটকাগজের পুঁথি হাজার হাজার আছে — মহাকালের ছোবল থেকে এরা বেঁচে আছে কেবলমাত্র উপকরণের বেঁচে থাকার আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বলেই।

বর্তমানে ছাপাখানার দুশো বছরের ইতিহাসে কলে নির্মিত কাগজ কিন্তু বহু যত্নেও শতবৎসরও বাঁচে না। মন্তব্য

(খ) **পুঁথির কালি ঃ-** পুঁথিতে কালো ও লাল এই দু-বর্ণের কালির ব্যবহার দেখা যায়। এই কালিও হস্তনির্মিত। কাগজের মতই পুঁথির কালিও দীর্ঘজীবি। দীর্ঘস্থায়ী কালি প্রস্তুতিতেও ছিল কাগজ প্রস্তুতির মতই শ্রম ও নিষ্ঠা। কালি প্রস্তুতির প্রণালী ছড়ায় পাওয়া যায়।

লোধ ফুল অথবা গাছের ছাল, লোহার গুঁড়ো (চূর্ণ) হলে ভিজিয়ে কালো রঙ ধারণ করে। সেই জলের সঙ্গে অর্ক (আকন্দ) গাছের কাঠকয়লা ঘসে মিশিয়ে অর্জুন, আমলকী ও বাবলা গাছের ছাল ও আঠা জলে ভিজিয়ে তার কষ মেশাতে হবে। তার সঙ্গে জাঁটির রস অর্থাৎ চাল ভেজে বা পুড়িয়ে তার থেকে আঠালো রস বের করে তাতে মেশাতে হবে। আর এর সঙ্গে যদি ডালিম ফলের ছালের কষ মেশানো হয় তাহলে তা এমন টেকসই হবে যে, 'তোটেপত্র না তোটে মসি' (কাগজ নষ্ট হবে কিন্তু কালি নষ্ট হবে না)

পুঁথিকে দুপাশ থেকে কাঠের (নিম, সেগুন, বেল কাঠের) খণ্ড তক্তা বা পাটা (পত্র মাপ মত) দিয়ে দুদিক থেকে চাপ দিয়ে পুঁথির পৃষ্ঠার মধ্যস্থলের ছিদ্র দিয়ে প্রবিষ্ট গ্রন্থসূত্র দিয়ে কষে বাঁধা হত। পাটা দিয়ে চেপে বেঁধে রাখা হত যাতে আর্দ্র জলবায়ু পুঁথির পাতাকে নষ্ট করে না দেয়। ''পুঁথিকে পুত্রের ন্যায় পালবে আর শত্রুর ন্যায় বাঁধবে'' — এই নির্দেশ সেকালেই ছিল।

(খ) **গ্রন্থ বস্ত্র ঃ-** এরপর পাটা দিয়ে বাঁধা পুথিকে ধুলো বালির হাত থেকে এবং পোকামাকড়ের কামড় থেকে রক্ষা করার জন্য সাধারণত লাল সালু দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বস্ত্ররজ্জু দিয়ে বাঁধা হত। এক গজ পরিমাণে চতুষ্কোণ বস্ত্র খণ্ড, এর একটি কোণে লম্বা বস্ত্ররজ্জু থাকেন। এই ধরণের সংরক্ষণ সেকালের মানুষ করতেন, পুঁথি নিজেই নিজেকে এভাবে রক্ষা করত।

কিন্তু সমস্ত সৃষ্টিরই ধ্বংস আছে। তাই বর্তমানে ক্ষীর্ণায়ু পুঁথিগুলিকে সংরক্ষণের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা আধুনিক সংরক্ষণ প্রণালীকে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ দু-দিক থেকে বিন্যস্ত করেছি।

বহিরঙ্গ দিক

(ক) পুঁথিগুলিকে কাচের দরজা দেওয়া আলমারির তাকে রাখতে হবে।

(১) তার আগে প্রতিটি পাতাকে ব্রাশ দিয়ে হাল্কা করে আড়াআড়িভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

(২) এরপর ব্রাউন বা আরও বিশুদ্ধ মোটা কাগজ দিয়ে মুড়ে নিয়ে পাটা বা শক্ত নেশনাইন বোর্ড দিয়ে দুপাশ থেকে চেপে বেঁধে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।

(৩) পুঁথি শালাটিতে যেন আলো বাতাস থাকে। স্যাঁতসেঁতে এবং রোদের ঝাঁজ না থাকে।

(৪) পুঁথির পাতাকে যেন রোদ লাগানো না হয়।

(৫) পুঁথির পাতাকে জলীয়বাষ্প থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

(৬) মাঝে মাঝে পুঁথির পাতাগুলিকে খুলে খুলে আলো বাতাস লাগাতে হবে।

(৭) ভেষজ প্রতিষেধক রূপে আলমারির তাকে পুঁথির থেকে একটু দূরে (পুঁথির গায়ে যেন না লাগে) শুকনো মতিহার/দোক্তা পাতা, শুকনো লঙ্কা, কালো জিরে, বচ ইত্যাদি রাখলে পোকামাকড়ের হাত থেকে সহজেই পুঁথিকে রক্ষা করা যাবে।

অন্তরঙ্গ সংরক্ষণ

(ক) প্রথমেই পত্রসংখ্যা ক্রমানুযায়ী পুঁথিকে সাজাতে হবে।

(খ) যদি একটি পুঁথি থাকে অর্থাৎ একই বিষয়ের পুঁথি থাকে তাহলে সমস্যা কম। কিন্তু যদি এমন হয়, এক বাণ্ডিল বিভিন্ন বিষয়ের পুঁথির পাতা পাওয়া গেল, সেক্ষেত্রে বিষয় অনুযায়ী পুঁথির পত্রগুলিকে পত্রসংখ্যানুযায়ী সাজাতে হবে। এরজন্য অবশ্য পুঁথি পাঠে ও বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই।

(গ) সাধারণত পুঁথিকে একটি পত্রের এপিঠ ও ওপিঠ মিলে একটি পত্র ধরা হয়। সেই হিসাবে পত্র সংখ্যা গণনা করতে হবে।

(ঘ) বিষয়গত/শ্রেণীগত বিন্যাসকরণ — কোন বিষয়ের পুঁথি — রামায়ণ — মহাভারত —

মন্তব্য

মঙ্গলকাব্য — নাটক — ইসলামী — বৌদ্ধ — জৈন — তন্ত্রযন্ত্র ইত্যাদি বিষয়গতভাবে পুঁথিকে চিহ্নিত করতে হবে।

(ঙ) ভাষাগত পৃথকীকরণ — সংস্কৃত, বাংলা বা ভারতীয় কোন্ আঞ্চলিক ভাষার পুঁথি তা চিহ্নিত করতে হবে।

(চ) লিপি চিহ্নায়িতকরণ — বাংলা ইত্যাদি কোন্ লিপি কোন্ যুগের — প্রাচীন, মধ্য না আধুনিক লিপি তা চিহ্নিতকরণ।

(ছ) এরপর পুথিটিকে সংখ্যায়িত করতে হবে।

এছাড়া নির্ণয় করতে হবে —

(১) পুঁথিটি সম্পূর্ণ না খণ্ডিত।
(২) লিপিকাল যুক্ত সম্পূর্ণ পুঁথি না খণ্ডিত পুঁথি।
(৩) লিপিকালহীন সম্পূর্ণ পুঁথি না খণ্ডিত পুঁথি।
(৪) পুষ্পিকা আছে, না নেই।
(৫) অলংঙ্কৃত না অলংকৃত।
(৬) কবি নাম যুক্ত / না কবি নাম হীন।
(৭) কবি নাম থাকলে — কবির নাম কি।
(৮) গ্রন্থের নাম আছে / না নেই।
(৯) লিপিকার / পাঠক পরিচয় আছে / না নেই।

এভাবে সমস্ত পুঁথিকে চিহ্নিত করে সাজাতে হবে। এরপর প্রতিটি পুঁথির অভ্যন্তর এবং বস্ত্রাবরণের উপরে একটি বিবরণ সমন্বিত কার্ড রাখতে হবে। সেই সঙ্গে একটি রেকর্ড খাতায় এবং ক্যাটালগ বা তালিকা কার্ডে পুঁথির পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

সেই পরিচয়করণে উল্লেখিত থাকবে —

(১) সংরক্ষণ কেন্দ্রের নাম (২) পুঁথি সংখ্যা (৩) গ্রন্থের নাম/যদি থাকে/অন্য কোনো নাম (৪) গ্রন্থকার/কবি নাম (৫) লিপিকরের নাম/পাঠক নাম (৬) লিপিকাল (৭) কাগজ/তুলোট/তালপত্র/কলে প্রস্তুত কাগজ (৮) পত্রসংখ্যা (৯) অপ্রাপ্ত পত্র সংখ্যা (১০) পুঁথির ভাষা এবং বিষয় (১১) পুঁথির অবস্থা (১২) প্রতি পত্রের মাপ (১৩) প্রতি পত্রের চরণ সংখ্যা (১৪) সংগ্রহস্থান/প্রাপ্তিস্থান (১৫) সংগ্রাহকের নাম (১৬) দার্শন পুঁথি না ক্রয় পুঁথি (১৭) বিক্রেতার নাম ঠিকানা।

সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা প্রস্তুতকরণও তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুঁথি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে। কারণ পুঁথিশালায় কি কি বা কত ধরণের পুঁথি আছে সেটাও জানানো জরুরি।

১৪.৮ ঃ পুথি সম্পাদনা

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের আগে সকল প্রকার সাহিত্য, দলিল, জমিদারি খাজনা সংক্রান্ত লেখাবস্তু সমস্ত কিছুই হাতে লেখা হত। কখনো বা তালপাতায়, ভূজ পত্রে, কখনো বা তুলট কাগজে। এই পুঁথিগুলি ছিল বহুমূল্য। কারণ ছাপাখানা আবিষ্কার না হওয়ায় লিখিত সাহিত্য বলতে পুঁথিকেই বোঝাতো যার মধ্যে সঞ্চিত হত মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধিজাত যাবতীয় চিন্তন-সম্পদ। কেউ পারিশ্রমিক নিয়ে, কেউ বা পুণ্যকর্ম ভেবে পুঁথি লিখতেন পাঠশালার পাঠ শেষ হলে পড়ুয়ারাও পুঁথি লিখতে পারত।

প্রাচীন একটি পুঁথিকে এই সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করে আধুনিক পাঠকের উপযোগী করে তার পুনর্মুদ্রিত রূপ গড়ে তোলাকেই বলা যায় পুঁথির সম্পাদনা।

পুঁথি সম্পাদনা করতে প্রথমেই পুঁথিগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। প্রথমেই বুঝে নিতে হবে পুঁথিটি কবির নিজের লেখা অথবা লিপিকরের লেখা। একই পুঁথির বিভিন্ন অনুলিপি বিভিন্ন লিপিকরের করা হয়েছে কিনা তাও দেখে নেওয়া দরকার। পুঁথি যদি খণ্ডিত থাকে তাহলে বিভিন্ন অনুলিপির সাহায্যে তার সম্পূর্ণ পাঠ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

যখন কোনো পুঁথির অনেকগুলি অনুলিপি পাওয়া যায় এবং তা স্পষ্টতই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লিপিকরের হাতে লেখা হয়েছে বলে মনে হয় তাহলে সেই পুঁথির সম্পাদিত হবে তা নির্ভর করে সম্পাদকের নিজস্ব বিচার ও সিদ্ধান্তের উপর। অনেক সময় একাধিক পুঁথি পাওয়া গেলেও অধিকাংশ পুঁথি খণ্ডিত থাকে। সেক্ষেত্রে সম্পাদকের যে পুঁথিটিকে সম্পূর্ণ বলে মনে হবে বা যে পুঁথিতে খণ্ডিত

অংশ সবচেয়ে কম বলে মনে হবে সেই পুঁথিটিকে সম্পাদনের মূল পুঁথি বলে গ্রহণ করতে পারেন।

পুঁথিতে যদি কবির নাম সুস্পষ্ট করে দেওয়া থাকে তাহলে সম্পাদকের সমস্যা অনেক কমে যায়। কিন্তু যদি স্পষ্ট ভাবে না দেওয়া থাকে অথবা একাধিক ভণিতা থেকে প্রকৃত কবি কে তা নির্ণয় করবার প্রয়োজন হয় তাহলে সম্পাদককে অনেক সাবধানে অগ্রসর হতে হয়। সেক্ষেত্রে পুঁথির কাল, সেই সময়ের সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক বিশিষ্টতা, সেই সময়ের পুঁথিতে ব্যবহৃত বর্ণের গড়ন, ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা ইত্যাদি সমস্ত কিছু সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে সম্পাদককে সম্ভাব্য কবির নাম অনুমান করতে হয়।

পুঁথি ভালোভাবে সম্পাদনা করতে গেলে কবি ও লিপিকরের সম্পূর্ণ পরিচয়, পুঁথির কাল নির্ণয়, অঞ্চল বিচার, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, ভাষা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, গুরুত্বপূর্ণ পাঠান্তর বিচার — এ সমস্তই বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা দরকার।

পুঁথি সম্পাদনা করতে গেলে পুঁথির ভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন পুঁথি যেহেতু প্রাচীনকালের ভাষায় এবং হরফে লিখিত হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে লিখিত হবার ফলে লিপিকরের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব পড়ে, সে কারণে এযুগের শিষ্ট চলিত ভাষার ব্যবহারে অভ্যস্ত পাঠকের কাছে সেইসব শব্দ সর্বদা বোধগম্য নাও হতে পারে। অনেক সময় তালপাতা, তুলট কাগজ ছিঁড়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে শব্দ অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রতিটি শব্দ বিচার করে পুঁথির বিষয় এবং কাব্যগ্রন্থ পদান্বয় বিচার করে, প্রতিটি শব্দের অর্থ নির্ণয় করা উচিত, এই বিষয়ে পুঁথি যে কালের এবং যে অঞ্চলের সেই কাল ও সেই অঞ্চলের ভাষা বিশদভাবে অনুসন্ধান করতে হবে।

তবে শব্দটি সম্পর্কে সংশয় বোঝাবার জন্য সম্পাদিত পুঁথিতে শব্দটির পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেওয়া উচিত। সুসম্পাদিত পুঁথির ক্ষেত্রে দুরূহ শব্দের টিকা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

শব্দ বিচার করতে গিয়ে প্রায়শই বানান সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। প্রথমেই সম্পাদককে স্থির করে নিতে হবে — তিনি পুঁথিতে যে বানান আছে তাকে সম্পাদিত পুঁথিতে রাখবেন কিনা, নাকি আধুনিক বানান রাখবেন, এ ক্ষেত্রে মনে হয় বানানের প্রাচীনত্ব রক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ, যদি বানান অশুদ্ধি হয়ে থাকে তাহলে তা শুদ্ধ করে নেওয়া হবে কিনা তবে এক্ষেত্রে মতভেদ আছে।

লিপিকররা অনেক সময় পুঁথির শব্দ বুঝতে না পেরে নিজেদের মন গড়া শব্দ বসিয়ে দেয় ফলে পুঁথির বিষয়বস্তুতে দুর্বোধ্যতা দেখা দেয়। সুতরাং সম্পাদক বিচক্ষন হলে এই সমস্ত দুর্বোধ্য তাকে কাটিয়ে উঠে এই সমস্যার সমাধান করেন। তবে এটা সম্পাদকের একটা বিরাট দায়িত্ব।

পুঁথির শব্দে যে সব কারণে ভ্রান্তি এবং দুর্বোধ্যতা দেখা দেয় সেই একই কারণে দেখা দেয় ভাষার অসঙ্গতি। লিপিকর অনেক সময় মূল পুঁথির শব্দ বা ভাষা বুঝতে না পেরে নিজের শব্দ ব্যবহার করে বসেন। ফলে ভাষার অ-সঙ্গতি দেখা দেয়। তবে সম্পাদকের পক্ষে মূল পুঁথির মুদ্রণে পুথির ভাষা যথাযথ রাখাই উচিত।

পুঁথির ভাষা বিচার অন্যদক থেকেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভাষার ধরন এবং রূপ থেকে পুঁথির কাল এবং অঞ্চল অনেকখানি স্থির করা যায়। পুঁথির সম্পাদক ভাষার এই আঞ্চলিক বিশিষ্টতা কালগত চিহ্নগুলি পাঠকের সামনে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ তুলে ধরবেন।

পুঁথি সম্পাদন কালে পুঁথির ভণিতার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। একাধিক ভণিতা থাকলেও কোনটি কার ভণিতা তা বিচার করতে হবে। ভণিতা কবির অথবা লিপিকরের তা বিচার করতে হবে। একাধিক ভণিতা থাকলে কোনটি কার ভণিতা যথাসম্ভব নির্ণয় করতে হবে অথবা যথাসর্বস্ব তথ্য সাপেক্ষে অনুমান করতে হবে। অনুমানের কারণ বিশ্লেষণ করতে হবে।

পুঁথি সম্পাদনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল লিপির বিচার। লিপির ছাঁদ অঞ্চল ভেদে পৃথক হয় এবং কালের গতিতেও বদলে যায়। কাজেই লিপির ছাঁদ পরীক্ষা করে সম্পাদক পুঁথির লিপিকাল এবং অঞ্চল সম্পর্কে অনেকটা যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন।

আধুনিককালে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত বহু উন্নতি হবার ফলে পুঁথির সম্পাদক সেই সুযোগও গ্রহণ করতে পারেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগরে পুঁথির উপকরণ অর্থাৎ কাগজ, কালি, পাতা, চামড়া ইত্যাদির পরীক্ষা করে তার সময় সঠিকভাবে নির্ণয় কার খুবই সম্ভব কখনও কখনও অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যেতে পারে। বিশেষত পুঁথির প্রাচীনত্ব বিচার, পুঁথি জাল কিনা তা পরীক্ষা বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেকখানি নিঃসংশয়ভাবে করা চলে, সর্বক্ষেত্রেই পুঁথির সম্পাদক তাঁর সম্পাদনার পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করে দেবেন। পুঁথির কবি, লিপি, কাল এবং অঞ্চল

মন্তব্য

বিষয়ে নিজের অনুমান যথাসম্ভব প্রমাণসহ ব্যক্ত করবেন। যে সমস্ত সংশয় নিরসন হয়নি, সেগুলিকেও উত্থাপিত করবেন। সর্বক্ষেত্রেই শব্দ এবং ভাষা সংক্রান্ত টীকা দিতেই হবে।

সুতরাং পুঁথির সম্পাদককে সুপণ্ডিত হতে হবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনীতি ইত্যাদির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত থাকবেন।

১৪.৯ ঃ অনুশীলনী

১) পুঁথি পাঠের পদ্ধতি কী ? কোন কোন কারণে পুঁথি পাঠে সমস্যা দেখা দেয় তা উল্লেখ করুন।

২) তোলাপাঠ ও মিশ্রপাঠ কাকে বলে ? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

৩) পুঁথির কাল নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪) বাংলা পুঁথির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫) পুঁথির কালজ্ঞাপক শ্লোক কীভাবে লেখা হত ? কী ধরণের সংকেত সংখ্যা বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হত — তা উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

৬) 'অঙ্কস্যবামাগতি ও 'কবি-শকাঙ্ক' বলতে কী বোঝায় ? ব্যাখ্যা করুন।

৭) পুঁথির কাল নির্ণয় পদ্ধতি ও অব্দ-শকাব্দ নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে লিখুন।

৮) কোন কোন লিপিতে বাংলা পুঁথি লেখা হয়েছে ? বাংলা নয় এমন লিপিতে বাংলা পুঁথি লেখার কারণ কী ?

৯) পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

১০) বাংলা পুঁথির লিপির উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১১) পুঁথি সম্পাদনা কালে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় — সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

১৪.১০ ঃ গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা পুঁথির বিবরণ (২য় খণ্ড) — তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

২। প্রাচীন পুঁথির পরিচয় — মণীন্দ্রমোহন পাল ও প্রফুল্লচন্দ্র বসু।

৩। পুঁথি পরিচয় (১ম ও ২য় খণ্ড) — পঞ্চানন মণ্ডল।

৪। বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ — জয় বিদ্বদ্বল্লভ ও ভট্টাচার্য্য বসন্তরঞ্জন ও তারাপ্রসন্ন।

৫। বাংলার পুঁথি বাংলার সংস্কৃতি — স্বাতী সরকার (দাস)।

৬। বাংলা পুঁথির গঠন ও প্রকৃতি — কল্যাণ কিশোর চট্টোপাধ্যায়।